প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা—৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ ঃ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৬/৮ই মে, ১৯৮৯

সম্পাদনা ঃ
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক ঃ
পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ
পিটিএস্ ঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
মুদ্রণ ঃ প্রিণ্ট ও গ্রাফ্,
৯সি, ভবানী দত্ত লেন,
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
আনন্দরূপ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

প্রথমা	লক্ষ্যভ্রষ্ট	১
”	সুদূরের আহ্বান	২
”	কবি	৩
”	সেতু	৪
”	বেনামী বন্দর	৫
”	মাটির ঢেলা	৭
”	নমস্কার	৮
”	স্বপ্নদোল	৯
”	দেবতার জন্ম হ'ল	১০
”	দবার খোল	১২
”	অপূর্ব	১৩
”	প্রার্থনা	১৪
”	মৃত্যুরে কে মনে রাখে	১৫
”	আশীর্বাদ	১৭
”	ভাড়াটে কুঠি	১৯
”	কাগজ বিক্রী	২০
”	নমো নমো	২১
”	ফিরে আসি যদি	২২
”	নটরাজ	২৪
”	নেপথ্য	২৫
”	মেঘলা মোহ	২৬
”	নাহি ভয়	২৭
”	ইহবাদি	২৮
”	যৌবন বারতা	৩১
”	বিস্মৃতি	৩২
”	স্মৃতি	৩৩
”	গুপ্ত	৩৪
”	তুমি	৩৪
”	মানে	৩৫
”	সংশয়	৩৫
”	রাস্তা	৩৭
”	পাঁও দল	৩৯
সম্রাট	কাঠের সিঁড়ি	৪১
”	পুরাতন নাম	৪২
”	বাঘের কপিল চোখে	৪৩

সম্রাট	পথ	৪৪
”	আমরা যাইনি যুদ্ধে	৪৫
”	ছাদে যেওনাক	৪৬
”	বিনিদ্র	৪৭
”	অবতারণা	৪৮
”	শস্য-প্রশস্তি	৪৯
”	কোন দূর বনে	৫০
”	সাগর পাখীরা	৫১
”	কোজাগরী	৫২
”	আজ রাতে	৫৩
”	মৃত্যুত্তীর্ণ	৫৪
”	পুরাতন বীজ	৫৫
”	তুমি এস	৫৫
”	নীল দিন	৫৬
”	কাল রাত	৫৮
”	সৌরভ	৫৯
”	ঝড় যেমন করে জানে অরণ্যকে	৬০
”	জাহাজের ডাক	৬০
”	সম্রাট	৬১
”	তামাসা	৬২
”	নীলকণ্ঠ	৬৪
”	অনুবাদ কাজ	৬৬
”	প্রেম	৬৭
”	দেবতা	৬৯
”	বিশ্লেষণ	৭১
”	রাত্রি	৭১
”	স্টেশন	৭২
ফেরারী ফৌজ	পলাতক	৭৩
”	ভৌগোলিক	৭৩
”	পূষণ	৭৪
”	কাক ডাকে	৭৪
”	ইঁদুরেরা	৭৬
”	পাখিদের মন	৭৬
”	ইস্পাত	৭৭

ফেরারী ফৌজ	ফেরারী ফৌজ	৭৮
”	সুড়ঙ্গ	৮০
”	জনৈক	৮২
”	আদ্যিকালের বুড়ি	৮৩
”	'তেনত্যক্তেন'	৮৪
”	কালাধলা ভাই আমার	৮৫
”	পাখি	৮৫
”	প্রেতায়িত	৮৬
”	জয়	৮৭
”	কথা	৮৮
”	প্রাচীন পদ্ধতি কোন	৮৯
”	আরো এক	৯০
”	নিঃসঙ্গ	৯১
”	তিনটে জোনাকি	৯২
”	যদিও মেঘ চরাই	৯২
”	সংশপ্তক	৯৩
”	নৌকো	৯৪
”	ট্রেন থেকে	৯৫
”	নতুন পোল	৯৬
”	গ্রামান্তে রাত্রি	৯৬
”	স্তব্ধতা	৯৭
”	পোলের উপর পাঁচুই মাঘ	৯৭
”	ফ্যান	৯৮
”	ছোঁয়া	৯৯
”	প্রহসন	১০০
”	তিনটি গুলি	১০১
সাগর থেকে ফেরা	জোনাকি মন	১০২
”	তোমাকে চিঠি	১০২
”	সাগর থেকে ফেরা	১০৩
”	দোকান	১০৪
”	শিখর ছুঁয়ে নামা	১০৫
”	কবি	১০৬
”	আছে	১০৭
”	শহর	১০৮

সাগর থেকে ফেরা	জীবনানন্দ	১০৯
”	হারিয়ে	১১০
”	আবিষ্কার	১১১
”	জীবনের গান	১১১
”	ধ্বনি	১১২
”	বরং	১১৩
”	প্রবাদ	১১৩
”	সত্য	১১৪
”	শরৎ	১১৫
”	জানা ও বোঝা	১১৫
”	সূর্য-বীজ	১১৬
”	দুপুর	১১৭
”	সাধু	১১৮
”	জং	১১৯
”	ক্লান্ত	১২০
”	রাত জানা ছড়া	১২০
”	জর্জ বার্ণার্ড শ	১২১
”	পলক	১২২
”	প্রদীপ	১২২
”	রোদের প্রার্থনা	১২৩
”	স্মৃতি	১২৪
”	হ্রদ	১২৫
”	দশানন	১২৬
”	শ্রীরাম	১২৭
অথবা কিন্নর	মুখ	১২৮
”	কিন্নর	১২৮
”	রোজ-নামা ঃ আষাঢ়	১২৯
”	বুড়ি	১৩০
”	জিৎ	১৩০
”	দূর ও নিকট	১৩১
”	ঝাপসা নাম	১৩১
”	শুদ্ধি	১৩২
”	খিড়কি	১৩২
”	বিফল নায়ক	১৩৩

অথবা কিন্নর	সরাই	১৩৩
”	কবিতা	১৩৪
”	বহতা	১৩৫
”	তারিখ	১৩৫
”	যোজনা	১৩৬
”	হলদী	১৩৭
”	বিভ্রম	১৩৭
”	পোড়ো বাড়িটা	১৩৭
”	অভাবিত	১৩৮
”	এই শহরে	১৩৯
”	কাচঘর	১৪০
”	নিষ্প্রদীপ	১৪১
”	কোনো এক পোড়ো ভিটেয়-রাত্রে	১৪২
”	একটি নির্জন প্রান্তর	১৪৩
”	নদী সদাগর পাথুরে পোল	১৪৩
”	ধন্যবাদ	১৪৪
”	ডয়াল	১৪৫
”	জানলায়	১৪৫
”	বালির কণা	১৪৬
”	নিরশ্রু	১৪৭
”	প্রদাহ	১৪৮
”	একটি ভাস্বর মানুষ	১৪৯
”	নকল মিছিল	১৪৯
”	জ্যোতিষ্ক সত্তা	১৫০
”	আশুতোষ	১৫১
”	খণ্ডিত কর্দম	১৫২
”	ঝরা পাতা	১৫৩
”	পরম্পরা	১৫৩
”	শান্তি	১৫৪
”	জাপানী হাইকু কবিতা	১৫৫
”	প্রমেথিউস	১৫৭
”	প্রথম দাঁত ওঠবার পর	১৫৮
কখনো মেঘ	মামলা	১৫৯
”	লুপ লাইনের গ্রামটা	১৬০

কখনো মেঘ	সাপ	১৬০
”	দিনটা	১৬১
”	আয়নায়	১৬১
”	ইস্তাহার	১৬২
”	বারান্দা	১৬৩
”	পাঠোদ্ধার	১৬৪
”	লগ্ন	১৬৫
”	হরিণ	১৬৬
”	পাবে	১৬৭
”	কলধ্বনি	১৬৮
”	জল্পনা	১৬৯
”	আরণ্যক	১৭০
”	বিস্ফোরক	১৭০
”	অগার্ণতিক	১৭১
”	নহবত	১৭২
”	ছলনা	১৭৩
”	মেঘ হয়ে দেখা	১৭৩
”	শব্দ	১৭৪
”	সনদ	১৭৫
”	কারিগর	১৭৫
”	দূর্বা	১৭৬
”	শ্যেন	১৭৭
”	শূন্য	১৭৭
”	তির্যক	১৭৮
”	সীতা	১৭৮
”	বাল্মীকি	১৭৯
”	মেঘটা	১৮০
”	রঙগ	১৮১
”	লঙকাভাগ	১৮২
”	রোগ	১৮৩
”	হাওয়া কি ঝরায় মন	১৮৪
”	গরমিল	১৮৫
”	পঁচিশে বৈশাখ	১৮৫
”	রবীন্দ্রনাথ	১৮৬
”	জ্যোতির্বন্যা	১৮৬
”	নাম	১৮৭

নদীর নিকটে	ওল্টানো দূরবীণে	১৮৮
”	চৌরঙ্গী	১৮৯
”	সর্পযজ্ঞ	১৯০
”	এক আকাশ অন্ধকার	১৯১
”	স্বরগ্রাম	১৯২
”	সাক্ষী	১৯২
”	অকীর্তিত	১৯৩
”	সময়	১৯৪
”	কলম	১৯৫
”	শপথ	১৯৬
”	চক্রান্ত	১৯৬
”	বিস্ফোরণ	১৯৭
”	দু পিঠে	১৯৭
”	এ শহর	১৯৮
”	ছাপ	১৯৯
”	ক্ষণিকা	২০০
”	ছোট্ট মানুষ	২০১
”	রোদ	২০১
”	উনিশ শো সত্তর	২০৩
”	নদীর নিকটে	২০৩
”	লেনিন	২০৪
”	ম্যাক্সিম গোর্কিকে নিবেদিত	২০৫
”	গুরু নানক	২০৬
”	সে মানুষ	২০৭
”	কান্না	২০৭
”	নিরালা	২০৮
”	গোপন	২০৯
”	রঙিন তারিখ	২০৯
”	নিরুদ্দেশ	২১০
”	নদী ও যদি	২১১
”	ন’উই আশ্বিন	২১১
”	তবু	২১২
”	টবে ক্যাকটাসের মত	২১৩
অনুবাদ	সর্গোদ্ভবা	২১৪
”	পানসীগুলো	২১৫
”	হাসি খুশি উইলিয়ম	২১৬

অনুবাদ	আসর	২১৬
”	চারটি কবিতা	২১৭
”	বন্দীর গান	২২০
হরিণ চিতা চিল	মেলা	২২১
”	ট্রেনের জানলা	২২২
”	হুক	২২২
”	শিকার	২২৩
”	দাম	২২৪
”	ঘুম পাহাড় জুড়ন দ্বীপ	২২৫
”	ইশারা	২২৬
”	অঙ্ক	২২৭
”	অনাবিস্কৃত	২২৭
”	কাগজের নৌকো	২২৮
”	কালিদাস	২২৮
”	পর্দা	২৩১
”	হিসাব	২৩১
”	দ্বিজ	২৩২
”	সেইখানেই	২৩৩
”	তেরো নদী	২৩৪
”	চিত্ত সহচর	২৩৫
”	নিরর্থক	২৩৫
”	অধ্যাহার	২৩৬
”	লক্ষ্মণ	২৩৮
”	সীমান্ত	২৩৯
”	বন্দিনী	২৪০
”	হরিণ চিতা চিল	২৪১
”	শঙ্কাশুদ্ধি	২৪২
”	ভস্মলোচন	২৪২
”	ফোঁড়া	২৪৩
চীনা তর্জমা	দস্যুহীনগর	২৪৪
”	ভেল্‌কি	২৪৪
”	খুঁত	২৪৫
”	মেলাবে	২৪৫

নতুন কবিতা	শ্যামা	২৪৭
”	প্রভৃতি	২৪৮
”	বই নয়	২৪৮
”	পার্থিব	২৪৯
”	কেউ না	২৪৯
”	অন্ধকার	২৫০
”	মানুষ	২৫১
”	স্টেশন	২৫২
”	দিন	২৫২
”	দেখেছি	২৫৩
”	রামমোহন	২৫৪
”	লেনিন	২৫৬
”	মহানায়ক	২৫৭
”	স্বাদেশিক	২৫৭
”	শতাব্দী	২৫৯
”	কলম	২৬০
”	হয়তো	২৬১
”	স্মৃতি	২৬২
”	প্রলয়-বিধাতা	২৬২
”	গলদ	২৬৩
”	মেঘলা দিনটা	২৬৩
”	প্রলয়ের পর	২৬৪
”	বহুতা	২৬৬
”	অহৈতুক	২৬৬
”	জবাব	২৬৭
”	ফুলকি	২৬৮
”	উদ্ভাবন	২৬৮
”	উদ্ভাসন	২৬৯
”	স্বপ্নচারী	২৭০
”	অবিস্মরণীয়	২৭১
”	তরল মুকুর	২৭১
”	বড়দিন	২৭২
”	নিয়তি	২৭৩
”	ছাপা না	২৭৪
”	দিশারী	২৭৪
”	কেন?	২৭৫

নতুন কবিতা	দিনরাত্রি	২৭৫
"	এক যে ছিল	২৭৬
"	মানুষের মাপ	২৭৭
"	ঘুম ভাঙলেই	২৭৭
"	শতাব্দী	২৭৮
"	উচ্চৈঃশ্রবা	২৭৯
"	সার্াদিন	২৮০
	কয়েকটি সকাল	২৮১
	আদিম	২৮২
"	সূত্রধার	২৮৩
	বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি	২৮৪
[illegible] কবিতা	ভাবনা	২৮৬
"	সত্য	২৮৬
"	আত্মীয়তা	২৮৭
"	নমুনা	২৮৭
"	পথিক	২৮৮
"	প্রতীক্ষা	২৮৯
"	নিজের গান গাই	২৮৯
"	ভাবি কালের কবি	২৯০
"	নিখুঁত	২৯১
"	তোমাকে	২৯১
"	হে পাঠক	২৯১
"	পোমানক থেকে যাত্রা	২৯১
"	ব্যাপ্তি	২৯২
"	মায়া	২৯৩
"	খেয়াপার	২৯৩
"	ত্রিকাল	২৯৬
"	জনাকীর্ণ নগরে	২৯৮
"	কাঠুরে	২৯৮
"	কল্মাসের প্রার্থনা	৩০৯
"	শুনেছি আমেরিকার গান	৩১২
"	তৃণ প্রান্তর	৩১২
"	বাজুক দামামা	৩১৩
"	হে অধিনায়ক	৩১৪

হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা	এই সত্তা এই জীবন	৩১৫
”	দর্শন সার	৩১৬
”	একটি মাকড়সা	৩১৬
”	বিদায়	৩১৭
”	মাটি চষছে কিষাণ	৩১৭
”	দেশান্তরী	৩১৭
”	আমি অচঞ্চল	৩১৮
”	ভারত পথিক	৩১৯
”	জ্যোতিষী পণ্ডিত বলেন	৩২৪
”	গণতান্ত্রিক	৩২৪
”	নালিশ	৩২৫
”	অনন্তদোলা	৩২৫
”	কোনসাধারণ পতিতার প্রতি	৩৩২
”	ব্যর্থ বিপ্লবীকে	৩৩৩
”	সমাপ্তি সংগীত	৩৩৫
বিচ্ছিন্ন কবিতা	হঠাৎ যদি	৩৪৩
	শতবর্ষ পরে	৩৪৪
	ধ্বনির হৃদয়ে	৩৪৪
	গোপন	৩৪৬
তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ পরিচয়		৩৪৯
কবিতার প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী		৩৬৩

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
সমগ্র কবিতা

প্রথমা

লক্ষ্যভ্রষ্ট

এ মাটির ঢেলা কবে কে ছুঁড়িল সূর্যের পানে ভাই
পৃথিবী যাহার নাম ?
লক্ষ্যভ্রষ্ট চিরদিন সে যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফেরে
সূর্যেরে অবিরাম।

তারি সন্ততি, আমাদেরও ভাই ব্যর্থ যে সন্ধান,
লক্ষ্য গিয়াছি ভুলি;
মোদের সকল স্বপনের গায় জানি না কেমন করি'
লেগেছে মলিন ধূলি।
মাটি ও পাথর কাটি' আর কুঁদি' দেবতা গড়িনু ঢের,
মাগিলাম কল্যাণ;
বেদীমূলে তার তবু শোণিতের দাগ লেগে থাকে ভাই,
—দেবতার অপমান!
কত জীবনের কত সমাধির সমিধ্ লইয়া ভাই,
যে আলো জ্বালায়ে তুলি,
দেখি তার জ্যোতি বিফলে মিলায়, নাচে শুধু ভয়াবহ
সর্পিল শিখাগুলি।

ব্যাধিবন্ধনে বাঁধিব যাহারে, তাহারে পরাই বেড়ি,
—সে মোর আপন ভাই!
জীবন যাহারে ঘিরি' গুঞ্জরে, তারি সূর্যের আলো
দুই হাতে আগলাই।

তারকা-লোকের জেনেছি ছন্দ, সূর্যোদয়ের বাণী,
সৃজিয়াছি ভালবাসা,
তবু হিংসার অন্ধ কারায় সভয়ে লালন করি
শুধু বাঁচিবার আশা!

পথভ্রান্ত দেবতা মোদের, নয়নে অমৃত-ভাতি
হিংস্র নখর হাতে;
জানি তার বাণী সর্বনাশিনী, তবুও চলিতে হবে
তারি মূক ইশারাতে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট পৃথিবীর ভাই সে আদিম অভিশাপ
বহি মোরা চিরদিন;
আকাশের আলো যত করি জয়, মিটিবে না কভু তাই
আদি পঙ্কের ঋণ।

সুদূরের আহ্বান

অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম,
চেন কি তাদের ভাই ?
দুই তুরংগ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
দুয়েরি বল্গা নাই !

পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে, আকাশের সীমা নাই,
ঘরের দেওয়াল তাই ফেটে চৌচির।
প্রভঞ্জনেব বিবাগী মনের দোলা লেগে নাচে ভাই,
তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির !

বলি তবে ভাই শোন তবে আজ বলি,
অন্তরে আমি তাদের দলের দলী;
রক্তে আমার অমনি গতির নেশা;
নাসায় অগ্নি স্ফুরিছে যাহার, বিজলি ঠিকরে ক্ষুরে
আমি শুনিয়াছি সে হয়রাজের হ্রেষা !

যে শোণিতধারা ঘুমায়ে কাটাল পুরুষ চতুর্দশ,
দেখি আজো ভাই লাল তার রঙ তাজা তার জৌলস!
আজ তার মাঝে শুনি সে প্রথম সাগরের আহ্বান,
করি অনুভব কল্পনাতীত সৃষ্টির উষা হতে,
তার জয় অভিযান !

তপতী কুমারী মরু আজ চাহে প্রথম পায়ের ধূলি।
অজানা নদীর উৎস ডাকিছে ঘোমটা আধেক খুলি।
নিঃসংগ গিরিচূড়া,
তুহিন তুষার-শয়নে আমারে স্মরিছে বিরহাতুরা।

উত্তর মেরু মোরে ডাকে ভাই, দক্ষিণ মেরু টানে,
ঝটিকার মেঘ মোরে কটাক্ষ হানে;
গৃহ-বেষ্টনে বসি,
কখন প্রিয়ার কণ্ঠ বেড়িয়া হেরি পূর্ণিমা-শশী!

সুশীতল ধারা নদীটি বহুক মর্মরে তব তীরে,
গৃহবলিভুক পারাবতগুলি কূজন করুক ঘিরে,
পালিত তরুর ছায়ে থাক ঢাকা তোমাদের গৃহখানি,
স্তোত্র রচিও, যদি পার তব প্রিয়ার আঁখি বাখানি'।
ছোট এই আশা, সুখ,
ঈর্ষা করি না, ঘৃণা নহে ভাই, শুধু নহি উৎসুক!

মনের গ্রন্থি জটিল বড় যে, খুলিতে সহে না তর;

প্রথমা

সোহাগের ভাষা কখন শিখি যে নাই মোটে অবসর;
শুনে কাল হ'ল ভাই,
অরণ্য-পথ গভীর গহন, সাগরের তল নাই!

অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম,
আমি যে তাদের চিনি।
দুই তুরঙ্গ তাহাদের রথে, উদ্ধত উদ্দাম,
—শোন তার শিঞ্জিনী।

মোদের লগ্ন-সপ্তমে ভাই রবির অট্টহাসি,
জন্ম-তারকা হয়ে গেছে ধূমকেতু!
নৌকা মোদের নোঙর জানে না,
শুধু চলে স্রোতে ভাসি—
কেন যে বুঝি না, বুঝিতে চাহি না হেতু!

কবি

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের!

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই!

মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত,
সাগর মাগিছে হাল,
পাতাল-পুরীর বন্দিনী ধাতু,
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল,
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে
বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাহি যে হায়!

মাটির বাসনা পুরাতে ঘুরাই
কুম্ভকারের চাকা,
আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি
দুঃসাহসের পাখা,
অভ্রংলিহ মিনার-দম্ভ তুলি,
ধরণীর গূঢ় আশার দেখাই উদ্ধত অংগুলি!

জাফ্‌রি কাটান জানালায় বুঝি
পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া,
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারংগ
ঘনায় নিশীথ মায়া।
দীপহীন ঘরে আধো নিমীলিত
সে দু'টি আঁখির কোলে,
বুঝি দু'টি ফোঁটা অশ্রুজলের
মধুর মিনতি দোলে,
সে মিনতি রাখি সময় যে হায় নাই;
বিশ্বকর্মা যেথায় মত্ত কর্ম্মে হাজার করে
সেথা যে চারণ চাই!

আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই,
ছুতোরের ধরি তুরপুন,
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে,
জাল ফেলি কোন্ দরিয়ায়!
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ংগ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
—কুঠার ঘায়।

সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,
স্বপনবাসরে বিরহিণী বাতি
মিছে সারারাতি পথ চায়,
হায় সময় নাই!

সেতু

বিরাট সেতু সে এধারের সাথে ওধারে জুড়িতে চায়,
সে সেতু হয়েছে পার?
এধারে তাহার আলো জ্বলে না ক' ওধারে অন্ধকার;
—সেতু সে বৃহদাকার!

প্রথমা

এধারে যাহার মাটির দম্ভ, ওধারে মাটির মায়া,
পদতলে যার অশ্রুর মত জল,
সে সেতু নহে ক', বিবাহ দেয়নি এপারে ওপারে ভাই,
রাখিবন্ধন নহে, শুধু শৃঙ্খল;
এধারে ওধারে জুড়ে দিতে চায় কঠিন বাঁধনে ভাই—
সেতু সে বিপুল বল।
ফুল হ'তে ফলে যে গোপন সেতু—
জানি রহস্য তার;
তারা হ'তে তারা যে সেতু উতরে
লঙ্ঘি অন্ধকার,
তারো সন্ধান মেলে কিছু কিছু—
নিশীথ রাত্র ভরি;
শুধু এ সেতুর হেতু জানি না কো
উতরিতে ভয়ে মরি।

সব কিছু সে যে পার হয়ে চলে তবু কোথা নাহি পার,
তীর নাহি মিলে সেতু সে নিরুদ্দেশ!
কঠিন বাঁধনে সব কিছু বাঁধে তবু লাগে না ক' জোড়া,
যোজনার মাঝে বেদনার রহে রেশ!
সূর্যের পানে উদ্ধত তার যাত্রার শুরু ভাই,
অতল আঁধারে উৎরাই তার শেষ।
বিরাট সেতু সে লঙ্ঘিতে চায় শিশির-কণিকাটিরে,
সে সেতু হয়েছ পার?
এধারে তাহার বন্ধ্যা ধরণী, অন্ধ আকাশ শিরে,
—সেতু সে ব্যর্থতার!

বেনামী বন্দর

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভীড়!
মাল বয়ে বয়ে ঘাল হ'ল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,

আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়।

কূলহীন যত কালাপানি মথি'
লোনা জলে ডুবে নেয়ে,
ডুবো পাহাড়ের গুঁতো গিলে আর
ঝড়ের ঝাঁকুনি খেয়ে,
যত হয়রান লবেজান তরী
বরখাস্ত্ হ'ল ভাই,
পাঁজরায় খেয়ে চিড়;
মহাসাগরের অখ্যাত কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
সেই—অথর্ব ভাঙা জাহাজের ভীড়।

দুনিয়ায় কড়া চৌকিদারী যে ভাই
হুঁশিয়ার সদাগরী,
হালে যার পানি মিলে নাক' আর, তারে
যেতে হবে চুপে সরি!
কোমরের জোর কমে গেল যার ভাই,
ঘুণ ধরে গেল কাঠে, আর যার
কলজেটা গেল ফেটে,
জনমের মত জখম হ'ল যে যুঝে;
সওদাগরের জেটিতে জেটিতে
খাতাখানা-খানা ঢুঁড়ে,
কোন দপ্তরে ভাই,
খারিজ তাদের নাম পাবে নাক' খুঁজে!

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
সেই সব যত ভাঙা জাহাজের ভীড়,—
শিরদাঁড়া যার বেঁকে গেল
আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে
কব্জা ও কল বেগড়াল অবশেষে,
জৌলস গেল ধুয়ে যার আর
পতাকাও পড়ে নুয়ে;
জোড় গেল খুলে,
ফুটো খোলে আর রইতে যে নারে ভেসে,
—তাদের নোঙর নামাবার ঠাঁই

দুনিয়ার কিনারায়,
—যত হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের নীড়!

মাটির ঢেলা

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
রঙ দিলে কে তোর গায়ে?
গড়লে তোরে কোন্ আদলের ছাঁচে?
ভুখ দিলে যে বুক দিলে যে
দুখ দিতে ভুলল না,
মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে পাছে।

কোন্ মেলাতে সাজিয়ে দিলে
বিকিয়ে দিলে কার হাতে?
কোন্ খেয়ালির খেলেনা তুই হায়রে!
কোলের 'পরে দুলিস্ কভু
মাটির 'পরে যাস্ পড়ে—
মলিন ধূলা লাগে সকল গায় রে!

আঘাত পেলে বুক ফাটে তোর,
চোখের জলে যাস্ গলে,
চোট্ খেয়ে তুই লুটিয়ে পড়িস ভুঁয়ে।
কান্না হাসির দোলা লাগে,
রঙ যা কিছু যায় চটে,
বর্ষাধারায় যায় রে সে যায় ধুয়ে।

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
ডাক্ছে তোরে তোর মাটি,
টান্ছে আপন স্নেহ-শীতল কোলে।
ঢেউ-এর 'পরে জীবন-ভেলা
এমন সেথা দুল্‌বে না,
ভিড়বে না ক' ভীড়ের হট্টগোলে।

ব্যাঘাত নাহি আঘাত নাহি
খাম্‌খেয়ালির নেই খেলা,
নেইক' মরণ-ভয়ের ভীষণ ভ্রূকুটি।

বৃষ্টি-পরশ-সরস দেহে
জাগবে তৃণ হয়ত রে,
একটি ছোট উঠবে কুসুম ফুটি'।

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
ভুললে তোর চল্‌বে না,
তুই যে মাটি চিরকালের মাটি।
হঠাৎ কারিকরের হাতে
যদি বা রঙ যায় লেগে,
মাটি রে তুই মাটিই তবু খাঁটি।

নমস্কার

জীবন-বিধাতা আজি বিদ্রোহীর লহ নমস্কার!
লহ এই প্রীতিহীন প্রণিপাতখানি।
ক্রীতদাস মানবের মৃত্যু-পুর হ'তে,
আজি কমণ্ডলু ভরি'
আনিয়াছি স্বেদ ও শোণিত,
—পূত পূজা-বারি।
আনিয়াছি পুঞ্জিত কালিমা
লেপিতে ললাটে তব চন্দন বিহনে,
পূজা তব আজি বিপরীত!
বিশ্বজোড়া হাহাকারে বাজে আজ নব-স্তোত্র তব,
অভিনব স্তুতি;
চিতাগ্নিতে অপরূপ আরতি তোমার,
ভস্মশেষে নৈবেদ্য নূতন।
নশ্বর মৃত্তিকা গেহে,
জর্জর তৃষিত দীন, যত নরনারী,
ধূলির মলিন অঙ্কে ধূলিসম শেষে,
বিদায় লইয়া গেল
গোপনে ফেলিয়া অশ্রুবারি;
তাহাদের সব ব্যথা, সব গ্লানি, জ্বালা, অভিশাপ,
পাপ, তাপ, লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা ও ক্রন্দন,
প্রতি ক্ষুদ্র দিবস-রাত্রির ঘৃণিত জীবন-যাত্রা,—
কলঙ্ক হতাশা আর কদর্য কলুষ,
সযতনে করিয়া চয়ন,
এ মোর প্রণামখানি করিনু বয়ন।
সেই নমস্কার,
তোমারে অর্পিণু আজি হে জীবন-বিধাতা আমার।

স্বপ্নদোল

জীবন-শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল,—
ওর ব্যর্থ-ব্যথাতুর,
সে মিথ্যায় মত্ত হয়ে সত্য তোর ভোল।
ব্যথিত শ্বাসের বাষ্পে ইন্দ্রধনু রচি ইন্দ্রজালে,
যদি সে মৃত্যুর মরু মরীচিকা সৃজিয়া সাজালে
অনন্ত মৌনতা মাঝে কাতর দরদী,
এক কণা সুর লাগি
এত করি সাধিল সে যদি,
সৃষ্টির পাণ্ডুর ওষ্ঠে শীতল তিক্ততা,
অন্তরের নির্মম রিক্ততা,
ক্ষণিকের অপ্রচুর
শীর্ণ শুষ্ক হাসির ছলনা দিয়া রাখিতে আবরি,
এত সকাতর ব্যর্থ চেষ্টা যাব
শুধু তার সকরুণ প্রেমটিরে স্মরি,'
আজি তবে সযতনে হাস্য টানি ব্যথাম্লান মুখে,
নিদারুণ কপট কৌতুকে,
রঙীন বিষের পাত্র ওষ্ঠে তুলি' ধরি'
যাব পান করি'!
অবিশ্বাসী প্রিয়ারেও অসঙ্কোচে দিব আলিঙ্গন,
যে অধর করিল বঞ্চনা,
তাহারেও করিব চুম্বন।
যে আশার ম্লান দীপখানি,
তিমির রাত্রির তীরে আতঙ্কে শিহরি
বহুক্ষণ নিভে গেছে জানি,
তারি আলো আছে করি ভান
কণ্টকিত লক্ষ্যহীন পথে নিরুদ্দেশে করিব প্রয়াণ
—মিথ্যা অভিযান।

যে প্রেম জীবনে কভু মুঞ্জরে না, তারি মৃতমূলে
সমস্ত জীবন-রস
নিঙাড়িয়া সঁপি দিল, জ্ঞাতসারে ভুলে,
মর্ম্মগ্রন্থি খুলে।
ছল করি ভালোবাসি জরা শোক-জর্জরিত
মূল্যহীন এ মাটির শব,
আগ্নেয় আয়ুর দ্বীপে ক্ষণকাল তরে
তার লাগি আয়োজিব মিথ্যা মহোৎসব।

যদিও সকল হাস্য-ফেনপুঞ্জতলে
জানি ক্ষুব্ধ ব্যথা-সিন্ধু দোলে;
যদিও অশ্রুর মূল্যে কোন স্বর্গ মিলিবে না জানি,
হাসি-অশ্রু-উচ্ছলিত তবুও রঙীন
এ বিস্বাদ জীবনের বিষপাত্রখানি
ওষ্ঠে তুলি' ধরি,'
নিঃশেষিয়া যাব পান করি,—
শুধু তার সযতন অনুরাগ স্মরি'
জীবন-শিয়রে বসি দোলা দেয় যে স্বপন-সুন্দরী।

দেবতার জন্ম হ'ল

দেবতার জন্ম হ'ল।
দেবতার জন্ম হ'ল, সুপবিত্র সুন্দর প্রভাতে
মাটির কোলের 'পরে—
মার বুকে,
বিধাতার আশীর্বাদ লয়ে।

এমনি আমার ভগবান
বার বার জন্ম ল'ন মার বুকে
সুপবিত্র ধরণীর কোলে।
তার পর চেয়ে দেখি—
কোথা মোর ভগবান?
জীর্ণ গৃহ, আবর্জনা চারিদিকে,
তার মাঝে আলোহীন বায়ুহীন কক্ষে,
ছিন্ন শয্যা 'পরে শুয়ে
রোগ-রুক্ষ ক্ষুধা-ক্ষীণ দেহ লয়ে
দেবতা আমার
ফেলে দীর্ঘশ্বাস!
আলোকের দেবতার আলো নাহি মিলে,
মিলে না ক' বায়ু।
রজনীর লক্ষ তারা চেয়ে চেয়ে খোঁজে আর কাঁদে-
দেবতারে খুঁজে নাহি পায়।

কিংবা দেখি—
চিনিতে না পারি;
আমার দেবতা এ কি?
কলুষ-বীভৎস মুখ,

দৃষ্টিভরা পাপে,
অঙ্গে অঙ্গে চিহ্ন কলঙ্কের—
এই কি গো দেবতা আমার ?
—মার কোলে জন্ম যার
জন্ম যার এ পবিত্র মৃত্তিকার 'পরে!

কার পাপ নিজেরে শুধাই—
মোর ভগবান হ'ল অন্নের কাঙাল,
বিকৃত কুৎসিত আর আতত্রায় বামন,
রুদ্ধ-বৃদ্ধি বুভুক্ষিত কদাকার প্রাণ!
কার পাপ ?

এ আমার, এ তোমার এ যে সর্ব মানবের পাপ।
দেবতার আলো করি' চুরি,
অন্ন রাখি কেড়ে,
শাস্তি তাই যায় বেড়ে বেড়ে দিনে দিনে।
যত জন্ম ব্যর্থ করি দেবতার,
যত প্রাণ পুষ্টি বিনা মরে,
মানবের যাত্রা পথে
তত জমে সুবিপুল বাধা আবর্জনা।
দেবতার ব্যর্থ জন্ম!
—সেই অশ্রু জমে আর জমে
বিধাতার নেত্রকোণে;
যত গ্লানি মানবের হতেছে সঞ্চয়
সেই অশ্রু-প্লাবনের ভাঙন ধারায়
মুছে যাবে কোন্ দিন।
সেই দিন হব শুচি।

আজ
বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে,
কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর;
আর কাঁদে পাতকীর বুকে
ভগবান প্রেমের কাঙাল!
—এক দিন মার কোলে জন্ম ল'য়ে শিরে লয়ে মার স্নেহাশিস,
আর দিন সুন্দর আমার
স্বার্থে লোভে ক্রূরতায়, হিংসায় প্রচণ্ড লালসায়
কুৎসিত, জঘন্য, ভয়ঙ্কর মানবের পুরী হ'তে,
পঙ্কমাখা, শীর্ণ, ক্ষীণ, হিংসায় বিক্ষত,
কদাকার, লালসা-জর্জর,

বিদায় লইয়া যান,
একটি করুণ শুধু রাখি দীর্ঘশ্বাস।

'দ্বার খোল'

'দ্বার খোল, খোল দ্বার, রাত্রির প্রহরী!'
—কেঁদে কয় হতভাগ্য নিঃসম্বল মানবের দল,
কেঁদে কয় দিকে দিকে নিযুত জীবন।

অন্নে যে ভরে না বুক,
তৃষা যে অতৃপ্ত থেকে যায়,
প্রাণ আলো চায়!
শূন্য ক্ষণগুলি
অকাজের সহস্র জঞ্জালে ভরিয়া তুলিতে নারি,
আর ভালো নাহি লাগে।
দ্বার খোল হে প্রহরী,
আনো নব উষালোক,
সঞ্জীবিত কর আজ নূতন অমৃতে,
নব-সৃষ্টি-গুঞ্জন-মুখর, ধরাতলে জন্ম দাও।

মোর মাঝে কোন্ প্রাণ-মহানদ
ছুটিয়াছে অন্তহীন অসীমের লাগি,
তাহারে চিনাও।
আবর্তে ঘুরিয়া মরে অন্ধ-মোর বন্ধ প্রাণধারা,
বেদনায় সারা,
তাহারে দেখাও পথ—
দ্বার খোল, দ্বার খোল রাত্রির প্রহরী!
শুনেছ কি, শুনেছ কি অন্ধকার রন্ধ্র করি'
আলোকের আর্তস্বর, কাঁদে প্রতি তারকায়
কাঁদে সারানিশি!
তারে মুক্তি দাও।

যাহা আছে তাহা আছে ঢাকি,
যাহা পাই ভার হয়ে থাকে—
সত্যেরে চিনিব কোন্ ফাঁকে?
হে প্রহরী, হানো অসি নিশার মরমে,—
যুগ যুগান্তের এই সঞ্চিত আঁধার কেটে যাক
বেদনার উষ্ণ রক্তধারে;
রক্ত-পারাবার হতে উদ্বোধন হোক আজ নূতন উষার।

অপূর্ণ

সেথা তুমি পূর্ণ ছিলে
আপনাতে আপনি মগন,
আনন্দের স্পন্দহীন নিশ্চল গগনে;
তাই বুঝি সৃজিলে আমারে
কাঁদিবার লাগি।

কাঁদিবার সাধ,
তাই তুমি মোর সাথে ছোট হবে, লুটাবে ধূলায়,
আঘাত করিবে আপনারে,—মূঢ় অবিশ্বাসে,
আবার ভাসিবে আঁখিনীরে।

সেথা তুমি পূর্ণ ছিলে—
শুধু সেথা ছিল না ক' আঁখিজল,
বিরহ বেদনা আর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।
আমার মাঝারে তাই
এমন করিয়া তুমি কাঁদ,
কাঁদ এত রূপে।
অকারণে কাঁদ একবার
জীবনের তীরে নামি
চিহ্নহীন বালুচরে,
পুনঃ কাঁদ প্রেয়সীর, প্রেয়সীব লাগি।
বার বার দুরন্ত যৌবনে;
তার পর সমস্ত জীবন ধরি'
সংশয়ে, দ্বিধায় দ্বন্দ্বে,
বঞ্চনায়, আঘাতে ও হতাশায়
কাঁদ নানা ছলে।
নিখিল ভুবন ভরি' খেলিতেছ কাঁদিবার খেলা
অনাদি অতীত কাল ধরি'।
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি,
সে খেলায় মাতি
কোথায় নেমেছ তুমি মোর সাথে,—
জঘন্য পাপের মাঝে, বীভৎস ক্ষুধায়,
অসহ্য গ্লানির পঙ্কে,
পূতি-গন্ধভরা, অচিন্ত্য-কলুষে হীনতায়।

মোর সাথে পাপী হ'লে
বুকে তুলে নিলে মোর তাপ;
মোর সাথে দুর্ব্বহ ব্যথার বোঝা স্কন্ধে নিলে তুলে,

পিশাচ সেজেছ মোর সাথে,
কুটিল, নির্মম, ক্রূর, নৃশংস, নির্দয়।
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, আর বসে রই
স্তব্ধ হয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে।
তোমার কান্নার খেলা অপরূপ, অদ্ভূত, ভীষণ, বুদ্ধির অতীত।
যত কান্না ধরণীতে;
তার মাঝে তুমি কাঁদ এই শুধু জানি—
আর ধন্য আপনারে মানি!

প্রার্থনা

আজ আমি চলে যাই
চলে যাই তবে।
পৃথিবীর ভাই বোন মোর,
গ্রহ তারকার দেশে,
সাথী মোর এই জীবনের
—কেহ চেনা কেহ বা অচেনা,
তোমাদের কাছ হতে চলে যাই আজ।
কোথায় দু'ফোঁটা জল শুখাইবে তপ্ত ভূমিতলে,
একটি করুণ শ্বাস মিলাইবে উতলা বাতাসে,
আজ দিয়ে যাব না ক' সন্ধান তাহার!
নীল আকাশের গ্রহে একটি প্রার্থনা মোর,
রেখে যাই শুধু,
স্পন্দহীন বক্ষপুটে,
রেখে যাই মৃত্যুম্লান মর্মকোষে মোর।
যে কেহ আমার ভাই, যে কেহ ভগিনী,
এই ঊর্মি-উদ্বেলিত সাগরের গ্রহে,
অপরূপ প্রভাত সন্ধ্যার গ্রহে এই,
লহ শেষ শুভ ইচ্ছা মোর
বিদায় পরশ, ভালোবাসা;
আর তুমি লও প্রিয়া মোর
অনন্ত রহস্যময়ী,
চির কৌতূহল-জ্বালা
অসমাপ্ত চুম্বনখানিরে,
তৃপ্তিহীন।
যদি প্রেম সত্য হয়,
যদি সত্য হয় এই অশ্রুর সাধনা,

তবে আর বার
অদেখা আকাশে কোন,
কোন নীহারিকা পুঞ্জে
নব-সূর্য উদ্ভাসিত সে কোন সুন্দরী তারকার
হবে ফিরে পরিচয়?
—নাহি জানি।
নয় এই অযাচিত নিষ্ঠুর বিদায়।

আজ আমি চলে যাই;
যত দুঃখ সহিয়াছি,
বহিয়াছি যত বোঝা, পেয়েছি আঘাত,
কাটায়েছি স্নেহ-হীন দিন,
আজ কোন ক্ষোভ নাই তাহাদের তরে,
কোন অনুতাপ আজ রেখে নাহি যাই!
একটি আকাঙ্ক্ষা শুধু
জ্বেলে রেখে গেনু।
আজো যারা আসে পিছে,
অনাগত পৃথিবীর ভ্রূণ-শিশু যত,
তারা যেন পৃথিবীরে এমন করিয়া নাহি দেখে।
আজ যারা বাসিতে পেল না ভালো,
আমাদের চারিপাশে আজ যত প্রাণ,
অন্যায় দারিদ্র্যে আর হীন লালসায়
অন্ধ পঙ্গু হয়ে কাঁদে অশ্রুজলে উষ্ণ অভিশাপ,—
তাহাদের সকল বেদনা
আজিকার মানবের যত গ্লানি পাপ,
আমাদের সাথে যেন মোরা সব
মুছে লয়ে যাই।
যারা আজো জন্ম লয় নাই,
তাহাদের প্রেম
ব্যর্থ নাহি হয় যেন এমন করিয়া
লোভের, ক্ষুধার ফাঁদে,
দেবতার দ্বার যেন তাহাদের তরে
আজিকার মত রোধ
নাহি করে স্বার্থ অসংগত,
কপটতা, মোহ, প্রবঞ্চনা,
হিংসা, অহংকার;
পৃথিবী সুন্দর হয় যেন।
বিধাতার আশীর্বাদ লোভ যেন নাহি কেড়ে রাখে

স্বার্থ করে অন্যায় বণ্টন;
প্রেম বিনা কারো জন্ম ব্যর্থ নাহি হয় যেন,
ছিঁড়ে যায় লালসার জাল,
ধুয়ে যায় আজিকার সব ক্ষুদ্র গ্লানি মলিনতা।

দিকে দিকে কোটি গৃহ ভেঙে পড়ে আজ,
প্রচন্ড লোলুপ এই মানবের বাসনার ঝড়ে।
উপবাসী কাঁদে মাতা মোহমত্তা নারীর অন্তরে,
কাঁদে প্রিয়া উৎপীড়িতা বারাঙ্গনা-বুকে,
—দেবতা কাঁদেন ভাঙা ঘরে।

পৃথিবীর ভাই বোন মোর
এই বিলাপের গ্রহে, মোর কান্না রেখে যাই আজ,
একটি বাসনা আর।
পশ্চাতে আসিছে যারা
তারা যেন ধরণীর এ কলুষ, দেখিতে না পায়;
মোদের চোখের জলে শেষ হোক সব তাপ গ্লানি
শেষ হোক মানব-আত্মার এই কাতর কাকুতি,
আমাদের বেদনায়।
তারা যেন সবে ভালোবাসে।

মৃত্যুরে কে মনে রাখে?

মৃত্যুরে কে মনে রাখে?
—মৃত্যু সে ত মুছে যায়।
যে তারা জাগিয়া থাকে তারে লয়ে জীবনের খেলা,
ভুবনের মেলা।
যে তারা হারাল দ্যুতি, যে পাখী ভুলিয়া গেল গান,
যে শাখে শুখাল পাতা
এ ভুবনে কোথা তার স্থান?
নিখিলের ওষ্ঠপুটে ওষ্ঠ রাখি করিছে যে পান,
হে কবি আজিকে তার—
তার তরে রচ শুধু গান।
রচ গান যৌবনের।

যে প্রেমের চিহ্ন নাই লাজরক্ত কোমল কপোলে,
কম্পমান হৃদ্‌পিণ্ডে, দুর্নিবার রুধিরের দোলে,
তার তরে অকারণ শোক।
বারবার ছেড়ে তার জীর্ণতা-নির্মোক

জীবনের যাত্রা হেরি মহাকাশ ব্যেপে,
তারায় তারায় তার জয়ধ্বনি উঠে কেঁপে কেঁপে।
মৃত্যু-শোক-স্তব্ধ গৃহদ্বারে,
আসে বারে বারে
সমারোহে শিশুর উৎসব,
বেদনার অন্ধকার বিদারিয়া প্রতিদিন, দেখা দেয় প্রদীপ্ত গৌরব,
নির্লজ্জ শিশুর হাসি।
কবরের মৃত্তিকায়, অবহেলি অশ্রুধারায়
তৃণে জাগে প্রাণ অবিনাশী।

ওরে ম্রিয়মাণ কবি উঠে বোস, শোক-শয্যা তোল
বন্ধুর বিরহ-ব্যথা ভোল,
কান পেতে শোন্ বসে জীবনের উন্মত্ত কল্লোল—
আকাশ বাতাস মাটি উতরোল আজি উতরোল!

আশীর্বাদ

আজি এই প্রভাতের আশীর্বাদখানি,
লও তব মাথে,
হে নগরী,
লও তব ধূলি-ধূম-ধূম্র-জটা-বিভূষিত শিরে।
তব লৌহ-কাষ্ঠ-শিলা কারাগার হতে,
রক্তমসী-কলঙ্কিত, যন্ত্র-জর্জরিত তব
কর দুটি জুড়ি
আজি এই প্রভাতেরে কর নমস্কার।

মোহের দুঃস্বপ্নজাল বারেক ছিঁড়িয়া দুই হাতে
ঊর্ধ্বে চাহ অভিশপ্তা
ওই নীল আকাশের পানে,
পূরব সীমান্তে যেথা দিবসের মাঙ্গলিক বাজে
আলোকের সুরে।

তোমার ব্যথিত বক্ষে,
অন্ধকারে যেথা
অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড জ্বলে দিকে দিকে,
হারায় কঙ্কাল-পথ
বিকারের পয়োনালী মাঝে,
লুকায় সুড়ঙ্গ লাজভরে মৃত্তিকার তলে,
লোভ হিংসা ফেরে ছদ্মবেশে

অন্ধকারে নিঃশব্দ লোলুপ,—
সেথা আজ ডেকে আন প্রভাত আলোরে;
তার সাথে আন শান্তি;
লোভ দীর্ণ তব ক্ষুব্ধ বুকে,—
লালসার দৈন্য যাক ঘুচে।
যন্ত্রের চক্রান্ত ভাঙি,
ভেদ করি ষড়যন্ত্র লৌহে আর লোভে
আসুক প্রভাতখানি,
—সৌম্য শুচি কুমার সন্ন্যাসী
হে পতিতা তোমার আলয়ে।
পুঞ্জীভূত সমস্ত কালিমা,
সমস্ত সঞ্চিত ব্যথা, লজ্জা গ্লানি পাপ,
মনস্তাপ বহু মানবের
ব্যাধি ও বিকার
সযত্নে লালিত,
—দূর হোক সব আবর্জনা,
আলোকের কল্যাণ ধারায়।

শক্তির সাধনে মাতি,
হে উন্মত্তা নারী-কাপালিক,
অগণন জীবনের আশার শ্মশানে
আনন্দের শবাসনে বসি,বচ্ছা-নির্বাসন হয়ে যাক শেষ।

আজ তব
শক্তি-সুরা রক্ত-নেত্রে ভ্রূকুটির তলে
বিহঙ্গেরা বাঁধে নাই নীড়;
প্রস্তর-নিষেধ-প্রান্তে জাগিছে সভয়ে
শীর্ণ তৃণ, বিবর্ণ কুসুম,
সঙ্কুচিত দুর্বল কাতর
যন্ত্রের জটিল পথে
বিকলাঙ্গ জীবনের
হেরি শুধু ব্যঙ্গ-সমারোহ।
সুন্দরেরে গিয়াছিলে ভুলি;
সীমাহীন আকাশের সুনীল বিস্ময়
রাত্রির রহস্য আর আলো গন্ধ রূপ,
ভুলেছিলে সহজ প্রাণেরে।
সেই স্বেচ্ছা-নির্বাসন হয়ে যাক শেষ।

ভাড়াটে কুঠি

ভাড়াটে কুঠি!
নদীর স্রোতের জঞ্জাল সম আসিয়া জুটি।
ওধারে তাহারা এধারে কাহারা
ওপরে ও নীচে নানা
পাশাপাশি রোজ ঘর করি ভাই—
কেহ নয় কারো জানা!
শুধু দু'বেলায় চোখাচোখি হয়
একই সিঁড়ি দিয়ে উঠি
ভাড়াটে কুঠি।।

ওধারের ঘরে তাহাদের ছেলে
বুঝি বা ধুঁকিছে জ্বরে;
এধারে প্রবাসী স্বামীটির লাগি
বধূটি শুকায়ে মরে
নীচে মজলিসে সারাদিন গোল
চলিছে দাবার ঘুঁটি।
ভাড়াটে কুঠি।।

একটি ইটের ব্যবধান রেখে
পাশাপাশি থাকি শুয়ে;
এ ছাতের জল ও ছাতে গড়ায়
ভিৎ গাড়া একই ভূঁয়ে।
ওইখানে শেষ; তার পরে আঁটা
জানলা কবাট দুটি।
ভাড়াটে কুঠি।।

একদিন ফের ঘূর্ণিতে টানে,
কোনখানে যাই ভেসে;
কিছু নাহি জানি, তবুও বিদায়
নিয়ে চলি ম্লান হেসে।
যা ছিল আড়াল রহে চিরকাল
বাধা নাহি যায় টুটি।
ভাড়াটে কুঠি।।

শুধু কোনোদিন সঙ্গ-বিহীন
বিদ্রোহ করে প্রাণ;
কঠিন দেয়ালে করাঘাত করে

ঘুচাইতে ব্যবধান।
ঘোচে না আড়াল, ব্যাকুল হৃদয়
মিছে মরে মাথা কুটি।
ভাড়াটে কুঠি।।

কাগজ বিক্রি

হাঁকে ফিরিওলা—কাগজ বিক্রি,
পুরানো কাগজ চাই!
ঘরের কোণেতে সঞ্চিত যত
তাড়াগুলি হাতড়াই
পুরানো কাগজ চাই!
বহুদিন ধরে জঞ্জাল বাড়ে
সেব দরে বেচি তাই।
কেমন করিয়া একটি তাহার
হঠাৎ নজরে পড়ে;
দেখি সমুদ্রে যাত্রী-জাহাজ
কোথাও ডুবিল ঝড়ে।
হঠাৎ নজরে পড়ে,
আবার কোথায় মানুষের মাথা,
বিকায় ধূলির দরে।
নিরুদ্দেশ কে সন্তান লাগি
ঘোষিছে পুরস্কার,
মৃত্যুঞ্জয় অমৃত কারা
করিছে আবিস্কার।
ঘোষিছে পুরস্কার,
পলাতক খুনে লুকায়ে কোথায়
চাই যে হদিস্ তার।
কোন্ সে বধূর বুকের আগুন
ভিতর করিয়া খাক্,
অবশেষে লাগে বসনে তাহার;
পুড়ে গেল সাত পাক।
ভিতর করিয়া খাক্,
কোন্ সে গিরির গরল অনল।
ঘটাল দুর্বিপাক।
হারানো তারিখ ফিরে আসে ফের

প্রথমা

পুরানো কাগজ পড়ি;
আমার নয়নে সহসা পোহায়
সে দিনের বিভাবরী।
পুরানো কাগজ পড়ি,
রাখিল ধরণী সেই দিনটির
পায়ের চিহ্ন ধরি।

সে পদচিহ্ন কোথায় মিলাল
তারপর নাহি খোঁজ!
মানুষের ঘরে সকলের বড়
উৎসব নওরোজ।
তার পরে নাই খোঁজ;
যাত্রী-জাহাজে ডুবিল যে, বুঝি,
তারো ঘরে আজি ভোজ।

রক্তে ছোপান অশ্রুতে ভেজা
পুরাতন যত খাতা,
সব জঞ্জাল আজিকে, হ'লেও
রঙীন সূতায় গাঁথা!
পুরাতন যত পাতা,
তাতে কোন্ দিন কি দাগ লাগিল
কে বৃথা ঘামায় মাথা।

হাঁকে ফিরিওলা, কাগজ বিক্রি,
পুরানো কাগজ চাই।
ঘর ভরি যত মিছে জঞ্জাল
জমাবার নাই ঠাঁই।
পুরানো কাগজ চাই;
আদর যাহার ফুরাল, তাহারে
সের দরে বেচ ভাই।।

নমো নমো

নমো নমো নমো!
অপরূপ অনির্বচনীয়!
নমো নমো নমো!
দেহের বীণাতে ওঠে ঝঙ্কারিয়া সুরের প্রণতি
নমো নমো নমো!

নয় বাণী, নয় স্তুতি, নহেক প্রার্থনা;
গান নয়, নয় আরাধনা,
শুধু দেহ-দীপ হতে ওঠে শিখা সম
নমো নমো নমো!

সব অর্থ ডুবে যায় আনন্দের অতল সাগরে—
শুধু অহৈতুক,
অর্থহীন
নমো নমো নমো।
দুর্বোধ প্রাণের ভাষা
বাণীর আরতি!
চেতনা হারায়ে যায় আনন্দের অপার পাথারে
সেথা হ'তে ওঠে শুধু
বাঙ্ময় অর্চনা,
নমো নমো নমো।
পরিপূর্ণ জীবনের প্রস্ফুটিত পদ্ম হ'তে ওঠে গন্ধসম
নমো নমো নমো!

কথা খুঁজে নাহি মিলে, বিস্ময়ের রহে নাক' সীমা;
আনন্দের ঝটিকায় কাঁপে প্রাণ স্পন্দমান তারকার মত;
বিরাটের তীরে তীরে জীবন কল্লোলি ওঠে—
নমো নমো নমো!

নমো নমো নমো!
প্রণামের বিরাট আকাশে
সব গান ডুবে আছে, মিলে আছে সব পূজা,
হারাইয়া আছে স্তুতি, সকল আরতি,
সমস্ত সাধনা,
কোটি কোটি তারকার মত।
মহা নীলাকাশ সম
মূর্তিমান সীমাহীন
নমো নমো নমো!

ফিরে আসি যদি

ফের যদি ফিরে আসি;
ফিরে আসি যদি
কোনো শুভ্র শরতের অম্লান প্রভাতে,
কিম্বা কোনো নিদাঘের শুষ্ক রুক্ষ তপস্যার দ্বিপ্রহরে
কিম্বা শ্রাবণের বৃষ্টি-ধারা ছিন্নমেঘ রাতে কোনো,—

নূতন ধরণী'পরে কারেও কি পারিব চিনিতে,
কাহারেও পড়িবে কি মনে?
এ জীবনে যাহাদের ভালোবাসিয়াছি
আজ ভালোবাসি যাহাদের
তাহাদের সাথে হবে দেখা?
—পারিব চিনিতে?
জন্ম ল'ব হয়ত সে
কোন্ ঊর্মি-ছন্দোময়ী ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে
ডুবারীর ঘরে,
কিম্বা কোন্ জীর্ণ ঘরে কোন্ বৃদ্ধ নগরীর নগণ্য পল্লীতে
দীনা কোন্ পথের নটীর কোলে;
কিম্বা—কোথা কিছু নাহি জানি!
এই আলো সেদিন নয়নে জ্বলিবে কি?
এই তারা এই নীলাকাশ সম্ভাষিবে আর বার?
সেদিন কি এমনি ফুটিবে ফুল,
এইমত তৃণ
জাগিবে কি পদতলে,
এইমত পুঞ্জ পুঞ্জ প্রাণ
সমস্ত নিখিলময়?

পড়িবে কি মনে,
এই আলো মোর চোখে একদিন লেগেছিল ভালো?
এই ধরণীর 'পরে আমি খেলা করিয়াছি,
কাঁদিয়াছি হাসিয়াছি
ভালোবাসিয়াছি?
যে মুকুল আশাগুলি রেখে যাব আজ
জীবনের খেয়াঘাটে বিদায়-সন্ধ্যায় অর্ধস্ফুট,
তাহাদের সাথে আর
হবে ফিরে দেখা?
এ জীবনে যত কাজ সাঙ্গ হ'ল নাকো
যত খেলা রয়ে গেল বাকি,
ফিরে আর পাব তাহাদের?

আমার চোখের জল,
মোর দীর্ঘশ্বাস,
হতাশা, বেদনা,
তাহাদের সাথে পুনঃ হবে পরিচয়?
যত দুঃখ ফেলে রেখে যাব
তাহারা শুধাবে ডেকে,

ডেকে কহিবে কি প্রিয়া,
"আমাকে ভুলিয়া ছিলে কেমন করিয়া ?"

আবার প্রিয়ার সাথে সুখে দুঃখে কাটিবে কি দিন,
এমনি করিয়া প্রতি জীবনের দণ্ড পল সুধাসিক্ত করি,
আনন্দ ছড়ায়ে চারিদিকে, আনন্দ বিলায়ে সর্বজনে ?
সকলেরে ভালোবেসে—ভালোবেসে সব কিছু
দুর্দিনে নির্ভয় আর দুঃখে ক্লান্তিহীন
চলিতে পাব কি দুইজনে
এক সাথে ?
ফের যদি ফিরে আসি,
আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে,
বুকে আরো প্রেম যেন আনি;
পৃথিবীকে আরো যেন ভালো লাগে।
এবারের যত ভুল ভ্রান্তি
স্খলন পতন
মৃত্যুয় ভুলিয়া আসি;
আরো আনি পথের পাথেয়
আনন্দ অক্ষয়!

নটরাজ

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্, শুনিস্ কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে!
বংসহারা কোন্ সাহারা হাহা করে, কোথায় হাহা করে,
কোন্ সাগরে ঝড় উঠেছে মেঘ-গরুড়ে আকাশ আড়াল করে;
আবার কোথায় আন্‌কি ওড়ে বদ্ধ নালার জলে
চড়ুই দুটি বাঁধ্‌ছে বাসা কড়িকাঠের তলে!

বিসুবিয়াস্ বিষ খেয়ে কে উগ্‌রে তোলে আগুন উগ্‌রে তোলে,
গ্রহ-তারার ঘূর্ণিপাকে মাথা ঘুরে উল্কা পড়ে ট'লে;
আবার কোথায় মাকড়শাতে বুন্‌ছে বসে জাল,
মহুয়া-বন মাৎ করে ওই মৌমাছিদের পাল!"

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্, শুনিস্ কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে!
পুচ্ছে-বাঁধা অনল-জ্বালায় ধূমকেতু কে ছট্‌ফটিয়ে ছোটে,
প্রসবব্যথায় কাঁদিয়ে আঁধার, আকাশ ফেটে নতুন তারা ফোটে;
আবার কোথায় মৌটুসুকি টুস্‌কি মারে ফুলে,
প্রজাপতি হলুদ-ক্ষেতে বেড়ায় দুলে দুলে!

তেপান্তরে লাগল আগুন—ছুব্‌লে আকাশ খুব্‌লে নিলে আঁখি,
সৃষ্টিখানার ঝুঁটি ধরে কোন্ সে দানো দিচ্ছে কোথা ঝাঁকি;
আবার কোথায় রোদ উঁকি দেয় পাতার চিকের ফাঁকে,
কাঠবেড়ালির চমক্ লাগে বনশালিকের ডাকে।

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্, শুনিস্ কিরে কানে?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে!
বাঁজা ডাঙায় লড়াই বাধে, হাজার দাঁতে কামড়ে ছেঁড়ে টুঁটি
লক্ষ খুনীর খুন চেপেছে, কবন্ধ ধড় খাচ্ছে লুটোপুটি;
আবার কোথায় নিশীথ রাতে প্রদীপ মিটিমিটি,
রুদ্ধ-নিশ্বাস পড়ছে বধূ প্রিয়তমের চিঠি।
বোল্ হাঙরের লাগল গাঁদি, জাহাজ ডোবে ডুবো পাহাড় লেগে,
কোন্ দেশেতে লাগল মড়ক, ভাগাড় আঁধার শকুন-ঝাঁকের মেঘে;
আবার কোথায় হাঁস চরে ওই শ্যাওলা-দীঘির ঘাটে
ঝিউড়ি মেয়ে ঘষ্‌তেছে পা খেজুর-গুঁড়ির পাটে।

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্, শুনিস্ কিরে কানে?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে!
তাতা থিয়া, তাতা থিয়া,—ঠোকাঠুকি নীহারিকার মালায়,
তাতা থিয়া,—সিন্ধু নাচে বক্ষে জ্বালা বাড়বানল-জ্বালায়
তারি সাথে যুগে যুগে দোলে, দোলে, দোলে,
নটরাজের নাচন্ চির-নারী-মাতার কোলে।

নেপথ্য

কাগজের বুকে বিঁধে কলমের রূঢ় নখর,
আমার অশ্রু হ'ল আজ ভাই কালো আখর
কবিতা হায়!
লোনা জল আজ ছন্দে দুলিয়া মিলে মিলায়!

আকাশ আঁধার ক'রে এসেছিল মেঘ বিপুল;
সেই মেঘ হ'ল কাননের কোণে কেতকী ফুল,
সুরভিশ্বাস!
আকাশের ব্যথা মাটির মায়ায় হ'ল সুবাস!

এ হৃদয়-ক্ষত হ'ল যে দিঠিতে নিষ্করুণ,
তারি গানে তব প্রিয়ার গণ্ডে ফোটে অরুণ—
উদয়াভাস!
আমার ঝঞ্ঝা তোমাদের দক্ষিণ বাতাস!

মোর পতঙ্গ, দহিল যাহারে মোহিনী দীপ,
সেই হ'ল তব প্রিয়ার ললাটে সুচারু টিপ,
নব শোভায়!
মোর সূর্যের দাহনে তোমার নিশি পোহায়!
আমার মরুর হাহাকারে হিয়া ব্যথা-বিদুর,
তোমাদের দেশে আকাশ হ'ল যে মেঘ-মেদুর,
স্নেহ-শীতল!
আমার প্লাবনে তোমাদের তীরে ফলে ফসল!

তোমার প্রেমের আকাশে শোভে যে শশী নবীন;
সে যে বিস্মৃত কোনো ধরণীর স্পন্দহীন
শীতল শব।
মোর শুক্তির বুক-চেরা ধন তব বিভব।

তবু তাই হোক; মোর অশ্রুর বাষ্পাকুল
দিগন্তে তব রামধনু উঠি', আলোর ফুল
মেলুক দল!
মোর শাজাহান কাঁদিয়া গড়ুক তাজমহল!

মেঘলা মোহ

সার্সিতে জল-সারেঙ বাজে,
পথ আজি নির্জন;
বাদলা-পোকার ফূর্তি নিয়ে
জাপানি লণ্ঠন!

কদম্বে আজ শিথিল রেণু
সুবাসে ভুর-ভুর,
বর্ষাশেষের বাদল বাজায়
আজ বেহায়া সুর!

ঘরের কোণে ঝাপ্‌সা আলোয়
জমকালো মজলিস,
চেঁচিয়ে কথা কইতে বাধে
—আধ-ফোটা ফিস্ ফিস্।

ঘাঘ্‌রী বিনা কাজরী নাহি
নেইক কাজল কালো,
দুটি প্রাণীর মজলিসই আজ
সবার চেয়ে ভালো।

বীণার তারে মরচে-ধরা
কাজ কি পাড়াপাড়ি;
আজকে নীরব ঠোঁটের সাথে
ঠোঁটের কাড়াকাড়ি!

মেঘলা-মোহ ধরে যে আজ
কপোত-কূজনে
বর্ষাশেষের বেহায়া রেশ
শুন্‌ছি দুজনে!

চিকুর চেয়ে চম্‌কে দেবে
ক'রো না চিক্‌ ফাঁক,
আজ দেওয়ানা দেয়ার শোন
দিল-দরদী ডাক!

দরিয়াতে আজ কই দাদুরি?
হয়রান সব চুপ;
মেঘলা দিন আজ দাঁড় ফেলে যায়
আঁধারে ঝুপ ঝুপ!

বাদলা-পোকার পাতলা পাখা
পড়ছে খসে খসে,
সার্সিতে জল-সারেঙ বাজে
শুন্‌ছি বসে বসে।

হাল্‌কা বেণীর বন্ধনী আজ
আল্‌গা করেই রাখ।
শুধু শীতল অধর দিয়ে
নীরব চুমা আঁক।

নাহি ভয়

ওরা ভয় পায়।
ওরা চোখ বুজে থাকে,
বলে মিথ্যা, সত্য কিছু নাই—
শুধু ফাঁকি, আর শুধু মায়া;
এই আসা যাওয়া,
আগে পাছে শুধু তার,
অর্থহীন নিরন্তর অন্ধকার শুধু!
আমার ভুবনে কিন্তু ফুল ফোটে ফল ফলে রোজ

ঋতুগুলি আসে যায় গন্ধে গানে প্রাণে ভরপুর!
আগে পাছে আছে কি-না কিছু
খুঁজিবার
নাহি অবসর।
আছে যাহা,
তাহারই পাছে,
আমার দিবস রাত্রি
ছোটে অনুক্ষণ!
আমার দিনের আলো
হেসে কাছে আসে,
ভালোবেসে
কথা কয়;
আমার রাত্রির সুপ্তি, কপোল পরশ করে ধীরে,
বলে,
নাহি ভয়!

ইহবাদি

এই ভুবনের মধুর দিনের পথিক যত,
আসল যারা
হাসল যারা
ক্ষণেক ভাল বাসল যারা,
আজকে তারা সন্ধ্যা তোমার
পাকা সোনার
গলার হারে,
গগন পারে
যে-কথাটি গেল থুয়ে,
কপোল ছুঁয়ে
গেল চলে
যাহা বলে,
হায়রে হায়,
হারিয়ে যায়
সকল কথা আসন্ন ঐ অন্ধকারে!
আর যারা সব
বইল বোঝা, সইল ব্যথা,
মনের কথা কইল না;
ফুলের তরী বাইল শুধু, ফলের কড়ি চাইল না;
নীড়েতে পাখ্ পুড়ল যাদের, আকাশে হায় উড়ল না—

ঘুর্‌ল না;
তাহাদেরও আজ দিবা শেষে
ভালবেসে,
জড়িয়ে বুকে মুছিয়ে আঁখি
অশ্রু-জলে অধর রাখি,
ডাক্‌বে না কেউ হায়রে হায়!
জানি, জানি, সন্ধ্যারাণী, দিনের বাণী সব বৃথায়!

ধূলা সে যে ধূলাই শুধু
পরশ-পাথর নাইরে নাই,
মিথ্যা বোঝা, মিথ্যা খোঁজা
বৃথা ওরে সব যোঝা-ই;
মরমে যে মার খেয়েছে
মিথ্যা যে তার সব ওঝাই!
বুকের ভিতর যা থাকে থাক্,
ঢেকেই তা রাখ্।
ওষ্ঠে প্রিয়ার ভণ্ডামি নাই, নাই পেয়ালায় বুজরুকি,
পরকালের পুঁথি ফেলে, আয়রে হতাশ, আয় দুখী!
আয় রে আয়
দিন যে যায়!
উপবাসী প্রাণ যে চায়
বিপুল নিদারুণ ক্ষুধায়।

যখের কড়ি আগ্‌লে আছিস্ মোক্ষ-আশায় মূর্খ কে?
অর্ঘ্য দে!
এই দেহ তোর দেবতা শুধু,
দিন দুয়েকের স্বর্গ রে।
অর্ঘ্য দে।
মর দেহের চেয়ে মূর্খ, মোক্ষ নয় মহার্ঘ রে।
অর্ঘ্য দে।

মৃত্যু শাসায়, শুন্‌তে কি পাস্?
দেখ্‌তে কি পাস্, শ্মশান পাতা সকল ঠাঁই,
বিশ্বজুড়ে চিরটা কাল কালের হাতের নেই কামাই!
ওরে অন্ধ, ওরে হতাশ!
লুট করে নে যেথায় যা পাস্;
আকাশ বাতাস,
প্রেমের প্রকাশ,
নারীর দেহে রূপের বিকাশ,
যেথায় যা পাস্।

ভিখারী তুই আছিস্ ভুখা,
শিকারী সুখ নেয় লুটে,
এ কি রে তোর মনের বিকার—
রইব খুশি চিরকুটে?
হাঁক উঠে
মুখ ফুটে
মোক্ষ-মোহের ডোর টুটে',
"এই জীবন মোর সাধন
স্বর্গ মোর এই ভুবন!"

দুখ যে চায় দুখ যে পায়,
আর যে সুখের পিছনে ধায়,
দিনের শেষে সব সমান, সব সমান!
পুঁথির পাতায় ধাপ্পাবাজি, পরকালের সব প্রমাণ।
ডাকছে কবি—আয়রে আয়
তিলে তিলে, প্রাণ পেয়ালায়
চুমুক দেবার সময় যে যায়!
সময় যে যায়—সময় যে যায়, বাজছে কালের ডঙ্কা রে,
সকল সুখের পাছে আছে সমাপ্তির-ই শঙ্কা রে!
শিবের সাথে শবসৃজে রে শব,
সৃষ্টি সাথে ধ্বংসোৎসব
কাল-ভৈরব হুঙ্কারে।

যৌবনের ও মউ-বনে সব মৌমাছিদের মর্মরে
শুন্‌ছি বাজায় বিসর্জনী কঙ্কালেরা পঞ্জরে;
বাজায় ফুলে বাজায় পাতায়
পাখীর পাখায় লাজুক লতায়,
সুখে, আশায়, ভালবাসায়
সব ভরসায়
বাজায় বাজায় কেবল বাজায়!
—বসন্তেরি রঙিন খাতায়
রঙের সাথে কালো কালি-ই লিখছে শমন পাতায় পাতায়।

ওরে ভাই—
চোখের জলের সময় যে নাই!
রূপের মেয়াদ দু'দিন মোটে
দু'দিন মেয়াদ যৌবনের;
প্রিয়ার ঠোঁটের গুল্‌বাগে ভাই
ইজারা যে দুই দিনের!

জানেনা কেউ কেউ জানেনা
আশার ফানুস কখন ফাঁসে;
জীবন স্বপন ভাঙেবে তোর
মহাকালের অট্টহাসে!

ভাব্‌বি কি আর, করবি বিচার
বৃথা কি আর খাটবি বেগার?
কালকে প্রিয়ার মুখে পাবি
হয়ত চিহ্ন বলি-রেখার!

আজ দবজায়
তাই ত কবি ডাক দিয়ে যায়—
ফাগুন ফুরায়—
আগুন জুড়ায়—
মধু-মাসেব মহোৎসবে দস্যু হয়ে লুটবি কে আয়।
ছিনিয়ে নেবার সাহস যে চাই—
বিনিয়ে কাঁদিস্ কাব ভবসায়?

যৌবন বারতা,

এস নারী,
আজ তব কানে কানে,
কই প্রাণে প্রাণে,
সৃজন-বহস্য-কথা—
—নিখিলের আদিম বাবতা।

যৌবনের মায়ালোকে
অনাদি ক্ষুধাব সেই অনির্বাণ জ্বালা নিয়ে চোখে,
এস নারী, আরো কাছে এস
বুকে বুক বেখে শুধু ক্ষণিকের তবে মোহ ভবে ভালোবেসো।
চুপে চুপে যে কথাটি
শিখাইছে মাটি
প্রতি নবাঙ্কুরে,
ইঙ্গিতে যে-কথাটিরে গ্রহতারা বলে ঘুরে ঘুরে
আলোকের অর্ধস্ফুট সুরে,
সৃষ্টির প্রথম-প্রাতে বিধাতার মনে
যে-কথাটি ছিল সংগোপনে,
সে গোপন বারতাটি কবির প্রকাশ,
এস নারী, এস আজ জীবনের দখিনা-বাতাস।

মুখে নয়, শুধু বুকে বুক দিয়ে নয়,
ব্যঞ্জনা-ব্যাকুল সর্ব অংগ মোর, মন প্রাণ দিয়ে
শিখাইব সে রহস্য প্রিয়ে!
জানিবার দুরন্ত আগ্রহে
তোমারও দেহের মাঝে শোণিতের বন্যাবেগ বহে!
যৌবন সুষমা তব, এ যে সেই বাসনার ভাষা!
এরি মাঝে জেগে আছে নিখিলের অনির্বাণ আশা।
এই তব হেঁয়ালি ভাষায়
সৃষ্টির কামনাখানি নবরূপে ফোটে পুনরায়।
ভয়ংকর ভুখে,
এস নারী অই তব তনুলতা নিষ্পেষিয়া বুকে
কই মোর রহস্য-বারতা;
জন্মে জন্মে এ দেহের প্রতি অণু-পরমাণু মাঝে
বহিয়া এনেছি যেই কথা,
সে বাণী সুগন্ধ করি' অগণন ফাল্গুনের সুরভি নিঃশ্বাসে,
রঞ্জিয়া বিচিত্র বর্ণে, সিক্ত করি সংগীতের আনন্দ নির্যাসে,
রূপে রসে অপরূপ করি'
কই ধীরে,—দেহমন, এ জীবন উঠুক শিহরি!

হে প্রিয়া আমার—
তবু যদি আরো কিছু রয়ে যায় বাকি,
অসমাপ্ত যায় কিছু থাকি,
হাস্যে তব, লাস্যে তব, ছলনায় কৌশলে কলায়,
সৌন্দর্যের ইন্দ্রজালে মুগ্ধ করি' দুলাইয়া আবেগ দোলায়
ধাঁধিয়া কটাক্ষপাতে, বাঁধিয়া অচ্ছেদ্য মায়া-ফাঁসে,
সমস্ত চেতনা হরি', মগ্ন করি' আলিংগনে, কুহক-বিলাসে
উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া মোরে করিয়া বিহবল,
লুটে নিয়ো সকল সম্বল।

বিস্মৃতি

যাযাবর হাঁস নীড় বেঁধেছিল বন-হংসের প্রেমে,
আকাশ-পথের কোন্ সীমান্তে থেমে;
সে কবে আমার মনে,
ডুবেছে বিস্মরণে।
আজি শুধু তার শূন্য নীড়টি ঘিরি,

হতাশ আশার উদাস অলস মৌমাছি মরে ফিরি।
বেদিয়ার মেয়ে মরু ছেড়ে হ'ল মোতি-মহলের বাঁদী,
চঞ্চল চোখ বোরখাতে দিল বাঁধি,
সে কবে আমার মনে,
ডুবেছে বিস্মরণে;
আজি শুধু তার ত্যক্ত জীর্ণ ঘরে,
পুরানো স্মৃতির শ্রীহীন শুকানো পল্লব কেঁদে মরে।
শুক্‌নো চড়ায় সারাদিন করে শকুনেরা কলরব,
ঘাটে ভেসে লাগে শেফালি-শিশুর শব।
আমার পরানে আজি,
উৎসব বেশে সাজি,
হৃদয়ের পথে কঙ্কালগুলি চলে।
বাসর-রাতের দীপ নিভে গেছে বিধবা-নয়ন জলে।

স্মৃতি

আর বরষের পথিক-পাখীর পায়ের চিহ্নখানি,
নূতন পলিতে ঢাকা পড়িয়াছে জানি,
তোমার মনের চরে।
জানি কভু ক্ষণতরে,
স্মৃতির জোয়ার সরাবে না আবরণ।
তোমার আকাশে আমার পাখার বিদায় চিরন্তন।
উড়ো মেঘে কবে ছায়া করেছিল আমার দগ্ধ মরু
বাড়াল একটি শাখা মুমূর্ষু তরু।
আজো তারি পথ চাহি,
জানি বৃথা দিন বাহি।
স্খলিত পরাগ পুষ্প নেবে না তুলি।
বিদ্যুল্লতা ছুঁয়েছে যে তার ভস্ম বাসনাগুলি।
তবুও মনের বাতায়নে মোর রাখিলাম দীপ জ্বালি!
জীবন নিঙাড়ি স্নেহরস তাহে ঢালি।
চাহিনাক সান্ত্বনা,
অশ্রুতে ভিজাব না,
মনের তৃষিত মরুর দারুণ দাহ।
তব পথ-চাওয়া-দীপ-শিখা সনে মোর শেষ উদ্বাহ।

লুপ্ত

তৃতীয় প্রহরে চাঁদ উঠেছিল নগর-শিখর ছুঁয়ে;
তুমি তারি মত মোর 'পরে ছিলে নুয়ে।
কহ নাই কোন কথা;
বাণীহীন ব্যাকুলতা,
কেঁপেছিল শুধু নত আঁখি-পল্লবে
কৃশ শশাঙ্ক-লেখা সম যবে দেখা দিল মোর নভে!
সেদিন যে-কথা কহিতে পারনি, আজ কেন বৃথা মন
তাহারি অর্থ খুঁজে মরে অকারণ!
কেন মিছে ভাবি বসি,
শুখায়েছে যে সরসি
তারি কমলের কি ছিল মর্ম-কোষে?
প্রভাতি তারার ইশারা খুঁজিতে কেন চাহি এ প্রদোষে!
জ্যোৎস্নাধারায় আকাশের চোখে আজো যে লেগেছে নেশা;
কুয়াশায় আজ স্মৃতি ও স্বপ্ন মেশা;
থাকে যদি মনে থাক,
একটি সজল দাগ,
হারানো রাতের এক ফোঁটা অশ্রুর।
নূতন আঁখির দ্যুতিতে তোমার স্মৃতি হোক সুমধুর।

তুমি

কালো দীঘিজল, তারি সুশীতল মায়া তব দুটি চোখে;
ও দেহে শ্রাবণ-মেঘছায়া ফেলিল কে!
তুমি যেন শর্বরী,
তারকার স্নেহ হরি'
নেমেছ আসিয়া নীরবে হৃদয়-তীরে,
দূর দিগন্তে নভোসীমন্তে আঁকি শশী লেখাটিরে।
কুমারী কোরক যে আলোকে জাগে, স্মিতমুখে তব ক্ষরে;
পাখীরা ঘুমায় স্নিগ্ধ তোমার স্বরে।
তনুর লাবণী সনে,
দেখিয়াছি পড়ে মনে,
হরিৎ-ধান্য-ব্যাকুল গ্রামের সীমা,
কানন-কণ্ঠ-লগ্না নদীর মনোহর ভঙ্গিমা।
ধুধু প্রান্তর তোমার প্রণয়ে হ'ল ছোট প্রাঙ্গণ;

দীপ হতে করে' বহ্নি আকিঞ্চন।
তব মমতায় ঘিরে,
অসীম আকাশ তীরে,
সীমার ধরণী গড়ি মোরা অক্ষয়।
তুমি আজ, তাই গৃহদীপ সনে তারকারা কথা কয়।

মানে

মানুষের মানে চাই—
—গোটা মানুষের মানে।
রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত—
গোটা মানুষের মানে চাই।
মানুষ সব-কিছুর মানে খুঁজে হয়রান হ'ল—
এবার চাই মানুষের মানে—নইলে যে সৃষ্টির ব্যাখ্যা হয় না!
এই নিখিল-রচনার অর্থ মানুষের অর্থকে
আশ্রয় ক'রে আছে যে—!
তাই, তোমারও মানে চাই আর আমার।
দূর নীহারিকায় নব নক্ষত্র যে জন্মলাভ করছে
সেই অর্থের ভরসায়!
সে অর্থ কি মাটিতে লুটিয়ে চলে?
মানুষের মানে কি কাফ্রী-ক্রীতদাস?—হারেমের খোজা?
মানুষের মুখ চেয়ে যে পৃথিবীর এই অশ্লান্ত আবর্তন!
তার অর্থ কি হিংস্র নখরাঘাতে সৃষ্টি বিদারণ ক'রে চলে
রক্ত লোলুপতার অভিযানে?
মানুষেব মানে কি ল্যাংড়া তৈমুর?—হূণ আত্তিলা?
মানুষের মানে কি শুধু বুদ্ধ?—শুধু খৃষ্ট?
তবু কাফ্রী-ক্রীতদাসও ত মানুষ—
মানবীর গর্ভ হতেই তৈমুরের জন্ম, বুদ্ধ খৃষ্ট দেবতা ছিলেন না।
মানুষ কি তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিধাতার নিজের জিজ্ঞাসা?
তাই কি মহাকালের পাতায় তার অর্থ কেবলি লেখা আর
মোছা চলেছে?

সংশয়

মনে করি ভালবাসব।
শপথ করি এ জীবন হবে প্রেমের তপস্যা।

প্রভাতের আলোকে চোখ থেকে বুকে নিমন্ত্রণ করি।
মানুষের কোলাহল চলাচল ভালো লাগে।
—দূর আকাশে চিলগুলি অদৃশ্য বৃত্ত রচনা করে,
ছোট নদীটির ঘোলাটে জল তার অজস্র জঞ্জাল নিয়ে বয়ে যায়,
গরু ও মোষের গাড়িগুলি মন্থরভাবে যাতায়াত করে;
কাকের কোলাহল, ফেরিওয়ালার হাঁক, দুটি দুরন্ত ছেলের ঝগড়া,
পাখীর ডানার শব্দ শুনতে পাই।
আমায় ঘিরে জীবনের স্রোত বয় এবং আমি
সেই স্রোতের স্পর্শ হৃদয়ে সানন্দে অনুভব করি।
আসুক দুর্দিন, মনে করি শপথ রক্ষা হবে।
প্রিয়ার দৃষ্টি আছে সম্বল, আছে বন্ধুর প্রেম,
কত জননীর অযাচিত স্নেহ!
কত দেশে কত অজানা মানুষের চোখে যে দেবতাকে দেখলাম।
বিদ্রোহ আমি করব না, জীবনকে আমি তিক্তমুখে অভিশাপ দেব ন
যে শেষ নিশ্বাসটি পৃথিবীকে দিয়ে যাব তাতে বিষ থাকবে না,
থাকবে শুধু চিরকালের নব সূর্যোদয়ের জন্যে চিরন্তন প্রণতি,
ভ্রূণ ভবিষ্যতের জন্যে শাশ্বত আশীর্বাদ।
তারপর একদিন জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখি
আকাশ অন্ধ হয়ে গেছে;
মৃত্যু-পথ-যাত্রী প্রিয়া শীর্ণ দুর্বল শিথিল বাহু দিয়ে
আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা ক'রে বলে,
"আমি তোমায় ছেড়ে যাব না, আমায় রাখ।"
অসহায় বন্ধু বলে,
"অন্ধকারে তোমার হাত খুঁজে পাচ্ছি না বন্ধু।"
ভাঙা দেওয়ালের ফাটলে একটি ঘাসের গুছি
অনেক দিন জীবনের জন্যে যুঝেছিল।
প্রতিদিন দেখতাম কী তার প্রাণান্ত প্রয়াস
একটি পুষ্পিত প্রশাখা প্রসারিত করবার জন্যে,
একদিন বুঝি একটি ফিকে বেগুনি রঙের ছোট্ট ফুল ফুটেছিল,
কিন্তু মূল তখন দেউলে হয়ে গেছে;
সব শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেল।
পথ দিয়ে আসতে আসতে দেখি নির্মম শিশুর দল
ক'টা ইঁদুরছানা ধ'রে
তাদের বলি দিয়ে উল্লাস করছে—কি সরল পৈশাচিকতা!
সৃষ্টির মূলেই যে নির্বিকার নির্মমতা।
দেখি মৃত্যুর শিয়রে নেওয়া চির-বিলাপের শপথ শাপ হয়ে ওঠে,
শুনি বৃদ্ধ তার যৌবনের প্রেম নিয়ে পরিহাস করছে।
—জীবনকে কি ঘিরে আছে একটি বিপুল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ?

রাস্তা

আজ এই রাস্তার গান গাইব,—এই নগরের শিরা উপশিরার।
এই রাস্তার ধূলির গান!
—তার কাঁকর, তার খোয়া তার পাথরের—
আজ কিছু তুচ্ছ নয়।
ভাঙা পেরেক; ঘোড়ার খুরের নাল,
ছেঁড়া কাগজ, কাঠি, পাতা, কিছু তুচ্ছ নয়!

আজ এই রাস্তার গান গাইব,
যে রাস্তা গেছে আমার ঘরের পাশ দিয়ে—
তার দিনের জনস্রোতের
আর নিশীথের নির্জনতার,
তাব বৈচিত্র্যের, তার চাঞ্চল্যের,
তার অবসাদের, তার একঘেয়েমির!
তার গ্যাসের বাতির কাঁচে প্রভাতে যে আলোটি চুম্বন করে,
তার টেলিগ্রামের তারে বসে যে শালিকটি দোলা খায়,
যে বৃদ্ধ মুটেটি ঘর্মাক্ত কলেবরে
তার ধূলির ওপর দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে মোট বয়ে নিয়ে যায়,
যে দুরন্ত শিশুটি তার ধূলি জমা ক'রে খেলা করে,
পথিকদের বিরক্ত করে ও তাদের তিরস্কারে হাসে,
সন্ধ্যা ও সকালে যে শ্রমিকের দল আনাগোনা করে,
তার কিনারায় একটি জীর্ণ ঘরে
যে পীড়িত বৃদ্ধ সারাদিন গোঁয়ায়—
তার জলের কলে যে সব কুলি-যুবতীরা
জল নেয়, ঝগড়া করে, কৌতুক করে,
কুটিল দৃষ্টি হানে আর উচ্চ হাস্য করে।
সমস্ত দিন ও রাত্রি ধ'রে যত পথিক
যত কথা কয়ে যায়,
তার কারখানা থেকে যত কোলাহল শব্দ ওঠে
যত ধূম ওঠে তার কারখানা-কলের
আকাশস্পর্শী চিমনি থেকে;—
সব কিছুর! যত কিছুর!

এ জীবন ধ'রে এই পথটিতে যা কিছু দেখেছি,
শুনেছি, ভালোবেসেছি,—সব কিছুর গান গাইব।
তার সঙ্গে গান গাইব মানুষের
যে মানুষ পথ সৃষ্টি করেছে,

মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার পথ!
অরণ্যে পথ আছে।
শ্বাপদেরা যে পথ দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ
তৈরি করেছে বন মাড়িয়ে মাড়িয়ে
শিকারের চেষ্টায় আর জলের অন্বেষণে
—মৃত তৃণের পথ।
সে পথ হিংসার, সে পথ ক্ষুধার, সে পথ কামের।
মানুষ প্রথম মৃত লতা-গুল্ম-তৃণের একটি
অবিচ্ছিন্ন রেখা সৃষ্টি করেছিল—কবে ?—কেন ?
আমি বলি প্রীতিতে।
যে মানুষ প্রথম পথ সৃষ্টি করেছিল মানুষের সঙ্গে মেলবার জন্যে,
তাকে নমস্কার।
সে পথ আরো বিস্তৃত হোক,
যে পথ মানুষকে বৃহৎ করেছে।

সমস্ত পথের গান গাইব,
সোজা ও বাঁকা, সরু আর চওড়া—অশেষ অসীম।
কারণ সব পথের মোহানায় যে আমার আসন,
সব পথ এসে মিলেছে এই আমার মেলায়,—
যে পথ গেছে উত্তর মেরুতে,
আর যে পথ গেছে দক্ষিণ মেরুতে,
যে পথ গেছে সাহারায়,
আর যে পথ গেছে কাঞ্চনজঙ্ঘায়।
যে পথ গেছে গ্রামান্তের শ্মশানে
আর যে পথে গ্রহ, তারকা চলে,
আর যে পথ গেছে প্রিয়ার হৃদয়ে—
আর যে পথ মানুষের দুরন্ত দুরাশার—
আর অসম্ভব কল্পনার।
আমি পথ সৃষ্টি করি—
সব পথই আমার।
আমি সেই নবসৃষ্টির গান গাইব।
আমি শুধু শিলা দিয়ে রাস্তা বানাই না—
শুধু লোহা ও লাকড়ি দিয়ে নয়।
শুধু পেশীর বল আর শ্রমের ঘর্ম দিয়ে নয়,
আমি পথ বানাই মর্ম দিয়ে—প্রাণ দিয়ে।
আমি পথ বানালাম অরণ্য ফুঁড়ে,
আমি পথ বানালাম পাহাড় চিরে,
আমি নদী ডিঙিয়ে গেলাম,—আমি সাগর বেঁধে দিলাম,

প্রথমা

বাতাস জিনে নিলাম,
আমি যুগ থেকে যুগান্তরে দেশ থেকে দেশান্তরে
মনের সড়ক তৈরি করলাম।
আমার তবু থামা হবে না।
পথই যে আমার প্রাণ—আমার অসীম পথের পিপাসা!
শিশু পৃথিবীর কোন্ অনতিগভীর কবোষ্ণ সাগরে
আমার প্রথম ক্ষীণ পদচিহ্ন পাবে,
পাবে অসীম সাগরের বালুকায়,
তারপর ধরণীর প্রতি স্তরের ধাপে ধাপে আমি
উঠে এলাম,
—অসীম অমর জীবাণু!
নিখিলের বিস্ময়!
দূরতম নক্ষত্রের পথ আমি খুঁজি আজ!

সব পথ-সৃষ্টির একই প্রেরণা!

যে পথে পুষ্পেব সুগন্ধ মৌমাছিদের নিমন্ত্রণ করতে বেরোয়;
আর যে পথে মহাজনদের সওদা আসে নগরের হাটে;
যে পথে যাযাবর হংসবলাকা আসে
আকাশকে শুভ্র পক্ষের কলহাস্যে সচকিত করে;
আর যে পথে পৃথিবীর অন্ধকার জঠর হ'তে
মজুরেরা কয়লা তুলে আনে,
আর ধাতু আর হীরক ....সে প্রেরণা জীবন।
এই পথ সৃষ্টিতেই জীবনের সার্থকতা!
এই পথ জীবনকে বৃহৎ করে বৃহত্তর ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে।
নিশ্চিত হ'তে অনিশ্চিতে, নীড় হ'তে আকাশে
তার অশেষ অভিযান।
এই পথ জীবনকে মুক্তি দেয়—অসমাপ্তির অসীমতায়।
এই পথে জীবনের বন্ধনের ছন্দ।
এই পথে জীবনের মুক্তির আনন্দ।

পাঁওদল

পায়ের শব্দ শুনতে পাও?
নিযুত নগ্ন পায়ের মহাসংগীত!
মলিন কোর্তাপরা কারখানার কুলি আসছে আজ অসংকোচে
আর রাস্তার মূর্খ মজুর,
জাহাজের খালাসী আর পথের মুটে।
বিশ্ব-মানবের মিছিলে আজ মিলল এসে

এ কোন্ অপ্রত্যাশিত পূত বন্যা!
পঙ্কিল ব'লে ঘৃণা করবে আজ কে?
কলুষিত ব'লে কে নাসিকা কুঞ্চিত করবে?
তফাত যাও!

জরাজর্জর দেহে তাজা রক্তের স্রোত বইল;
বদ্ধজলে মৃত্যুর জীবাণু বংশ বিস্তার ক'রছিল,
আজ প্রাণের বিপুল বেগে সাফ হয়ে গেল
বনেদি জঞ্জাল, সনাতন ধাপ্পাবাজি!
রাজপথের ধূলি আজ তাদের নগ্ন সবল চরণ আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হ'ল।
—কলের কুলি আর মাঠের চাষা
রাস্তার মুটে আর কারখানার মজুর।
পাল্কি চড়ে চড়ে কার পা পঙ্গু হয়ে গেছে,—
আজ ওই নগ্ন সবল পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চল।
মাথায় পা দিয়ে দিয়ে কার পা ভারী হ'ল
পাপের ভারে—
ওই পুণ্য পথের ধূলায় নামাও সে ভার।
আজ পাঁওদল, চলে নবজাগ্রত ভয়মুক্ত মানবের দল,
তার সাথে পাঁওদল, চলেছেন মানবের দেবতা।
আজ যদি চোখে জল আসে
সে কি দুর্বলতা?
ওই কালিমাখা শ্রম-কঠোর ঘর্মাক্ত দেহখানি
আলিঙ্গনের লোভে
বাহু যদি আপনা হ'তে প্রসারিত হয়
সে কি লজ্জার কথা?
দেবতা যে পাঁওদল চলেছেন ওই
নগ্নপদ কুলিদের সাথে ভাই—
তিনি যে আজ আহবান করেছেন ওই পথের ধূলায়!

সম্রাট

কাঠের সিঁড়ি

চওড়া কাঠের সিঁড়ি গেছে উঠে,
ঘুরে ঘুরে অনেক উঁচুতে।
ধাপগুলো মোড়া কার্পেটে,
পুরানো নয়,
কিন্তু উজ্জ্বলতাও তার নেই।
সিঁড়ির একটি বাঁকে
টুলের উপর বসে থাকে সশস্ত্র প্রহরী।
বসার ভঙ্গি তার কঠিন,
মুখ নির্বিকার।
যেন পাথরে কোঁদা।
সারাদিন সে থাকে বসে,
যে কাঠের সিঁড়ি ওপরে গেছে উঠে,
তারই একটি বাঁকে।
সিঁড়ি দিয়ে কৃচিৎ একটি আধটি লোক নামে,
ভারী গম্ভীর আওয়াজ ক'রে,
ঝলমলে উর্দিপরা
বেয়ারারা নামে ওঠে মাঝে-মাঝে।
শুধু প্রহরী থাকে বসে,
আর কাঠের টবে
একটি 'পামে'র চারা
তার সবুজ পাখার মত
পাতা বিছিয়ে থাকে।
বিশাল বাড়ির মোটা দেওয়াল ভেদ করে'ও
বাইরের আওয়াজ এসে পৌঁছায়,—
ট্রামের ঘর্ঘর,
আর নগরের অস্পষ্ট গুঞ্জন।
আর রোদের আলো,
জানালার পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে
ফিকে হয়ে গ'লে আসে।
পোষাকের তলায় প্রহরীর বুক কি
ধুক ধুক করে?
'পামে'র চারার পাখা কি নড়ে?
বলা যায় না।
যে বিশাল সিঁড়ি আকাশের দিকে
চেয়েছে উঠতে,

তার তলায় তারা বসে থাকে:—
কাঠের টবে 'পামে'র চারা
আর কাঠের টুলে
সশস্ত্র প্রহরী।
তবু হতাশ আমি হই না।
জানি,—'পামে'র চারার মধ্যে সঙ্গোপন আছে অরণ্য।
কাঠের টবে একদিন তাকে ধরবে না!
কাঠের টুলে নিঃসঙ্গ জনতা আছে থেমে
স্তব্ধ হয়ে;
একদিন তার স্থাণুত্ব যাবে ঘুচে।
শুধু কাঠের সিঁড়ি
কোন দিন পৌঁছাবে না আকাশে।

পুরাতন নাম

শিরিষের ফুল প'ড়ছে ঝ'রে।
আজকে আমায় সেই নামে ডাকো,
—পুরাতন সেই নাম!
শিরিষের থোপা থোপা ফুল যাচ্ছে ঝ'রে,
ফুল নয় যেন সুগন্ধি হাওয়ার ফেনা।
আজকের দিন হয়ত নূতন,
কিন্তু আমরা ত পুরাতন:
—আমরা আর এই পৃথিবী,
আর এই কঠিন রুক্ষ শিরিষ,
ঘুমের মত ফুল যার কোমল।
আমাকে সেই পুরানো নামে ডাকো,
আর শিউরে উঠুক আনন্দে
অনেক আগের সেই বসন্ত,
যা আছে আমার ভেতরে।
শিরিষের কঠিন বাকলের
তলায় ছিল বসন্ত,
—বহু যুগ আগের বসন্ত;
পুরাতন কোন ডাকে সেই দিয়েছে আজ সাড়া,
আর তার সুরভিত উত্তর
পড়েছে পৃথিবীতে বিছিয়ে!
সে নাম কি সত্যি গেছ ভুলে?
—পুরাতন সেই নাম!

শুধু রুক্ষ কঠিন বাকল,—মরা বাকল থাকবে ঘিরে ?
শিরিষের মত উঠবে না আর উথলে
গহন মনের বসন্ত,
—বহুযুগ আগের বসন্ত
উচ্ছ্বসিত ফুলের ফেনায় ?

বাঘের কপিশ চোখে

বাঘের কপিশ চোখে
আমি দেখি জঙ্গলের ছায়া।
গরাদের ওধারেতে বাঘ
শুয়ে আছে গভীর আলসে।
মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে
অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের মত
দুর্বোধ জগৎ,
—অনেক, অনেক চোখ, অনেক অনেক মুখ
আর তীব্র নরমাংস-ঘ্রাণ;
শোনে আর কোলাহল দারুণ দুঃসহ।
দুর্বোধ দৃষ্টিতে তার
আমি দেখি টেরাই-এর জঙ্গলের ছবি।
—উদ্ভিদের নিঃশব্দ সংগ্রাম
নির্লজ্জ ভয়াল,
কাঁটায় কাঁটায় দ্বন্দ্ব, শিকড়ে শিকড়ে,
মহীরুহ রুদ্ধশ্বাস লতিকার মৃত্যু-আলিঙ্গনে;
শিশু-তরু পায়নি আকাশ,
তবু নহে কৃপার কাঙালী
বনস্পতি সাথে যোঝে দয়াহীন মৃত্যুর সংগ্রামে।
কটুগন্ধ বাষ্পভারে মূর্ছিত বাতাস,
আকাশ আচ্ছন্ন পত্রজালে,
তারি মাঝে সঞ্চরণ
নিঃশব্দ বিক্রমেঃ
সহসা বিদ্যুৎ-গতি, বজ্ররব, তীব্র আর্তনাদ,
নখ-দন্ত আস্ফালন,
কি উল্লাস নির্লজ্জ হিংসার!
কি মুহূর্ত মৃত্যু-ঝলকিত!
স্বাদ তার ভুলে গেছে বুঝি
গরাদের ওপারেতে বাঘ।

গরাদের ওপারেতে বাঘ
হাই তুলে অকস্মাৎ দেয় গড়াগড়ি।
কি দুর্বল ভঙ্গিমাটি তার!
জুতোর ফিতেটা গেছে খুলে,
নীচু হয়ে সযতনে বাঁধি।
জানি আমি এতক্ষণে
বাঘের কপিশ চোখে নাই,—
এ অরণ্য 'টেরাই'-এর নয়।
সেথা হিংসা বর্ণহীন ক্ষুধা,
বস্তুর প্রবাহ-চক্রে মৃত্যু শুধু দ্বার।
স্রোতোহীন চেতনার, গাঢ় গূঢ় অতল সলিলে,
অনেক প্রাচীরে ঘেরা,
অনেক শৃঙ্খলে জোড়া,
নগরের ছায়া গেছে নেমে,
নেমে গেছে অরণ্যে আরেক—
সে অরণ্যে নব-মৃত্যু মোরা সৃজিয়াছি।

পথ

সেই সব হারানো পথ আমাকে টানে;—
কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে,
খোরাসান থেকে বাদক্‌শান,
পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান;
শ্রান্ত উটের পায়ে, পায়ে, যেখানে উড়েছে মরুর বালি,
চমরীর খুরে লেগেছে বরফগলা কাদা!
বাদক্‌শানের চুনি আর খোটানের নীলার
নিষ্ঠুর ঝিলিক-দেওয়া,
ভেঙে-পড়া ক্যারাভানের কঙ্কালে আকীর্ণ,
লুব্ধ বণিক আর দুরন্ত দুঃসাহসীর পথঃ
লাদকের কস্তুরির গন্ধ যেখানে আজো
আছে লেগে
পুরানো স্মৃতির মত।
সেই সব মধুর পথের কথা ভাবি;—
আকাশের প্রচন্ড সূর্যকে আড়াল-করা
দুধারের দীর্ঘ দেওয়ালের
শ্যাওলাগন্ধ ছায়ায় ছায়ায় সঙ্কীর্ণ সর্পিল পথ,
সাপের মত ঠান্ডা পাথরে বাঁধানো।

ভাঙগা ধাপ দিয়ে উঠে-যাওয়া,
ঝিলমিল-দেওয়া বাতায়নের নীচে থমকে-থামা,
ধূপের গন্ধে সুরভি, দেবায়তনের দ্বারে
ভূমিষ্ঠ হওয়া পথ।
ভয়ে ভয়ে স্মরণ করি সে পথ;—
ঘন ঘাসের বনে, শিকার ও শ্বাপদের নিঃশব্দ
সঞ্চরণের 'ঠৌরি';—
যুগযুগান্ত ধ'রে দুর্বল ও ভীত, হিংস্র ও নির্মম
পায়ে মাড়ান,—
যে পথে তৃষ্ণার টানে চলে ভয়-চকিত মৃগ;
অন্ধকারে শাণিত চোখ চমকায়।
যে পথ কুরুবর্ষ থেকে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত,
দুর্বার তাতার-বাহিনীর অশ্বক্ষুর-বিক্ষত;
করোটি-কঠিন যে পথে
তৈমুরের খোঁড়া পায়ের দাগ।
স্বপ্ন দেখি সে পথের,
অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামী কালের পানে;—
স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি!

আমরা যাইনি যুদ্ধে

দিগন্ত বিক্ষত সেথা জ্বলন্ত নখরে,
রাত্রির তিমির-প্রান্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।
আকাশ 'শেলে'র তীক্ষ্ণ শিষে কাঁপিতেছে,—
অতর্কিত বিস্ফোরণ!
মৃত্তিকার ঘ্রাণ-স্নিগ্ধ পরিখার মাঝে
মৃত্যুর প্রতীক্ষাবত সৈনিকের বুকে শুধু বুঝি,
স্তব্ধতা গভীর;
অলস মধ্যাহ্ন-স্বপ্ন
শান্ত কোন দূর আকাশের।
সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল
'শেল'-ছিদ্র পথে!
আমরা যাইনি যুদ্ধে,
শব আর মানুষের মাঝখানে
জানি নাই কম্পিত মুহূর্ত।

তবু বারুদের গন্ধ এখানের
বাতাসে কি নাই ?
অতর্কিত বিস্ফোরণে
বিদীর্ণ মুহূর্তগুলি জ্বলে।

*　　*　　*

একটি স্বপন নাই
মৃত্যুর নগ্নতা ঢাকিবার।

ছাদে যেওনাক

ছাদে যেওনাক, সেখানে আকাশ অনেক বড়,
সীমানা-হীন!
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।
তার চেয়ে এস বসি দুজনাতে, জানালা পাশে,
ওধারের ছোট গলিটিরে দেখি,—গ্যাসের আলো,
পড়েছে কেমন ফুটপাথটির ধারের ঘাসে,
শুনি নগরের মৃদু গুঞ্জন, লাগিবে ভালো।
তার পরে চাই তোমার নয়নে, তুমিও চেও;
—ঘরের বাতিটি জ্বালা হয় নাই আধো আঁধার।
যা দেখিব তার বেশী যেন সেথা, কি রয়েছে ও
মনে হবে যেন চোখের সাগর, সেও অপার।
যদি খুশি হয়, কাছে সরে এসো, বাড়ায়ে হাত
হাতটি ধরিও, আর মাথাটিরে হেলায়ে দিও;
সুবাসিত চুল, সেই হবে মোর গহন রাত,
কপালের টিপে পাব প্রিয়তম তারকাটিও।
নিকট পৃথিবী ঘিরে থাক, আর যা কিছু চেনা,
তাই দিয়ে রাখি শূন্য আকাশ আড়াল করি';
মুহূর্তগুলি মন্থন করি' উঠে যে ফেনা
তাহারি নেশায় সব সংশয় রব পাশরি'।
সীমাহীন ধাঁধা ধূ-ধূ করে সখি উপরে নীচে,
রচ নিরন্ধ্র গাঢ় চেতনার ক্ষণিক নীড়;
স্বপ্নহরণ মহাকাশ হোথা নিঃশ্বসিছে,
এই ক্ষণ-সুখ প্রত্যয় তাই হোক নিবিড়।
ছাদে যেওনাক সেখানে আকাশ অনেক বড়,
সীমানা-হীন!
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।

বিনিদ্র

ঘুমহীন রাত।
পৃথিবীতে স্তরে স্তরে কত ঘুম অগাধ গভীর,
সুমের, মেম্ফিস, উর, নিনেভে, ওফির,
মরুর বালুকালুপ্ত গাঢ় ঘুম
কত নগরীর;
—অন্ধকারে আজো তার ঢেউ!
অন্ধকারে ঘুমের আস্বাদ
উপবাসী চোখের পাতায়!
হিমেল মেরুর ঘুম তুহিন শীতল,
ডোবা জাহাজের ঘুম অতল গহন।
—আমি নিদ্রাহীন!
বিস্ফারিত কোটি চোখে আকাশের শাণিত জিজ্ঞাসা
করিছে জর্জর
ধরণীর আশ্বাসের অরণ্য মর্মর
—তাও স্তব্ধ।
চেতনা-সীমান্তে ভীরু স্বপ্নের কুয়াসা
না জাগিতে অমনি মিলায়,
চিতা-ব্যাঘ্র ভাবনার অস্থির সঞ্চারে
সচকিত শশকের মত।
স্পন্দিত হৃদয়ে
সময়ের পদশব্দ শুনি;
অবিরাম অশ্বক্ষুর-ধ্বনি
কাল-প্রহরীর।
—কতদূর হ'তে আসে
নিভায়ে নিভায়ে
কত ক্লান্ত সভ্যতার দীপ,
কত পথ মুছে মুছে,
চির-মৌন হিমরাত্রি বিছায়ে বিছায়ে,
সৃষ্টির ফসল- তোলা নিঃশেষিত নক্ষত্রের
প্রান্তরে প্রান্তরে।
সে দুঃসহ ধ্বনি হ'তে কোথা পরিত্রাণ?
ঘুম কই?

অবতারণা

নাই ফুল, শস্যের মঞ্জরী।
বিস্ফোরণে বিদীর্ণ মৃত্তিকা
উদ্‌গারিছে বিষ বাষ্প;
—আজ শুধু বাতাসে বারুদ।
শতাব্দীর দ্বিতীয় প্রহর,
বিধাতার রোষ-বজ্রে কাঁপে থর থর;
একি যুগান্তর?
দুঃস্বপ্ন-মথিত রাত্রি
আরো কতবার,
মানুষের ইতিহাস করি' অন্ধকার
এল, গেল চলে।
সূর্যোদয় ধন্য হবে বলে',
অকাতরে কত রক্ত বৃথা হ'ল পাত;
শুভ্র জ্যোতি পবিত্র প্রভাত
আজো কই দিল না ত দেখা!
—দেবে কি কখনো?
মনে হয় বুঝি বৃথা আশা,
মানুষের প্রভাত-পিপাসা
নয় মিটিবার।
লোভ, হিংসা, ঘৃণার তান্ডবে,
মৃত্যু-গাঢ় অন্ধকারে
অলক্ষ্যে পড়িল শেষ ছেদ;
সাঙ্গ মানুষের পরিচ্ছেদ।
পৃথিবীর গভীর পঞ্জরে,
কত দিগ্বিজয়-স্মৃতি
লুপ্ত স্তরে স্তরে,
কত জীব-বাহিনীর।
মৎস্য, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ,
বারবার মুছে দিল প্রলয়-প্রবাহ,
নব অবতারণার লাগি;
দেবে আরবার।
তারপর মন্বন্তর শেষে,
জ্যোতিষ্মান অবতার
দেখা দেবে কি নূতন বেশে
—তারই ছবি,
ভাবে বসি অভিশপ্ত মানুষের কবি।

শস্য প্রশস্তি

মাঠের শস্য গৃহে এল—
তার স্তোত্র রচনা কর কবি।
মানুষ ও পশু, আনন্দের বোঝার ভারে
নত হ'য়ে এল
গৃহে ফিরে,
মরাই বোঝাই হ'ল।
মানুষ আরেকবার মৃত্তিকাকে দোহন করলে,
পূর্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে
ভারতে,.. .ফ্রান্সে,...নীলনদীর তীরে,...কানাডায়,—
মৃত্তিকা মানুষকে অর্ঘ্য দিলে।
কেউ দিলে মমতায় মাতার মত আপনা হ'তে
কেউ অনিচ্ছায় কৃপণের মত দিলে মানুষের পীড়নে,
সলজ্জ প্রিয়ার মত কেউ নিজেকে গোপন রেখেছিল
এতটুকু ইঙ্গিতের অপেক্ষায়।
তবু সব মৃত্তিকাই দান করল;—
মরুপ্রান্তের নির্মম বালুকাভূমি আর উচ্ছলিত-সুধা
নদী-কূল-ভূমি,
গিরিবেষ্টিত উপত্যকা আর
সমতল প্রান্তর,
কালো ও রাঙা মাটি,
কঠিন ও কোমল,
যুবতী ও বৃদ্ধা।
শস্যের চির-নূতন জাতকের পুনরাবৃত্তি কর কবি।
সবল পেশী ও শাণিত লৌহ-ফলকের
মিলিত প্রয়াসে
মৃত্তিকা বিদীর্ণ হ'ল কবে,
ভূগর্ভের অন্ধকারে বীজের কারা বিদীর্ণ ক'রে
কবে শিশু-তরু বাহু বাড়াল আকাশের সন্ধানে,
কবে মেঘ দিলে বৃষ্টির আশীর্বাদ, সূর্য আলোকের
আর উত্তাপের,
মাটি ও আকাশ জীবন-রসের।
কবে ধরণীর লজ্জা দূর হ'ল, স্নিগ্ধ শ্যামলতার আবরণে,
আর আবার কবে মানুষ ধরিত্রীকে নিঃস্ব
নগ্ন করে রেখে গেল।

মাঠ থেকে শস্য এল গৃহে—ধান্য ও যব, গম ও
ভুট্টা, জোয়ারি......
মৃত্তিকা ও মেঘ, সূর্য ও বায়ুর
মিলন সার্থক হ'ল।
আকাশের আলো স্তিমিত হ'য়ে এল শ্রান্ত মানুষ
ও পশুর সঙ্গে
আনন্দের অবসাদে।
সর্বরিক্ত প্রান্তরের নিঃশব্দ হাহাকারের ওপর
রাত্রি বুলালে অন্ধকারের সান্ত্বনা।
কাল পৃথিবীতে ব্যস্ততা জাগবে, শস্য বহনের আর বিতরণের
আর হায়, লোভের সংগ্রাম।
আজ শান্তি!
মাঠের শস্য গৃহে এল,
এল মানবের শক্তি ও যৌবন,
এল নারীর রূপ ও করুণা,
পুরুষের পৌরুষ,
ভবিষ্যৎ মানব-যাত্রীর পাথেয়।
সমস্ত ভাবীকালের ইতিহাসে,
মানবের কীর্তিকাহিনীর তলায় অদৃশ্য অক্ষরে
এই শস্যের আগমনী লেখা
থাকবে না কি?

কোন দূর বনে

বৃষ্টি হয়ে গেছে বুঝি
কোন দূর বনে।
এখানে বাতাসে ভিজে ঘ্রাণ।
এখানে বাতাসে কোমলতা!

অনেক লোকের ভীড়
অনেক কাজের ভীড়
জীবনের জটিল জটলা,
তবু যেন মনে হয়
থেকে থেকে কোথা হ'তে
ভেসে আসে স্মৃতির সৌরভ!

নগরের পথ-পাশে
দেখেছি বেড়ায় ঘেরা

বন্দী গাছ শ্রীহীন, কাতর।
সহসা সে কি সাহসে
একদিন মৃদু হেসে
দুটি ম্লান ফুল তুলে ধরে!

উদাসীন নগরের
কল্লোল যায় না থেমে
জনস্রোত তেমনই প্রখর,
তবুও কি তার মাঝে
কোন এক পথিকের
ক্লান্ত চোখে নামে না স্বপন?

মনে পড়ে, মনে পড়ে,
কোথায় অরণ্য ছিল
সুবিশাল, গহন, গভীর;
সোনালী রোদের সুরা
পান করে ধরণীর
প্রসারিত সবুজ রসনা!

মনে পড়ে কালো মেঘ,
উদ্দাম বায়ু—বেগ
মনে পড়ে তুফানের রাত!
তারপর সে স্বপন
কখন যে ভেঙেগ যায়
ঠেলে চলে জনতার স্রোত।

অনেক কাজের ভীড়
অনেক লোকের ভীড়
ভাবনার জটিল জটলা;
তবু যেন মনে পড়ে
কোথায় অরণ্য ছিল,
ছিল রৌদ্র—বৃষ্টির উৎসব!

বহুদূর বনে কোন
বৃষ্টি হয়ে গেছে বুঝি
এখানে বাতাসে কোমলতা!

সাগর্ পাখীরা

সাগর পাখীরা সব উড়ে যায়।

সাগর পাখীরা সব উড়ে যায়।
আকাশে মেঘের সর,
চাঁদ ভাসে তার পর।
গহন গভীর জল উথলায়!
সাগর পাখীরা সব উড়ে যায়,
রজনী শিহরে সেই ডানা–ঘায়।
জ্যোছনা পাখায় কাঁপে
কালো জল ছায়া ছাপে;
সে ছায়াও পলকে মিলায়।

সাগর পাখীরা সব কোথা যায়?
আকাশ পারের কোন্ সে কূলায়!
মেঘেরা কি তাহা জানে,
চাঁদ কি সে–কথা মানে?
বৃথাই অতল জল উছলায়।

সাগর পাখীরা উড়ে চলে তাই,
আকাশের কোন খানে সীমা নাই।
চাঁদের নয়নে জল
মেঘমায়া ছল ছল
সিন্ধু সে উতলা সদাই।

কোজাগরী

দীপ নিভে গেছে, নিভেছে রাতের তারা
বসন্তসেনা একা বাতায়নে জাগে।
স্বপ্ন–মদির নগরের নিঃশ্বাস
চাঁদের মতন পান্ডু কপোলে লাগে।

নগর ঘুমায়, চাঁদ ঢুলে পড়ে ঘুমে,
বিনিদ্র জাগে একা বসন্তসেনা;
বিজন পথের পরে মেলি' দুটি চোখ,
তারি তরে হায় যে পথিক ফিরিবে না!

বাতায়নে আর আকাশে অস্ত চাঁদ
নূতন দিনের শোনে বন্দনা–সুর,
দিগন্ত–বধূ যার অনুরাগে রাঙা
সেই বিজয়ীর পথ–পাশে পান্ডুর।

"রেখেছিনু ফুল—সে ফুল শুকায়ে গেছে,
আলো জ্বেলেছিনু—সে আলো হয়েছে ম্লান।
আমি একা জাগি তারকার চেয়ে ধ্রুব
আমি একা জাগি—খদ্যোতিকার প্রাণ।"

"পথের বিপণি, দেউল হয়েছে কবে
হে পথিক তুমি পেলেনা বারতা তার,
তোমার আকাশে আলোকের সমারোহে
মিশে থাক তবু দ্যুতি এক তারকার"

"নিশীথ-কুসুম ঝ'রে গেছে মোর আগে
তিমিরে অলীক স্বপন দেখেছে সেও।
তবু দিন-শেষে যদি কভু আসে রাত
বারেক একটি তারকার পানে চেও।"

আজ রাতে

বহুদূর তটে আজ শুনতে কি পাবে
সাগরের ঢেউগুলি বাজে?
সাগরের ঘ্রাণ আজ
জানবে কেমন ক'রে
বাতাসেরে করেছে মদির।

জানো না অনেক তরী
নিয়েছে নোঙর তুলে,
বাতাসে ফুলেছে কত পাল;
দিগন্তের তারকার
হাতছানি পেল কিনা
তারা কেউ করেনি বিচার।

গহন বিবর হ'তে, গভীর কোটর হ'তে
আজ রাতে বাদুড়ের মতো,
মিশ্‌কালো ডানা মেলে
যত সব সচকিত
ভাবনারা বার হ'য়ে ওড়ে।

সিন্ধু-সারস হায়
তার মাঝে নাই কোন,

জানেনা অতল লোনা স্বাদ;
তাদের ডানার ছায়া
কখনো সাগর জলে
ছাপেনি তারায় ভরা রাত।

আজ রাতে সাগরের শুনতে পাবে না ডাক—
হৃদয়ের কোন দূর তটে;
সাগরের ঘ্রাণ আজ
মুছে গেছে
মিশ্‌কালো বাদুড়-ডানায়।

মৃত্যুত্তীর্ণ

নতমুখ, শ্রান্তপদ, নিরাশ্বাস মন,
—ফিরে আমি শেষকৃত্য করি সমাপন
ধূসর মলিন পথে;
আকাশের আলো আসে নিভে।
সহসা পাখার শব্দে সচকিত ঊর্ধ্বে তুলি আঁখিঃ
—সন্ধ্যার দিগন্ত পানে উড়ে চলে
দুই শুভ্র পাখী,
—সাগর-কপোত বুঝি!
সাগর-কপোত নয়,
মৃত্যুজয়ী স্বপ্ন আর আশা,
অক্লান্ত পাখায় বহি তৃপ্তিহীন আকাশ-পিপাসা
তিমির রাত্রির পারে চলে।
মৃত্যু-শোক-স্তব্ধ মনে, সে পাখার ধ্বনী,
শুনি চলে বিরাম বিহীন,
কূলহীন সাগরে সাগরে,
যুগান্তর হ'তে যুগান্তরে,
নভোসীমা করিয়া বিস্তার।
দুই নয় সংখ্যাহীন সূর্যদীপ্ত পাখা!
দিগ্বিদিক্ হ'তে মেশে ধবল বলাকা
আকাশ-সঙ্গমে।
অগণন সে পাখার ঘায়
আকাশ সীমান্ত আরো
দূর হ'তে দূরে সরে যায়,
—আনন্দে বিস্তৃত।

ধীরে ধীরে মুছিলাম অশ্রুসিক্ত আঁখি;
মৃত্যু-আলিঙ্গন-মুক্ত জানিয়াছি
দুই শুভ্র পাখী
উড়ে চলে গেছে যেথা,
অপরূপ ধবল বলাকা
সঞ্চালিছে জ্যোতির্ময় পাখা।

পুরাতন বীজ

অনেক আকাশ গেছে মরে,
খোলসের মত গেছে খসে;
ডুবে গেছে অনেক পৃথিবী
বার বার প্রলয়-প্লাবনে।
তবু আজো পুরাতন বীজ
পৃথিবীতে মেলিছে অঙ্কুর,
—পুরাতন পর্বতের সাগরের অরণ্যের বীজ।
পুরাতন তারাগুলি
অজগর-কলেবরে চক্র-চিহ্নসম
খসে-যাওয়া খোলসের তলে
আবার উঠেছে ফুটে।

কোথায় ছাড়ায়ে যাবে
এ সৃষ্টিরে?
নাই কোন পথ।
আমাদের প্রেম,—তারো
কোন মুক্তি নেই।

তুমি এস

এই নেভালেম আলো;
ঘরে এল তৃতীয়ার
চাঁদ-ছোঁয়া মদির আঁধার।
তুমি এস এইবার,
এ প্রতীক্ষা পূর্ণ করো,
হয়েছে সময়।

নয়নে এড়ায়ে এস,

পদপাত যাবে নাক শোনা;
স্পন্দিত আঁধারে,
শুধু রক্তে যাবে জানা
স্বপন-নিঃশ্বাস তব
পড়িয়াছে মুদিত নয়নে।

চুলগুলি নুয়ে-পড়া
ঘুমের ঝুরির মত
ছুঁয়ে থাক আতপ্ত কপোল।
তোমার আঙুলগুলি
রহস্য-কোমল ঢেউ
হৃদয়ের তট-শেষে তোলে।

পাতা-ঝরা অরণ্যের
পাদমূলে বাতাসের
মর্মরের মত,
ক্ষীণ তন্দ্রাতুর স্বরে
কাঁপিবে চেতনা মোর
মূর্ছার সীমায়।

চাঁদ-ছোঁয়া অন্ধকারে
নাই হ'লে শরীরিণী;
স্বপ্ন-তনু স্মৃতি
আমারে ঘিরিয়া থাক
বাতাসে জড়ায়ে ওঠা
কুহেলিকা সুরভির মত।

নীল দিন

কত বৃষ্টি হয়ে গেছে
কত ঝড়, অন্ধকার, মেঘ,
আকাশ কি সব মনে রাখে!
আমার হৃদয় তাই
সব কিছু ভুলে গিয়ে
হ'ল আজ সুনীল উৎসব!

তুমি আছ, তুমি আছ,
এ বিস্ময় সওয়া যায় নাক,
অরণ্য কাঁপিছে।

সম্রাট

মনে মনে নাম বলি,
আকাশ চুইয়ে পড়ে
গলানো সোনার মত রোদ।

গলানো সোনার মত
রোদ পড়ে সব ভাবনায়;
সোনার পাখায়,
গাহন করিতে ওঠে
নীল বাতাসের স্রোতে,
রৌদ্রমত্ত পায়রার ঝাঁক।

এ নীল দিনের শেষে
হয়ত জমিয়া আছে
সূর্য-মোছা মেঘ, রাশি রাশি;
তবু আজ হৃদয়ের
ভরিয়া নিলাম পাত্র,
এই নীল স্বপ্নের সুধায়।

হৃদয়ের কত পাকে
স্মরণ জড়ায়ে রাখে,
মরণ শাসায়।

তবু মুহূর্তের ভুল—
ক্ষীণায়ু স্ফুলিঙ্গ তবু
অন্ধকারে হাসিয়া উঠুক।

শীতল শূন্যতা হ'তে
উল্কা আসে পৃথিবীর
নিষ্করুণ নিঃশ্বাসে জ্বলিতে।
'স্টেপি'র দিগন্তে দেখি
আগু-পিছু তুষারের
মাঝখানে ফুলের প্লাবন।

তোমার নয়ন হ'তে
আজিকার নীল দিন
জীবনের দিগন্তে ছড়ায়।
মিছে আজ হৃদয়েরে
স্মরণ জড়াতে চায়
মরণ শাসায়!

কাল রাত

আমি ত এখানে বসে
তোমার স্বপন দেখি,
তুমি কি করিছ, জানি নাক'।
আমি ত মুহূর্ত-স্রোতে চলেছি উজান ঠেলে
যেখানে কাঁপিছে কাল রাত!

তোমার স্বপন দেখি
সে স্বপনে তুমি কতটুকু!
এক গুছি চুল,
কানের দুলের পাশে
নেমেছে শিথিল হয়ে
মেদুর মেঘের রাত থেকে।

আর লঘু অতি লঘু হাসি,
—শব্দ নয়;
মশলার দ্বীপ থেকে ভেসে-আসা গন্ধ-শ্বাস,
পলাতক, অপ্সরা-অস্ফুট।

কত যে সাগর আছে; কতদূর পৃথিবীর তটে
আছাড়িয়া পড়ে রাত দিন।
আমি জানি তার চেয়ে
উতল সাগর এক,
—তার মাঝে চেতনা বিলীন।

টেবিলেতে স্তূপাকার কত কাজ, কত যে ভাবনা!
পৃথিবী'ত মানে নাক'
পৃথিবী'ত জানে নাক'
কাল এক রাত এসেছিল!
কাজের কলম চলে; আমার হৃদয় চলে
মুহূর্ত-স্রোতের সাথে যুঝে,
যেখানে নিবিড় রাত
যেখানে গহন রাত
কাঁপে কাল
তোমার আমার।

সৌরভ

সমস্ত দিন তোমার সৌরভ আমায় ঘিরে আছে;
ঝলক দিয়ে আসছে আমার মনে,
ভেসে যাচ্ছে আমার মনের আকাশে
শরতের সাদা মেঘের ফেনার মত।
—কিন্তু স্নিগ্ধ তা করে না,
তোমার সৌরভ!

তুমি কাল মাথা নুইয়ে দিলে
বুকের কাছে,
বললে,—দেখ না গন্ধটা কেমন?
আমি ত তোমার চুলের গন্ধ পেলাম না,
ক্রীম কিংবা লোশনের।

গহন বনের অন্ধকারে—
চকিত মৃগ ঘুরে বেড়ায়।
তা'র কস্তুরীর সুবাস,
—পেলাম তোমার পরম রহস্যের সৌরভ!
সে গন্ধ উঠ্‌ছে আমার বুকের ভেতর থেকে,
উঠ্‌ছে আমায় নিয়ে—
অকূল শূন্যতায়।

দুঃসহ আমার বেদনা,—
অনেক বন্ধনে জড়ানো
অনেক গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা জীবন
ছিঁড়ে যাওয়ার বেদনা।
তবু বলি'—ছিঁড়ুক।

ছিঁড়ে যাক জীবনের ঘাটে বাঁধা নোঙর!
কূলহীন সমুদ্র, দিগন্তহীন আকাশ,
তুমিত আমার সে-ই!

তোমার সৌরভ আমায় নিয়ে যাক সেই শূন্যতায়,
যেখানে পথ আর কোন দিকে নেই,
যেখানে পরম নিষ্ফলতার
তীব্র মধুর হতাশা!

ঝড় যেমন করে' জানে অরণ্যকে

ঝড় যেমন ক'রে জানে অরণ্যকে
তেমনি ক'রে তোমায় আমি জানি!
দুরন্ত নদীর ধারা যেমন ক'রে দেখে আকাশের তারা
—সেই আমার দেখা।
স্থির আমি হই না,
আমার জন্যে নয় প্রশান্তির পরিচয়!

কেমন ক'রে আমি বোঝাই আমার ব্যাকুলতা!
বাতি দিয়ে কি হয় বিদ্যুতের ব্যাখ্যা?
সাগরের অর্থ মেলে সরোবরে?

একটা মানে আছে পালিত পশুর চোখে,
আর একটা মানে বন্য শ্বাপদের বুকে।
বৃথাই এ দুই-এর মিল খোঁজা!
আমি থাকি আমার উন্দামতায়;
চেওনা আমায় বশ করতে,
সহজ করতে।

কে জানে হয়ত আমার জানাই
সত্যকারের জানা!
দুলে না উঠলে আকাশের বুঝি
মানে হয় না,
পৃথিবীকে নাড়া দিয়ে সত্য করতে হয়!

তুমি আমার আকাশ,
—আমার দুরন্ত স্রোতে কম্পমান
তোমার পরিচয়!
তুমি আমার অরণ্য!
আমার ঝঞ্ঝাবেগের
প্রশয় ও প্রতিবিম্ব!

জাহাজের ডাক

শুনি জাহাজের ডাক সুদূর বন্দরে,
ডাকে সারা রাত।
সাড়া কেউ দেয়না'ত, ওরা ত ঘুমায়, তবে,

তুমি, আমি কেন বা অস্থির;
এখনো অনেক দেশ,
জানি, পদ-চিহ্ন-হীন
দুঃসাহসী নাবিকের লাগি,
অনেক প্রবাল দ্বীপ
নারিকেল-গ্রীবা তুলি',
দিগ্বলয়ে নয়ন বুলায়।

তবু, আর কত কাল, স্বর্ণ মৃগ-সম কবি
পলাতক দিগন্ত-শিকার!
হৃদয় কুলায় চায়,
পাহাড়ের মত ধ্রুব
চায় মন সীমান্ত-নির্ণয়।

উধাও সাগর পাখী
তারও ডানা বুজে এল
সুদুর্গম শৈল-চূড়া-নীড়ে।
এ তরণী কোন দিন
গভীর শিকড় মেলি
আবার হ'বে না ফিরে তরু?

জানালা রুধিয়া দাও,
জাহাজ ডাকিয়া যাক
সুদূর বন্দরে।

দিগন্ত-পিপাসা যদি
কিছুতে না মেটে, তবে,
এস খুঁজি দুজনার চোখে।

সম্রাট

সমবায় সমিতির সদস্য,
বিরাট যৌথ কারবারের ভগ্নাংশের অংশীদার।
লাভের অংশ মেলে, আর ঘোচে দুর্ভাবনা।
সমবায়ে সুখ আছে আর আছে শান্তি
যত পারো গড়ো সমবায় সমিতি সুতরাং।
কিন্তু সাম্রাজ্যও যে চাই আমার।
তোমার আমার সকলের চাই সাম্রাজ্য।

শুধু সদস্য আমরা নই, আমরা যে সম্রাট!
শুধু লভ্যাংশে মন ভরে না, চাই সাম্রাজ্য।
বিধাতার সাথে সেই ত আমাদের চুক্তি!

একচ্ছত্র অধীশ্বর আমার সাম্রাজ্যের—
সে সিংহাসন থেকে আমায় চেওনা হটাতে;
সমবায় সমিতি সেখানে যেন না দেয় হানা,
তাহলেই বাধবে কুরুক্ষেত্র।

এখনো কুরুবর্ষ আছে পড়ে—অজেয় আত্মার অরণ্য পর্বত!
বেড়া দিয়ে তাকে জরিপ করা যায় না,
সমিতির শাসন মানে না সে সীমাহীন 'স্টেপি',
বশ মানে না তার বন্য ঘোড়া!
সেখান থেকে শক হূণ তাতারের বন্যা
আবার আসবে নেমে,
ধুয়ে যাবে নগর, ভেসে যাবে সভ্যতা,
সমিতি আমার সাম্রাজ্য যদি না মানে।

তামাসা

তামাসাটা রেখো মনে
ইলেকট্রনের মরীচিকার এই তামাসা।
মেঘের রঙীন পাড় বুনেছে পড়ন্ত রোদ,
আর মাটির তরঙ্গ গিয়ে মিশেছে নীল দিগন্তে।
রাতের বৃষ্টি-ভেজা শহরে,
পথের খোদলে-খোদলে গ্যাসের আলো আছে জমে',
পিচের ওপর যাচ্ছে পিছলে।

ভাল লাগল বুঝি,
ভাল লাগল আকাশের তারা আর ঘাসের ফুল
আর তার চোখের সেই দীর্ঘ পল্লব
ঘন মেঘের মত যা রহস্য-ছায়া ফেলে
অতল তার চোখের হ্রদে!

কবে দেখেছ অসহায় শিশুর মুখ
পথের ধারে?
কবে, নিঃসঙ্গ বিনিদ্র রাতে,
সান্ত্বনাহীন সেই কান্না কেঁদেছ আত্মার পরাভবে,

সম্রাট

শুধু যৌবন যা কাঁদতে পারে ?
জেনেছ কোনদিন
অতর্কিত মৃত্যুর অসীম অতল হতাশা,
অর্থহীনতায় ভয়ঙ্কর ?
এ সবই তোমার ভ্রান্তি শুধু
তোমার মরীচিকা।

বিধাতা ভাবেন ইলেকট্রনের গণিতে।
ছায়াপথ ছাড়িয়ে
অসীম আকাশ জুড়ে
নীহারিকা-পুঞ্জে তার অঙ্কের খেলা।

পথের ধারে বেড়ায় ঘেরা বিদেশী গাছ
যেদিন চমকে দেবে হঠাৎ পুষ্পিত আহ্বানে,
আর সাধ হবে যেদিন
তার কালো চুলে সমস্ত চেতনা ঢেকে দিতে,
ভুলো না সেদিন ইলেকট্রনের এই তামাসা!

তুমি ভালবাস আর কাঁদ
আর নিরুত্তর আকাশে পাঠাও
আত্মার নিরুদ্দেশ জিজ্ঞাসা;—
বিধাতা ভাবেন শুধু ইলেকট্রনের গণিতে,
নির্বিকার নির্ভুল অঙ্কের হিসাবে।
মনে রেখো ইলেকট্রনের তামাসা!

কিন্তু কেনই বা মনে রাখবো ?
আকাশে থাকুক জটিল দেশ-কাল-জড়ানো জ্যামিতি,
সৃষ্টিময় অনন্ত অঙ্কের কাটাকাটি;
আমার থাক
সমস্ত অঙ্কের এপিঠে
মিথ্যা মরীচিকার এই ব্যঙ্গ,
নেশার রঙে টলমল
এই মুহূর্ত-বুদ্বুদ
জন্ম, মৃত্যু, প্রেম,
আনন্দ, বেদনা আর নিষ্ফল এই
আত্মার আকৃতি।
জানি, এ-পিঠে নেইক কোন মানে।
তবু কি হবে তলিয়ে দেখে
এই তামাসা!

নীলকণ্ঠ

হাওয়াই দ্বীপে যাইনি, দক্ষিণ সমুদ্রের কোন দ্বীপপুঞ্জে
তবু চিনি ঘাসের ঘাগরাপরা ছায়াবরণ তার সুন্দরীদের;
বিদেশী টহলদারের ক্যামেরা-কলুষিত চোখে নয়।
দেখেছি তাদের ঘাসের ঘাগরায় নাচের ঢেউ-এর হিল্লোল,
নোনা হাওয়ার দমকে দমকে যেমন নারকেল-বনের দোলা।
মোহিনী পলিনেসিয়া।
মহাসাগরে ছড়ান
ভেঙেগ-যাওয়া ভুলে-যাওয়া কোন্ সুদূর সভ্যতার নাকি ভগ্নাংশ!
আমি জানি
সমুদ্রের ঔরসে
প্রবাল-দ্বীপের গর্ভে তার জন্ম!

সূর্যের ঔরসে
মহারণ্যের গর্ভে যার জন্ম,
আঁধার-বরণ সেই আফ্রিকাকেও জানি;
—সৌখীন শিকারী আর পণ্ডিত-পর্যটকের চোখে নয়।

অরণ্য-চোয়ানো ঝাপসা আলোয়,
কি, দিগন্ত-ছোঁয়া 'ফেল্ট'র চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বলতায়
উদ্দাম আঁধার-বরণ আফ্রিকা!
কণ্ঠে তার দুরন্ত আরণ্য উল্লাস
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
কালো চামড়ার ছোঁয়াচ বাঁচাতে
কালো মনের ছোঁয়াচে রোগে জর্জর
দুর্বল ক্লীবের প্রলাপ-প্রতিধ্বনি নয়।
রাত্রি-নিবিড়, অরণ্য-গহন আফ্রিকার
রোমাঞ্চিত উত্তাল উচ্চারণ,
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই।

–হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
অরণ্য ডাকে ওই,—যাই!
সিংহের দাঁতে ধার, সিংহের নখে ধার,
চোখে তার মৃত্যুর রোশনাই!
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই।

সম্রাট

বন-পথে বিভীষিকা, বিঘ্ন,
আমাদেরও বল্লম তীক্ষ্ণ!
কাপুরুষ সিংহ'ত মারতেই জানে শুধু
আমরা যে মরতেও চাই!
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

মেয়েদের চোখ আজ চক্‌চকে ধারালো।
নেচে নেচে ঢেউ-তোলা, নাচের নেশায় দোলা
মিশ্‌কালো অঙ্গে কি চেকনাই!
মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই!
হে-ইডি, হাইডি-হা-ই!

হে-ইডি হাইডি, হা-ই!
আমাদের গলায় কই সেই উদ্দাম উল্লাস,
ঘাসের ঘাগরায় দুরন্ত সমুদ্র-দোলা?
কেমন ক'রে থাকবে?
আমাদের জীবনে নেই জ্বলন্ত মৃত্যু,
সমুদ্র-নীল মৃত্যু পলিনেসিয়ার!
আফ্রিকার সিংহ-হিংস্র মৃত্যু!
আছে শুধু স্তিমিত হয়ে নিভে যাওয়া,
—ফ্যাকাশে রুগ্ন তাই সভ্যতা!

সভ্যতাকে সুস্থ করো, করো সার্থক।
আনো তীব্র, তপ্ত, ঝাঁঝালো, মৃত্যুর স্বাদ,
সূর্য আর সমুদ্রের ঔরসে
যাদের জন্ম,
মৃত্যু-মাতাল তাদের রক্তের বিনিময়।

ভরাট-করা সমুদ্র আর উচ্ছেদ করা অরণ্যের জগতে
কি লাভ গড়ে' কৃমি-কীটের সভ্যতা,
লালন ক'রে স্তিমিত দীর্ঘ পরমায়ু
কচ্ছপের মত?
অ্যামিবারও ত' মৃত্যু নেই।
মৃত্যু জীবনের শেষ সার 'আবিষ্কার
আর
শিব নীলকণ্ঠ!

কাজ

সে কাজের কি মানে হয়,
যে কাজে সমস্ত সত্তা না যায় ডুবে;
যে কাজে তন্ময় না হ'তে পারি!
যে কাজে না মগ্ন হ'তে পারো
সে কাজে মজা'ত নেই।
কোরো না সে কাজ!

সত্যিকারের কাজ যখন মানুষ করে,
তখন মানুষ হয় নব-বসন্তের গাছের মত প্রাণের বেগে স্পন্দমান,
মানুষ তখন জীবনকে করে উপভোগ, শুধু কাজ ত সে করে না।
কাশ্মীরের উপত্যকায় পশম যারা বোনে,
দীর্ঘ মসৃণ পশমের সূত্র
বোনে দীর্ঘ মোলায়েম আঙ্গুলে,
দীর্ঘায়িত কালো চোখে তাদের গভীর প্রশান্তি,
প্রশান্তি তাদের স্তব্ধ তন্ময় অন্তরে—
তারা ঠিক ঋজু দীর্ঘ গাছের মত নয় কি,
—বসন্তে যে গাছ প্রসারিত করছে তার পত্রপুঞ্জ আকাশের পানে?
তারা জীবন্ত পত্রের শুভ্র কোমল জাল বুনে চলে;
গাছ যেমন করে' নবপল্লবে নিজেকে ঢাকে
তারাও তেমনি জড়ায় শুভ্র আবরণ তাদের গায়ে।

শুধু পশম নয়, বাড়িঘর, জাহাজ, জুতো, গাড়ি আর পেয়ালা,
আর রুটি,
মানুষ সবই ত তৈরী করতে পারে সৃষ্টির আনন্দে,
যেমন আনন্দে শামুক জমায় তার খোলস,
আর পাখীরা নীড়ের ভেতর ভর দিয়ে তাদের বুকে খাওয়ায়
টোল,
আর মাটির তলায় আলু গড়ে তার গোল শেকড়;
যেমন ক'রে গাছ ফোটায় ফুল আর ফলায় ফল!
—নির্মাণ সে'ত নয়, সে হ'ল রচনা, সে হ'ল আনন্দের
আত্মপ্রসারণ!
এমনি ক'রে আবার নতুন করে মানুষের
নগরও বেড়ে উঠতে পারে—
কর্মমত্ত মানুষের দেহ থেকে যেন উদ্যান হয়েছে সৃষ্টি।

যেদিন তাই হবে সেদিন মানুষ সব যন্ত্র ভেঙে ক'রবে
চুরমার!

সম্রাট

গাছের মত নিজের রচিত পল্লবে নিজেকে আবৃত করার উৎসাহে,
বাস করার আনন্দে মৌমাছির মত নিজের মধুচক্রে,
নিজের হাতে ফোটান পুষ্পের মত সুকুমার পাত্র থেকে
গান করার উত্তেজনায়
সেদিন মানুষ সব যন্ত্রই ক'রবে বাতিল।

—লরেন্স

প্রেম

আরো তলায় দাও ডুব,
প্রেমের এই জগতেরও তলায়।
আত্মার অতলতার কি সীমা আছে!
উপরে তৃণাস্তীর্ণ পৃথিবী,
কিন্তু অন্তরে, আত্মার গহন কেন্দ্রে আছে শিলা,
—গলিত উত্তপ্ত শিলা,
তবু জমাট তবু শাশ্বত!

সেই গহন রহস্যে নেমে এস নারী,
আপনাকে একবার হারাও,
হারিয়ে ফেল আমাকে;
হারাও তোমার এই একান্ত প্রেমাস্পদকে,
—হৃদয়ে যে তোমার তোলে উন্মত্ত আলোড়ন।

জীবনের বিরাট কক্ষ-পথ কোথায় গিয়েছে বেঁকে
দেখ চেয়ে!
গিয়েছে অর্ধবৃত্ত পথে নেমে,
ডুবেছে আত্মার গহন অতলতায়
গূঢ় গাঢ় অন্ধকারে।
এবার এস পরস্পরের একবার হই আড়াল,
ভাঙি এই চেতনার আয়না
যা কেবল ফিরে ফিরে করে,
পরিচিতের পুনরুক্তি
আর আড়াল ক'রে রাখে দিগন্ত

শোন নারী,
আত্মার সেই গহন কেন্দ্রে আছে কি কোন মণি,
—আকাশবর্ণ নীলকান্ত?

আমাদের সঙগমে,
আমাদের সঙঘর্ষে
গলিত শিলার জঠরে
জ্ব'লে কি ওঠেনি নিষ্ঠার নীলবর্তিকা ?
নীলা কি হয়নি সৃষ্টি ?
না যদি হয়ে থাকে
তবে এবার দাও বিদায়।
কি হবে ভালবাসার ভানে ?
পৌষকে কি ঠেলে ফাগুন করা যায় ?
অবেলার প্রেম,
সবচেয়ে এই বেলা শেষের প্রেম, এ'ত শুধু ছেলেখেলা।
কি হবে লোক হাসিয়ে ?
তুমি যদি তবু কর মিনতি
আমি বিদায় নেব নারী !

ডুবে দেখ নারী,
একবার দেখ ডুবে
স্মৃতির অতীত আত্মার অতলে।
রহস্যময় সেই অন্ধকারে
স্পন্দিত হচ্ছে হয়ত তোমার আদিম অপরূপ
অজানা হৃদয়
—গভীর উপলব্ধির মণিদীপ্ত হৃদয়—

ভাবছ যাকে ভালবাস
তারই গহন হৃদয়ের ছন্দে হচ্ছে স্পন্দিত !
তা যদি না হয় তবে যাও।
মুকুর হাতে কি হবে বসে থেকে
জীর্ণ জীবনের প্রান্ত ধ'রে ?
কি হবে প্রেমের অভিনয়ে ?

এ'ত নয় প্রেম
এ তোমার নিজের প্রতি অনুরাগ।
আর বসন্তের ফুলের মত তোমার যে সত্তা গেছে
শুকিয়ে ম্লান হয়ে,
তারই প্রতি দুর্বল এই মোহ !
কাল যাকে স্পর্শ করে না,
সেই নকল ফুলের মিথ্যা জৌলুষ আমি চাই না।
গলিত শবের চেয়ে দুঃসহ তার গ্লানি।

—নরেন্দ্র

দেবতা

দেবতা চাই, আবার চাই দেবতা।
মানুষ দেখে দেখে হয়রান হলাম,
হয়রান হলাম মোটরে!

তা বলে, দীর্ঘশ্মশ্রু, জবরদস্ত দেবতা আর চাই না,
চাই না বিবর্ণ চিরকুমার দেবতা,
–পিতৃত্ব যার বিভীষিকা।
ইন্দ্রের মত লোভী আর ভোগী দেবতাও নয়,
নয় মথুরার মুরলীধর কৃষ্ণ
—প্রেম যার ব্যবসা!

আমাদের অন্য কিছু চাই
চাই নূতন দেবতা!
কেশরজালের যার দিগন্ত হ'ল আচ্ছন্ন,
তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রার ফাঁকে ঝলসাল বিদ্যুতের মত জিহ্বা,
সেই ভয়াল নৃসিংহ-মূর্তিকে ছাড়িয়ে,
ছাড়িয়ে সেই ক্ষিতি-বিদার বিরাট বরাহ,
আদিম পঙ্কিল পৃথিবীর সেই মহাকূর্মকেও
অতিক্রম করে,
প্রলয়-প্লাবনে যে মৎস্য তার শৃঙ্গে রাখল সৃষ্টি
তাকেও পিছনে ফেলে,
চল দেবতার সন্ধানে।
অন্য দেবতা চাই।

নদীরা যেখানে সমাপ্ত হ'ল,
হারিয়ে গেল জলায়,
সেখানে ওড়ে বন্য মরাল;
—ওড়ে গভীর কুজ্ঝটিকার ঊর্ধ্বে,
আর তার দীর্ঘ গ্রীবা বেয়ে ওঠে
অন্ধকারে অপরূপ ধ্বনি,
—ওঠে পরম সঙ্গমের ডাক।

সেই যে কুজ্ঝটিকা,
যেখানে ইলেকট্রন চলে আপন খুশিতে
দেয় না খেয়ালের জবাবদিহি,
যেখানে অদৃশ্য শক্তিতে পড়ে পরামাণুর গিঁট
আবার আপনি যায় খুলে—

সেই যে বিষম কুয়াশায়
জড়ানো, জট্‌পাকানো আবছায়া দেশ,
যেখানে কুয়াশার জটের সঙ্গে
কুয়াশার জটের লাগছে ধাক্কা,
ফেটে পড়েছে আরো কুয়াশায়
কিম্বা পড়ছে না,—
সেই বিজ্ঞানাতীত শক্তির কুজ্‌ঝটিকার
অন্তরাল থেকে চাই দেবতা!

তবে শোন,
সৃষ্টিমূল বিধাতা যেখানে ভাসছেন
পরমাণুর অন্তর্লীন কুজ্‌ঝটিকায়,
ভাসছেন ইলেক্‌ট্রন্‌ আর পসিট্রন্‌
আর বিজ্ঞানাতীত কুয়াশার ঘূর্ণীতে
বন্য মরালের মত,
সেখান থেকেই আসছে এই ধ্বনি,
—অপরূপ মরাল কন্ঠ-নিক্বণ,
যা কাঁপছে আমার নাভিপদ্মে
সঞ্চারিত হচ্ছে আমার সত্তায়!
বিজ্ঞানের অতীত সেই তমিস্রায়
আমি তাঁর পক্ষধ্বনি শুনি,
শুনি বিশাল পক্ষসঞ্চালনের
গুরু গুরু মৃদঙ্গ রোল,
আর তাঁর হিম-শীতল মৃৎ-মলিন পায়ের
স্পর্শ পাই আমার মুখে!
তিনি চলেছেন, অন্ধকারে অজানা রমণীর খোঁজে
চলেছেন স্বপ্ন-সঙ্গমে;
সুষুপ্তির মাঝে রমণীরা যাতে উঠবে আঁতকে!
দেবতা! দেবতা কি চাই?
যেখানে রমণী, সেখানে চলেছে মরাল!
কি ভাবছ বৈজ্ঞানিক?
কার তুমি হ'তে চাও জনক?
উৎসব কর, আমার আত্মা,
এবার শিশুর বদলে জন্মাবে হংস-শাবক,
—দুরন্ত বন্য কারণ্ডব!
রমণীর গর্ভে জন্ম নেবে বন্য মরাল,
প্রলয়-পয়োধি যে সাঁতরে হ'বে পার

যে প্রলয়ে সব মহানগর যাবে ডুবে,
ডুবে যাবে মোটর-মুখরিত এই সভ্যতা!

—লরেন্স

বিশ্লেষণ

কঙ্কাল হ'তে কর বিশ্লিষ্ট কৃপাণে দেব,
মহীরুহ সম দাঁড়াক ভয়াল নগ্নতায়।
সমুৎক্ষিপ্ত অরণ্য যারে, করে উধাও,
সে-হৃদয় মোর, হেরি' তাহা হোক্ চমৎকৃত।
শোণিত হইতে কর বিযুক্ত; আঁধারে শুনি,
পিতামহদের প্রাচীন লোহিত যে মহানদী,
পাতাল-বাহিনী বহুমুখী স্রোতে
সাগরে মেশে,
—গহন তিমিরে তবু সবিতারে, না দেখে কভু!
ঐন্দ্রজালিক আঁখি দাও মোরে; দেখি নয়ন,
—উতরোল নদী জীবন্ত হ'ল মাঝারে মোর;
স্ফটিক দারুণ!
যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান,
তারো চেয়ে যাহা কল্পনাতীত, অবাস্তব!
আত্মা হইতে কর বিভক্ত; হেরিব মোর
রুধিরস্রাবী ক্ষতমুখ-সম যত না পাপ,
দুঃসাহসিক জীবন-স্পন্দ!
নিজেরে যাহে,
উদ্ধার করি, পথের অচেনা পথিকে যথা।।

—চেস্টারটন্

রাত্রি

রাত্রি এল ঝাঁপিয়ে,
যেন রুপালী ধূমল চিতা
—তারকা-চিত্রিত স্তব্ধতা-মসৃণ!
তিনটি দ্বার ছিল খোলা
তবু আলোর ফাঁক গেল এঁটে
ফাঁদের মতন;—
স্তব্ধতা একটা ঝন্‌ঝনা!

প্রেত-পাণ্ডুর তারার
সেই চিতা-আকাশের তলার
দীর্ঘ গুমোটের রাত আমি দুঃস্বপ্নের সঙ্গে যুঝলাম।
মৌন অতিকায় স্বপ্ন,—
যুদ্ধহীন জয় গৌরবের, নিঃশব্দ ভেরীর
আর স্তব্ধ ঘণ্টার;—
ম্লান রাজ-সমারোহ গেল চলে
আমার সমুখ দিয়ে,
—শিরস্ত্রাণ আর শৃঙ্গ-কিরীট
আর বিপুল পুষ্পমাল্য!
বিচিত্র তাদের নিশান ঊর্ধ্ব আকাশে ঝোলান,
বিশাল তাদের ঢাল যেন মৃত্যুর দ্বার!

—চেস্টারটন্

স্টেশন

বৃত্তাকার এই যে বিশ্ব,
মানুষ যার বিধাতা,
তারও আছে সূর্যতারা,
সবুজ, সোনালী, লাল;
আর আছে ঘন ধোঁয়ার মেঘ-লোক,
কুণ্ডলিত স্তরে স্তরে
যা, সুদূর লৌহাকাশ রাখে ঢেকে।
হায় বিধাতা!
নিজেদের দাম কবে আমরা দেব!
যুগান্তরের আগে দেখব কোন এক মুহূর্তে,
বন্যা ও বহ্নির গর্জমান তুরঙ্গ-বাহনে
ঘূর্ণায়মান মানুষের এই দৃপ্তরূপ!
কিংবা
আবার বুঝি নিয়তি
সেই ধূসর প্রহসন করবে অভিনয়,
রইবে সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষায়,—
ধ্বংসের শ্মশানে
কবে কে এই ভগ্নস্তূপকে করবে প্রশ্ন,
—"কোন্ সে কবির জাত
তারকালোভী এই বিরাট খিলান
এখানে তুলেছে?"

—চেস্টারটন্

ফেরারী ফৌজ

পলাতক

বজ্রগর্ভ মেঘ এক কাল রাত্রে এসেছিল নগরের 'পরে,
ক্ষিপ্ত দানবের মতো ঘুরে ঘুরে কারে যেন করিল সন্ধান।
রুদ্ধশ্বাস নগরের দীপগুলি গেলো নিভে সভয়ে কম্পিত;
বিছানায় জেগে বসে শুনিলাম ফুকারিছে যেন কার নাম।
অন্ধকার চূর্ণ করে বজ্রাগ্নি জ্বালিল কত, ব্যর্থকাম তবু
ফিরে গেলো অবশেষে, শেষ অভিশাপ রেখে অশান্ত তুফানে।
ঘুম আর এলো নাকো; ঝটিকার আস্ফালনে সারা নিশি ভোর
সমস্ত আকাশে যেন মুহুর্মুহুঃ উচ্চারিত সেই এক নাম।
সে নাম শুনিনি কভু, তবু যেন মনে হয়, নয় সে অচেনা;
এই নগরের পথে তারে যেন কোনো দিন দেখেছি কোথাও।
কোন্ স্বর্গ-বঞ্চনার পাতকে সে পলাতক দেবরোষ হতে,
বজ্রগর্ভ মেঘ কাল শঙ্কিত নগরে যার হেঁকে গেলো নাম!

ভৌগোলিক

হিমালয় নাম মাত্র,
আমাদের সমুদ্র কোথায়?
টিমটিম করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা;
—তাম্রলিপ্তি সকরুণ স্মৃতি।
দিগন্ত-বিস্তৃত স্বপ্ন আছে বটে সমতল সবুজ ক্ষেতের,
কত উগ্র নদী সেই স্বপনেতে গেলো মজে হেজে ঃ
একা পদ্মা মরে মাথা কুটে।
উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে দারুণ দেবতার বর,
মাঠভরা ধান দিয়ে শুধু
গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া-তরণীর,
পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে
তারে কভু তুষ্ট করা যায়!
ছবির মতন গ্রাম

স্বপনের মতন শহর
 যত পারো গড়ো,
অর্চনার চূড়া তুলে ধরো
তারাদের পানে;
তবু জেনো আরো এক মৃত্যু-দীপ্ত মানে
ছিলো এই ভূখণ্ডের,
—ছিলো সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে।
সেই অর্থ লাঞ্ছিত যে, তাই,
আমাদের সীমা হলো
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে টেরাই!

পূষন্

আর সে সোনালী রোদ নয়
আর নয় মেঘের মাধুরী।
বৈশাখের সূর্য এলো নির্মম কঠিন,
খুঁজে ফেরে তোমায় আমায়,
বহ্নি-নখে বিদারিতে চায়
গভীর মাটির নীচে সুপ্তিমগ্ন বীজের মতন।
জ্বলন্ত আহ্বান তার
গহন মর্মের কোষে করি অনুভব।
জাগিবে না এখনো বিপ্লব?
সর্ব আবরণ ছিঁড়ে উলঙ্গ হৃদয়
চাবে নাকো আকাশের পরিচয়!
বার বার রাত্রি দিয়ে দিন যদি মুছি,
হে পূষন্! কবে হবো শুচি?

কাক ডাকে

খাঁ খাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর;
আকাশে উপুড় করে ঢেলে-দেওয়া
 অসীম শূন্যতা,
পৃথিবীর মাঠে আর মনে—

তারই মাঝে শুনি ডাকে
শুষ্ককণ্ঠ কাক।
গান নয়, সুর নয়,
প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা—কিছু নয়,
—সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।
মানুষের কথা বুঝি শুনেছি সকলই।
মনের অরণ্যে যত হাওয়া তোলে
কথার মর্মর,
—বেদনা ও ভালোবাসা
উদ্দীপনা, আশা ও আক্রোশ,
জেনেছি সমস্ত দোলা।
সব ঝড় পার হয়ে, আছে এক
শব্দের নীলিমা,
অন্তহীন, নিষ্কম্প, নির্মল।
কোথায় কাদের ছাদে সমস্ত দুপুর
কাক ডাকে, শুনি।
বোঝা আর বোঝাবার
প্রাণান্ত ক্লান্তির শেষে
অকস্মাৎ খুলে যায় আশ্চর্য কবাট।
কাক ডাকে, আর,
সে শব্দের ধু ধু-করা অপার বিস্তার
হৃদয়ে ছড়ায় সব শব্দের অতীত
ধ্যান-গাঢ় প্রশান্তির মতো।
আবার বিকেল হবে,
রোদ যাবে পড়ে,
মানুষ মুখর হবে
মাঠে আর ঘরে।
বোঝাপড়া লেনদেন
প্রত্যহের প্রসঙ্গ প্রচুর
মন জুড়ে রবে।
ক্ষণে ক্ষণে তবু সব সুর
কেটে দিতে পারে এক কাক-ডাকা গহন দুপুর।
সমস্ত অর্থের গ্রন্থি ধীরে ধীরে খুলে,
প্রত্যহের ভাষা তার সব ভার ভুলে,
উত্তরিতে পারে এক নিষ্কম্প নিথর
নভোনীল অপার বিস্ময়ে!

ইঁদুরেরা

ইঁদুরেরা সারারাত
অন্ধকারে চরে।
ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটা আর রুদ্ধশ্বাস থামা,
দুরু দুরু বুক নিয়ে বিস্ফারিত চাওয়া—
ইতস্ততঃ বিতাড়িত যেন সব
ছোট-ছোট হীন তুচ্ছ ভয়,
জীবনের সূত্রে গাঁথা, তবু মৃত্যুময়।
সারারাত অন্ধকারে
শুনি তারা করে খুটখাট্,
দুর্বল লোভের গ্রাসে লুঠ করে
ভাঁড়ার ও মাঠ,
তারপর কণা-কণা রাত্রি মুখে করে,
ফিরে যায় আপন বিবরে।
কোন্ এক আদি যুগে আশ্চর্য সকাল
হঠাৎ ছড়িয়ে দিয়ে রোদমাখা উৎসুক দিগন্ত,
এদেরো তো দিয়েছিলো ডাক'
পাখিদের ঝাঁক
সহসা ডানার শব্দে সচকিত করেছে প্রান্তর।
একবার চোখ তুলে ভীত ত্রস্ত পায়ে,
এরা ফের খুঁজেছে বিবর।
রাত্রির সঞ্চয় নিয়ে
এই সব শঙ্কাতুর আবছায়া মন
শুধু প্রাণ-দ্রোহ করে সুগভীর আঁধারে লালন।
দিনের তপস্যা হতে যত বাড়ে উজ্জ্বল প্রহর
ভরাট হয় না তবু জীবনের আদিম বিবর।

পাখীদের মন

নির্জন প্রান্তরে ঘুরে হঠাৎ কখন,
হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন।
আর শুধু মাটি নয় শস্য নয়,
নয় শুধু ভার:
আর এক বিদ্রোহী ধিক্কার—
পৃথিবী-পরাস্ত-করা উজ্জ্বল উৎক্ষেপ!

ফেরারী ফৌজ

আজো এরা মাঠে ঘাটে মাটি খুঁটে খায়,
মেনে নেয় সব কিছু দায়,
তবু এক সুনীল শপথ
তাদের বুকের রক্ত তপ্ত করে রাখে।
জীবনের বাঁকে বাঁকে, যত গ্লানি যত কোলাহল
ব্যাধের গুলির মতো বুকে বিঁধে রয়,
সে উত্তাপে গলে গিয়ে হয়ে যায় ক্ষয়।
শুধু দুটি তীব্র তীক্ষ্ণ দুঃসাহসী ডানা,
আকাশের মানে না সীমানা।
কোনো দিন এ-হৃদয় হয় যদি একান্ত নির্জন,
হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন
—আর এক সূর্য সচেতন।

ইস্পাত

খনির গভীর গর্ভে
চাপ-চাপ অন্ধকার কেটে
তুলে নিয়ে এসে যদি
জ্বালো এক প্রচণ্ড আগুন,
বিশাল যন্ত্রিত পাত্রে
জ্বাল দাও দীর্ঘ রাত্রিদিন—
দুঃসহ সে অগ্নি-পরীক্ষায়
দেখা দিতে পারে এক মৃত্তিকার ঘুমন্ত বিস্ময়।
সব ময়লা, সব গাদ, তারপর বাদ দিলে ছেঁকে,
অনেক চোলাই হলে অনেক ঢালাই
মেলে এক পরিশুদ্ধ কঠিন বিদ্যুৎ
—নীলাভ ইস্পাত।
গড়ে-পিটে সে ইস্পাত
হতে পারে খর তরবার
আগুন ও হিমে সেঁকে ধুয়ে,
আর বুঝি খাদ দিয়ে কিছু
—কিছু ছাই, কিছু স্বপ্ন,
আর সেই একান্ত গোপন
আত্মা-সহচর নীল তারাটির গভীর প্রত্যয়।
উলঙ্গ উৎসুক
ঝলসিতে সুতীক্ষ্ণ নির্মল—

কোনো খাপে এই অসি যায় নাকো ভরা
শত্রুর শোণিতে কভু না হয় রঞ্জিত।
রাজার কুমার বৃথা
এই অসি খোঁজে তেপান্তরে,
সদাগর ঘুরে মরে বন্দরে বন্দরে
সপ্ত ডিঙা নিয়ে!
এ কৃপাণ যায় না তো কেনা।
তারা বুঝি এখনো জানে না
এ অসির কঠোর কড়ার।
শুধু যারা একাধারে
আগুন ও পৃথিবীর কন্দরের অন্ধকার চেনে,
জানে দোলা মরু থেকে মেরুর তুষারে,
তারা কেউ কেউ
পেয়ে যেতে পারে এই আশ্চর্য ইস্পাত!
এই তরবার যার হাতে ঝলসায়,
ঘুম তার কেটে যায় সারা জীবনের,
ঘুচে যায় সমস্ত বিশ্রাম।
মৃত্যু ও রাত্রির দুর্গ যেখানে যেথায়,
খুঁজে খুঁজে নিয়ে,
অবিরাম অবরোধে আপনারে নিঃশেষে আহুতি
—এই তার নির্মম নিয়তি।

ফেরারী ফৌজ

নীলনদীতট থেকে সিন্ধু–উপত্যকা,
সুমের, আক্কাড আর গাঢ়–পীত হোয়াংহোর তীরে,
বার বার নানা শতাব্দীর
আকাশ উঠেছে জ্বলে, ঝলসিতে যাদের উষ্ণীষে,
সেই সব সেনাদের
চিনি, আমি চিনি;
—সূর্যসেনা তারা
রাত্রির সাম্রাজ্যে আজো
সন্তর্পণে ফিরিছে ফেরারী।
মাঝরাতে একদিন
বিছানায় জেগে উঠে বসে,
সচকিত হয়ে তারা

ফেরারী ফৌজ

শুনেছে কোথায় শিঙা বাজে,
সাজো সাজো, ডাকে কোন্ অলক্ষ্য আদেশ।
জনে জনে যুগে যুগে
বার হয়ে এসেছে উঠানে,
আগামী দিনের সূর্য দেখেছে আঁধারে
গুঁড়ো গুঁড়ো করে সারা আকাশে ছড়ানো।
সহসা জেনেছে তারা,
এই সব সূর্য-কণা তিল তিল করে,
বয়ে নিয়ে যেতে হবে কালের দিগন্তে,
রাত্রির শাসন-ভাঙা
ভয়ঙ্কর চক্রান্তের গুপ্তচর-রূপে।
এক একটি সূর্য-কণা তুলে নিয়ে বুকে,
দুরাশার তুরঙ্গে সওয়ার
দুর্গম যুগান্ত-মরু পার হবে বলে,
তারা সব হয়েছে বাহির।
সুদূর সীমান্ত হায়
তারপর সরে গেছে প্রতি পায়ে পায়ে;
গাঢ় কুজ্ঝটিকা এসে
মুছে দিয়ে গেছে সব পথ;
ভয়ের তুফান-তোলা রাত্রির ভ্রূকুটি
হেনেছে হিংসার বজ্র।
দিগ্বিদিক-ভোলানো আঁধারে
কে কোথায় গিয়েছে হারিয়ে।
রাত্রির সাম্রাজ্য তাই এখনো অটুট!
ছড়ানো সূর্যের কণা
জড়ো করে যারা
জ্বালাবে নতুন দিন,
তারা আজো পলাতক,
দলছাড়া ঘুরে ফেরে দেশে আর কালে।
তবু সূর্য-কণা বুঝি হারাবার নয়।
থেকে থেকে জ্বলে ওঠে শাণিত বিদ্যুৎ
কত ম্লান শতাব্দীর প্রহর ধাঁধিয়ে
কোথা কোন্ লুকানো কৃপাণে
ফেরারী সেনার।
এখনো ফেরারী কেন?
ফেরো সব পলাতক সেনা।
সাত সাগরের তীরে

ফৌজদার হেঁকে যায় শোনো।
আনো সব সূর্য-কণা
রাত্রি-মোছা চক্রান্তের প্রকাশ্য প্রান্তরে।
—এবার অজ্ঞাতবাস শেষ হলো ফেরারী ফৌজের।

সুড়ঙ্গ

রেলের আঁধার সুড়ঙ্গটা
ঝাঁপিয়ে এলো হঠাৎ,
আদিমকালের হিংস্রলোলুপ বিভীষিকার মতো।
মুছলো আকাশ, মুছলো আলো।
এক নিমেষে ডুবিয়ে দিলো
কোন্ পাহাড়ের গহন বুকের ভেতর।
অন্ধকারের নিরেট দেয়াল,
জলের ঝিরিঝিরি,
না-দেখা সব চাকার ঘরঘরানি,
সব ছাড়িয়ে তলিয়ে গেলাম
কালো কঠিন পাতাল-চেতনায়।
চিনি তো জল, আকাশ, মাটি
মরণ-ভীরু রৌদ্রপায়ী জানি প্রাণের লীলা,
হঠাৎ যেন এ সব চেনার অতীত
গিরির গহন হৃদয় থেকে
উৎসারিত নিকষ কালো কোমল বিকিরণে
পেলাম আরেক দিশা।
একটুখানি সবুজ প্রলেপ,
একটুখানি সুনীল জলের দোলা,
উঁচু ঢিবির কটা শুধু তুষার-সাদা চূড়ো;
তারই মাঝে মৃত্যু-নিষেধ-গণ্ডী-টানা খাতে
দিগ্বিদিকে হন্যে হয়ে
হাতড়ে-ফেরা ব্যাকুল জীবন-ধারা—
হে ধরণী তোমায় শুধু ওই টুকুতেই জানি।
জানি না তো তারই অন্তরালে
গূঢ় গভীর বিরাট হৃদয় জুড়ে
কি যে শপথ লালন কর,
বহ্নি-তরল, লৌহ-কঠিন তবু!
সূর্যে তোমার নিষ্ঠা অটুট,

আকাশে তাই বাতিল কর ছুটি,
আত্মা তোমার তবু জানি
আরেক তপোমগন।

তারা হয়ে জ্বলবে নাকো
সূর্য হয়ে পালবে নাকো গ্রহ,
কোটি আলোক-বর্ষ দূরে
দীপ্তি তোমার পৌঁছবে না কভু।
মহাকাশের ধুলোর কণা—
হে ধরণী ধেয়াও তুমি
সে কোন্ শীতল সৃষ্টিছাড়া শিখা!
আপন বুকের কঠিন তপের তাপে
জড়ের প্রান্তে ছোঁয়াও প্রাণের যাদু,
প্রাণের আধার ভেঙে ভেঙে
নতুন ছাঁচে গড়ো বারম্বার
তৃপ্তি-বিহীন কত-না কল্পান্ত,
সেই অপরূপ পরম শিখার লাগি—
সর্ব-তিমির বিদার যাহা
আলোর চেয়ে নিবিড় গাঢ় গূঢ়
চেতনা-বর্তিকা।

মহাকালের পলক-পড়া
আমাদের এই ক্ষণিক ইতিবৃত্তে,
সেই তপস্যা হতে,
একটি দুটি স্ফুলিঙ্গ কি ছিটকে এসে পড়ে?
উদ্ভাসিত সৃষ্টি হঠাৎ
চমকে উঠে থাকে স্পন্দমান।
জরা-মরণ-জর্জরিত,
রক্তলোলুপ দন্তে নখে
হানাহানির উদ্বেলিত জীবন-সীমা থেকে
তোমার শপথ নিমেষ তরে
বুঝিবা টের পেয়ে
আশাতে বুক বাঁধি।
আলোয় যাহা পেয়েও হারাই,
আজ সুড়ঙ্গ-পথে
সেই শপথের ছোঁয়ায় যেন
গভীর আমার মনে,
অয়স্কঠিন ব্রত কোনো জন্ম নিতে চায়।

জনৈক

নাম তার জানি নাকো;
শুধু জানি ধরণীর ধূলিম্লান আশার প্রতীক
আছে এক করুণ পথিক,
—যুগে যুগে সব যুদ্ধে হেরে-ফিরে-আসা
ক্লান্ত পদাতিক।

সব জনতার মাঝে বুঝি মিশে থাকে,
ছিলো চিরকাল;
তবু তারে কারো মনে নেই।
অমরত্ব-লোভী কোন্ ফারাও-এর মৃত্যুসমারোহ
সেও বয়ে নিয়ে গেছে অগণন বাহকের সাথে
গিজে না মেদুমে;
মুহূর্তের পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে তপ্ত বালুকায়
জনারণ্যে গিয়েছে হারিয়ে।

শ্রাবন্তীর জেতবনে
সুগতের মহা উপস্থানে
সেও বুঝি কোনো দিন দূর হতে করেছে, প্রণাম,
হয়েছে সিঞ্চিত
প্রসন্ন সে নয়নের করুণা-কিরণে।

গ্যালিলির হ্রদের কিনারে
শুনেছে সুসমাচার বিস্মিত বিহ্বল;
তারপর সেও বুঝি মানব-পুত্রেরে
বিকিয়ে দিয়েছে শুধু এক মুষ্ঠি স্বর্ণ-বিনিময়ে
আঁধারের পূজারীর কাছে।
'বাস্তিলে'র চূর্ণ ভিত্তি-মূলে
তারও বুঝি আছে পদাঘাত,
তারও ক্ষমাহীন ঘৃণা
গিলোটিন করেছে শাণিত
তারপর সীমাহীন 'স্টেপি'র তুষারে
দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সূর্যাস্ত-সংকেত
এঁকে দিয়ে গেছে নিজ হৃদয়-শোণিতে।

ইতিহাসে নিরন্তর
চিহ্নহীন তার পদধ্বনি
বেজে বেজে চলে,
বিপ্লব-আবর্ত ছন্দে

কভু দ্রুত, কভু বা মন্থর
দুর্বিষহ জীবনের ভারে।
হিংসার ঝটিকা ওঠে,
ঢল নামে ভীতি আর মৃঢ় বিদ্বেষের।
মৃত্যুবাহ দুর্ভিক্ষ ও মড়কের
দিগ্বিদিক ঢেকে-দেওয়া শকুন-ডানার
ছায়া পড়ে গাঢ় হয়ে;
ক্ষীণ তার পদশব্দ
জীবনের সমস্ত কল্লোলে
তবু মিশে থাকে।
তারই সাথে সেদিন সহসা
দেখা হয়ে-গেলো যেন পথের কিনারে।
নগর উৎসবে মত্ত;
কল্লোলিত জনতার স্রোত
পথ দিয়ে বয়ে যায় দুরন্ত উল্লাসে;
নিশান উড্ডীন ঊর্ধ্বে
শঙ্কাহীন স্বপনের মতো।
এরই মাঝে জানি না কখন
দাঁড়িয়েছে এসে পাশে,
ম্লান কণ্ঠে করেছে জিজ্ঞাসা
ঠিকানা কোন্ সে বুঝি অখ্যাত গলির;
—সেথায় সে যেতে চায়, জানে নাকো পথ।
হেলাভরে দিইনি উত্তর
কিছুক্ষণ পরে দেখি সে গিয়েছে মিশে জনতায়।
ফিরেছি উৎসব হতে উদ্দীপ্ত হৃদয়ে
তবু যেন থেকে থেকে কি এক বিষাদ
ছুঁয়ে যায় মন;
ভোলা যেন যায় নাকো নাম এক অচেনা গলির
আজো যার পাইনি ঠিকানা।

আদ্যিকালের বুড়ি

এক যে ছিল অ্যামিবা,
আদ্যিকালের বুড়ি,
রোগ ছিলো তার খাই-খাই, আর
কিসের সুড়সুড়ি!

কিসের কে জানে!
নেই কো মরণ হতভাগীর
নেই কো কোথাও কেউ,
ভেতরে তার ধুকধুকুনি,
বাইরে জলের ঢেউ।
মনের দুঃখে দুখান হলো,
লাগলো আবার জোড়া
যোগ-বিয়োগের খেলায় ভাবে,
পাবে রোগের গোড়া।
কালে কালে কতই হলো,
সেই অ্যামিবা মানুষ হলো,
মড়ার বাড়া গাল জানে না,
তবু ওড়ায় ঘুড়ি,
কেমন করে সারবে যে তার
আদিম সুড়সুড়ি।
চোখ গজালো, কান গজালো,
আরো কত কি,
দিগ্‌গজেরা বলে সব-ই
ভস্মে ঢালা ঘি!
—কিছু হয় না মানে!

'তেন ত্যক্তেন'

ছাগলছানা লাফিয়ে চলে,
পড়লো তবু কাটা।
ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে দিলে,
হলো বলির পাঁঠা।
ধড়টা মরে ধড়ফড়িয়ে,
মুণ্ডু আছে ঠিক।
থাক বা না-থাক যার পাঁঠা সে
আপনি বুঝে নিক।
গুহ্য কথা উহ্য আছে,
বুঝতে যদি পারো,
ত্যাগ করে ভোগ করবে, লোভ আর
করবে না ধন কারো।

কালাধলা ভাই আমার

এ পারেতে কালো রং বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম
ও পারেতে গাছে শুধু লঙকা টুকটুক করে,
কালাধলা ভাই আমার মন কেমন করে।
মাঠে নেই পাকা ধান মই দেবো কি?
কাস্তে কোদাল থাকে আনো শান দিয়ে দি।
মুগুর হাতুড়ি দাও কাঁটা ঠুকে নেবো
হাসিমুখে ঠোঁটবাঙা পান খেতে দেবো।
নদীতে কোটালে বান, ডিঙি ভেঙে খানখান
এ বারেতে যাদুমণি কেমন করে যাই
আবার জোয়ার এলে হবে না কামাই।
ঘরে আছে খুদকুঁড়ো
তাতে দিও নুনের গুঁড়ো,
লঙকা দুটো ছিঁড়ে, তাই—
চাঁদ মুখে খাও।
বাদল গেলে দেব তোমায়
পুলি-পোলাও।

পাখী

কত পাখি উড়ে চলে যায়।
সেই পাখি কখনো আবার
আসবে কি ফিরে—
গ্রীষ্মের দুপুর এক দিগন্ত বিস্তৃত
পুড়ে যাওয়া প্রান্তরের
তপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে
যার ডাকে পেয়েছিলো ছায়া।
—কটি ফোঁটা ঘুম যেন
নির্মৃতি রাতের
ঝরেছিলো শুষ্কতালু মধ্যাহ্নের পরে।
অনেক পুষেছি পাখি
অনেক খাঁচায়।
ছাদে-ঢাকা যত ঘর
যত না দেওয়াল

দিগন্ত আড়াল-করা,
তত খাঁচা তত পোষা পাখি।
তারা শুধু নয় ফাঁকি।
কুচিকুচি নীলাকাশ
তারাই আমার,
তারাই গহন দূর বন।
তবু মন
না মানে সান্ত্বনা।
ধু ধু করে চারিদিকে দিগন্ত মরুর
চেয়ে চেয়ে ভাবি শুধু
সেই পাখি আজো কত দূর!
কোনো দিন কোনো জালে
পড়েনি সে ধরা
খাঁচায় যায় না তারে ভরা।
অকস্মাৎ কোনো দিন
উড়ে এসে বসে আলিসায়
স্নিগ্ধ চোখে চায়।
কণ্ঠে তার কাঁপে কোন্ সুর,
অসীম দুপুর
হঠাৎ স্তিমিত হয়ে আসে
বটের ছায়ায়-ঘেরা
জলের ধারের ভিজে ঘাসে।
সে শুধু আকাশ নয়,
নয় শুধু বন
নয় শুধু বিফল স্বপন।
ভাবী সূর্য হতে ছেঁড়া
কোন্ এক ভয়ছাঁকা রোমাঞ্চিত রাত
—জীবনের আশ্চর্য সাক্ষাৎ!

প্রেতায়িত

প্রেতের মতন এক ধূসর বিষাদ
এইখানে থাকে,
এই নদীতীর থেকে ওপারের ধু-ধু-করা দিক-ছোঁয়া মাঠে
হারানো গ্রামের কোনো ভেঙে-পড়া মন্দিরের ত্রিশূল-চূড়ায়
আপনাকে মেলে দিয়ে কখনো কখনো,
ধোঁয়াটে কুয়াশা গায়ে মাখে।

ফেরারী ফৌজ

সমস্ত দুপুর ধরে
একা একা ঘাটের কিনারে,
ঝাঁকড়া অশথ গাছে একটি কি দুটি পাতা নাড়ে,
দু-একটা উদাস ভাবনা
হঠাৎ ভাসিয়ে দেয়
ঘুরে ঘুরে খসে-পড়া শুকনো পাতায়।
কখনো বা স্তব্ধ হয়ে শোনে,
ঘুঘু নয়, কে গোঙায়
ধরণীর মনে।

যদি কোনো দিন ভুলে বস এসে ঘাটের ওপর
কোনো সন্ধ্যাবেলা,
তোমার হৃদয় নিয়ে ফিরে যেতে দেবে না একেলা।
তোমার জীবন ঘিরে যদি কারো নাম
দিগন্তের মতো জাগে, নিরুদ্দেশ তবু অবিরাম,
তার কোনো দিনকার চেপে-রাখা একটি নিশ্বাস
হয়তো লুকিয়ে এনে ছেড়ে দেবে অকস্মাৎ
ঝিরিঝিরি অশথের পাতা-কাঁপা কোমল আঁধারে
অথবা ওপার থেকে
একটি করুণ তারা তুলে
গড়ে দেবে যেন তার মুখ;
—এই তার দুর্বোধ কৌতুক!

একবার ছোঁয়া যদি লাগে সে ভৌতিক,
তারপর হৃদয়ের কোথা কাল, কোথা দেশ, দিক!

জয়

সূর্যের প্রথম নাম
আমি রাখিলাম,
আমি তো দিলাম,
মাটি জল আকাশেরে প্রথম প্রণাম।
তবু জানি, তাও কিছু নয়
সে তো নয় জয়

সৃষ্টির মৌচাক,
মধু তাতে থাক্ বা না-থাক্
সারাক্ষণ গুঞ্জন-মুখর,
গ্রহতারা নীহারিকা
শৃঙ্খলিত সমস্ত প্রহর।

আমি যে এলাম সব শেষে
সেই এক তরঙ্গেতে ভেসে,
জানে না যা তীর কি সাগর;
— ঊর্ধ্বশ্বাস রূপান্তর
শুধু যার নিত্য নিরুদ্দেশ।
এধারে বিস্ময় মোর ওধারে বিস্মৃতি,
—চেতনার অসংলগ্ন অলীক উদ্ধৃতি'
তবুও আকাশ হলো
সহসা অবাধ অবকাশ,
ছিন্ন হলো সময়ের পাশ,
মৃত্যুর ভ্রূকুটি-ভরা ঊর্ধ্বফণা তরঙ্গের তলে
বালুবেলা পরে যেই লিখে এক বিদ্রোহীর নাম
আমি হাসিলাম।

কথা

তারপরও কথা থাকে,
বৃষ্টি হয়ে গেলে পর
ভিজে ঠাণ্ডা বাতাসের মাটি-মাখা গন্ধের মতন
আবছায়া মেঘ মেঘ কথা।
কে জানে তা কথা, কিম্বা
কেঁপে ওঠা রঙিন স্তব্ধতা।
সে কথা হবে না বলা তাকে।
শুধু প্রাণ-ধারণের প্রতিজ্ঞা ও প্রয়াসের ফাঁকে ফাঁকে
অবাক হৃদয়
আপনার সঙ্গে একা একা
সেই সব কুয়াশার মতো কথা কয়।
অনেক আশ্চয কথা হয়তো বলেছি তার কানে,
হৃদয়ের কতটুকু মানে
তবু সে কথায় ধরে'
তুষারের মতো যায় ঝরে
সব কথা কোন্ এক উত্তুঙ্গ শিখরে
আবেগের।
হাত দিয়ে হাত ছুঁই
কথা দিয়ে মন হাতড়াই,
তবু কারে কতটুকু পাই।

সব কথা হেরে গেলে
তাই এক দীর্ঘশ্বাস বয়।
বুঝি ভুলে কেঁপে ওঠে
একবার নির্লিপ্ত সময়।
তারপর জীবনের ফাটলে ফাটলে
কুয়াশা জড়ায়,
কুয়াশার মতো কথা হৃদয়ের দিগন্তে ছড়ায়।

প্রাচীন পদ্ধতি কোনো

প্রাচীন পদ্ধতি কোনো
হৃদয়ের আষ্টেপৃষ্ঠে ফাঁস দিয়ে
রাখে সারাদিন।
শুধু একবার
যখন অনেক রাত
ঝিম্‌ঝিম্‌ ঝিঁঝিতে ঝাঁঝরা,
জানালায় বৃষ্টি এসে টোকা দিয়ে ডাকে,
খিল খুলে রোয়াকে দাঁড়াই,
তারাদের হাঁপ-ধরা হাওয়া বয়
শুনি সাঁই-সাঁই।
হয়তো তখন,
দূরের বিদ্যুতে-কাঁপা ভিজে অন্ধকার হয়
ঠিক যেন তাকে মনে-পড়ার মতন
প্রাচীন পদ্ধতি কোনো!
সে পদ্ধতি কত বা প্রাচীন;
আমার বুকের এই ধুক্‌-ধুক্‌ ঢের পুরানো যে!
আদিম সাগর থেকে ধার-করা নোনা রক্ত
পুরানো তো আরো।
সে রক্ত কি ঘড়ি ধরে ঠিক
হৃদয়ে যোগান দেবে রোজ শুধু নিয়ম মাফিক!
সাগরের সব নুন শোধ করে তার
নেই আর চাঁদ-ধরা একটা জোয়ার?
একটি কি নেই তার পাখি,
সুবিশাল সাদা ডানা মেলে
সময়ের সীমান্ত যে পার হতে সাহসী একাকী?
বাড়িঘর ডিঙি আর সাঁকো

কত বার ভাঙাগড়া হবে, জানি নাকো।
পৃথিবীর রোদ বৃষ্টি আলো অন্ধকারে
পোড় খেয়ে, টোল খেয়ে,
পাকা আর ঝানু হয়ে, আমাদের খুলি আর হাড়,
আগামী কালের তাজা ফসল ফলাতে
বার বার পলি পড়ে হয়ে যাক সার।
একদিন কিন্তু হৃদয়ের
তার সাথে চেনা হয়।
যত কিছু মোড়া আছে সব খুলে খুলে
উজ্জ্বল হৃদয় গিয়ে ওঠে এক বিস্ময়ের কূলে,
সময়– ছাড়ানো।
বালুচর নদীজলে যত রোদ জ্বলেছে খানিক,
সূর্যতপ্ত যত গান গলে গেছে
আগেকার হারানো হাওয়ায়,
সব যেন মাছ হয়ে পাখি হয়ে রূপালি সোনালি
আর এক মানে ফিরে পায়।
আর এক নক্সা পায়
ছেঁড়াখোঁড়া ছড়ানো জীবন।
তবু থাকে প্রাচীন পদ্ধতি,
তবুও সময় বয়ে যায়।
রাতের শিশির ধরে ঘাসে ঘাসে মাকড়ের জাল
যেমন জমিয়ে রাখে ঝক্‌ঝকে আশ্চর্য সকাল,
তেমনই হৃদয়
তাই কটি মুহূর্তের করুণ সঞ্চয়
গোপন কাঁটার মতো বয়।

আরো এক

আরো একজন আছে
নাম যার ধরি না কখনো।
মনে পড়ে যায় শুধু
কাজ সেরে ক্ষেত ও খামারে,
ঘাম মুছে এক হাতে
জীবনের বেড়াটার ধারে এসে দাঁড়াই যখন,
শুনি তার নিশ্বাসেতে উথলায় রাতের আঁধার,
শিহরায় অরণ্য গহন।

ফেরারী ফৌজ

এ-বেড়া হবো না পার!
ঘরে ফিরে গিয়ে ফের
হেঁসেলের গন্ধ নিয়ে বুকে
আলো জ্বেলে মেলাবো হিসেব,
যার কাছে যত দেওয়া-নেওয়া,
পাণ্ডা ও পুলিশ আর চালের আড়ত,
অতীত ও বর্তমান, দূর ভবিষ্যৎ।

সব বোঝাপড়া শেষে
তবু জানি রইল কি ফাঁকি।
বিনিদ্র রজনী ধরি
রক্তাক্ত হৃদয় তাই গুণবে একাকী।

নিঃসঙ্গ

নদী যদি পড়ে পথে যেতে,
কেউ কেউ চুপচাপ বসে নাকো গিয়ে তার ধারে,
প্রাণপণে অনেক কৌশলে
ইট কাঠ লোহা এনে পোল বাঁধে এপারে, ওপারে;
তারপর চলে যায় আর কোন্ পাহাড়ের লোভে,
সমারোহে সব সূর্য যেখানেতে ডোবে।

আর কেউ সেই তীর দেখে মেপে মেপে,
তারপর বসে মাটি চেপে,
ঘাট বাঁধে, পাতে হাট,
দেখিয়ে বিস্তর ঠাট,
যত পারে বড় করে' গড়ে গোলাঘর,
চুপিচুপি শুষে নেয় নদী ও প্রান্তর।

তারা জানে পাকাপোক্ত যতখানি ভিত,
জীবনের ততখানি জিত।
মোটা মোটা থাম দিয়ে তারা তাই
উঁচু করে কোঠাঘর তোলে,
নদী আর সময়ের ঢেউ,
যাতে না পায় নাগাল।
আর যারা আছে সব
স্রোতে এসে স্রোতে ভেসে যায়,
গোলা থেকে কোঠাবাড়ি
যখন যেখানে যার আনাচে কানাচে ঠেকে যায়,
খানিক দাঁড়ায় আর—

কুড়িয়ে যা পায় তাই খুঁটে নিয়ে খায়।
এদের কারুর সঙ্গে তোমার বনে না কোনো দিন,
তবু তুমি নও বেদুইন।
দিগন্তের তারা নয়,
হৃদয়ের আরেক আকাশে
দুর্নিরীক্ষ্য কোনো এক নীল তারা হাসে।
চেনা তারে যায় কিনা, তাই স্রোতে ভাসো,
নায়ে তবু রাখো না নোঙর,
আবার কখনো তীরে তার তরে বাঁধো খেলাঘর।
তবু প্রাণ কোনোখানে মেলে না শিকড়।
ওরা কেউ স্রোত চেনে, কেউ চেনে তীর,
তারো চেয়ে আরো সুগভীর
কে জানে পেয়েছে কিনা আর কোনো মানে!
তোমার জীবন ফোটে
শুধু এক নীল তারা পানে।

তিনটে জোনাকি

একটি জানালা আর
জানালার ফাঁকে কটি তারা;
তাই নিয়ে রাত প্রায় সারা।
মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে হাওয়া,
যেন কার চুপিচুপি গাওয়া
ভাষা-ভীরু সোহাগের গান—
মন যার খোঁজে না প্রমাণ।
আলো জ্বেলে খুলে আছি খাতা,
ধু ধু করে শুধু সাদা পাতা।
এতক্ষণ ছিলাম একাকী।
ঘরে এলো তিনটে জোনাকি!

যদিও মেঘ চরাই

হয়তো আকাশে শুধুই মেঘ চরাই,
কখনো বৃষ্টি কখনো আলো ছড়াই
অথবা রং চড়াই।

তবুও ভেবো না ভেবো না
যার যা খাজনা দেবো না।
ক্ষেতের ফসল আমিও কেটেছি
শূন্য নয় মরাই।
যদিও বাঁধন না মেনে হই উধাও,
গরল যেমন তেমনি চাখি সুধাও,
কিম্বা যা কিছু দাও।
তবুও ভেবো না ভেবো না,
মেলায় মুজরো নেবো না।
দল ছাড়া বলে বদলেছি কিনা
ও-কথা মিছে শুধাও।

সংশপ্তক

এখনো যে তারা ফেরারী,
মাঝরাতে উঠে বিছানায়
যারা শুনেছিলো আঁধারে
শিঙা বাজে কোথা সাজবার।
বার হয়ে এসে উঠোনে,
দেখেছে রাতের আকাশে,
আগামী দিনের সূর্য
গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছড়ানো।
প্রতিকণা তার কুড়িয়ে
এড়িয়ে রাতের পাহারা,
মরু-যুগান্ত দুর্গম
পার হয় তারা গোপনে।
হায়, সীমান্ত সরে যায়
ফুরোয় না কাল রাত্রি।
দিশাহারা মহামরুতে
কে কোথায় যায় হারিয়ে।
সূর্যের কণা চূর্ণ
তাই হেথা সেথা ছড়ানো।
আজো তারা সব ফেরারী
রাত যারা মুছে ফেলবে।
তবু গুঁড়ো গুঁড়ো সূর্য

মাঝে মাঝে ওঠে ঝলসে
কালে কালে দেশে বিদেশে
গুপ্ত সেনার কৃপাণে।

জড় করে সব কণিকা
আগামী দিনের সূর্য
কবে তারা গড়ে তুলবে
সংশপ্তক বাহিনী!

সপ্ত সাগর কিনারে
আজো শিঙা বাজে অবিরাম,
ফেরারী ফৌজ সাড়া দাও
অজ্ঞাতবাস হলো শেষ।

নৌকো

মনে পড়ে
নুলিয়াদের সেই নৌকো,
ঢেউএর নাগাল ছাড়িয়ে
শুকনো বালির ওপর কাঠের ঠেকো দিয়ে আটকে রাখা।!
মনে পড়ে
তারই ওপর গিয়ে বসেছিলাম
সেদিন প্রথম রাতে!

কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয়া কি তৃতীয়া,
চাঁদ উঠতে আর দেরি নেই।
সমুদ্রে যেন তারই অস্থির উত্তেজনা,
হু হু-করে-বওয়া হাওয়ায়
তারই উদ্দাম উদ্বেগ।

শুধু বসেছিলাম পাশাপাশি,
হাত তো ধরিনি, বলিনিও কিছু।
কিই বা বলবো সমুদ্রের চেয়ে ভালো করে!
উদ্দাম হাওয়াতেই ছিলো আমার আলিঙ্গন।
ছুঁইনি তাই।
মনে কি পড়ে,
হঠাৎ নৌকোটা উঠেছিলো দুলে,
বুঝি হাওয়ায় বালি সরে গিয়ে
কাঠের ঠেকো একটু নড়ে উঠে,
কিংবা বুঝি সমুদ্রেরই ডাকে।

ফেরারী ফৌজ

একটু শিউরে উঠেছিলে
হেসে উঠেছিলে তারপর
'যদি... ?'
একই প্রশ্ন বুঝি উঠেছিলো
দু'জনের চোখে ঝিলিক দিয়ে।
যদি নৌকো যায় ভেসে
চাঁদ ওঠার ওই থমথমে প্রহরে
তরল রাত্রির মতো নীলাগলানো এই সমুদ্রে!
যদি নৌকো ভেসে যায় হঠাৎ
সম্ভবের এই কঠিন শাসন
কাঠের ঠেকোর মতো ঠেলে ফেলে!
তা কি কখনো যায়!
জানি, জানি এ যে নুলিয়াদের জেলেডিঙি
শুধু মাছ ধরতেই জানে।
সে নৌকো থেকে নেমে এসেছি,
ফিরে এসেছি সেদিনকার সেই সমুদ্রতীরে থেকে
বাঁধানো রাস্তার এই শহরে,
দেওয়াল-দেওয়া এই ঘরে।
তবু জেনো সে নৌকো কেমন করে এসেছে সঙ্গে,
জেনো, সে নৌকো চিরদিন থাকবে তৈরি
সম্ভবের তীরপ্রান্তে
আশায় উদ্বেগে কম্পমান।

ট্রেন থেকে

ট্রেনের কামরায় ছিলাম বসে,
মাঠ বন গ্রাম যাচ্ছিল বয়ে
জানালা দিয়ে দুরন্ত স্রোতে।
হঠাৎ বৃষ্টি এলো ছুটে, দূর দিগন্ত থেকে
সার-বাঁধা বিরাট এক ফৌজের মতো—
ধরবেই—আমাদের ধরবেই!
ট্রেনের সঙ্গে যেন তাদের দৌড়ের পাল্লা।
আকাশে পড়লো সাড়া।
সাড়া পড়লো আমার মনে।
অনেক দিন এমন ছোটা আর ছুটিনি,
এমন ছাড়া পায়নি আমার মন
আকাশ-ছোঁয়া তেপান্তরে

পক্ষীরাজে- চড়া রাজপুত্তুরের মতো।

নতুন পোল

বড় গঙ্গার দুধারে
নতুন পোলের দুই আধেক-তৈরি বাহু
যেন ফণা তুলে আছে!
রাতের অন্ধকারে
তাদের চোখে যেন হিংস্র বিষের ঝিলিক্!
জাহাজে, জেটিতে, স্টীমারে, ক্রেনে
এ নদীর অনেক লাঞ্ছনা তো দেখছি,
তবু কেমন ভয় হয় আজ!
সামান্য নদী পার হওয়ার
যেন বড় ভয়ঙ্কর ভূমিকা!

গ্রামান্তে রাত্রি

গ্রামের উপর রাতের নিবিড় অন্ধকার
সুষুপ্তিতে জমাট।
হঠাৎ কোথায় উঠল একটা কোলাহল।
শব্দের একটা ঢেউ,
নিথর নিস্তব্ধতার সায়রে দুলে উঠেই
গেল মিলিয়ে।
কটা উত্তেজিত কুকুরের অকারণ চিৎকারে
শুধু তার প্রতিধ্বনি রইল খানিক জেগে।
উৎকর্ণ হয়ে রইলাম খানিক
প্রচণ্ড কৌতূহলে—
তবু কিছুই গেলো না জানা।
কাল সকালে দিনের আলোয়
এ-কৌতূহল কোথায় যাবে হারিয়ে।
তবু এই নিস্তব্ধ রাত্রির নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে
গ্রামান্তের এই অস্পষ্ট কোলাহল
কি আতঙ্কের শিহরণ তুলে গেলো আমার মনে!
নিশ্ছিদ্র রাত্রির বিরাট মসিকৃষ্ণ যবনিকায়
যেন ইতিহাসের সমস্ত অসংলগ্ন দুঃস্বপ্নের ইঙ্গিত!

ফেরারী ফৌজ

সুপ্ত আর্যাবর্তের শিয়রে গান্ধারের গিরিপথে
হিংস্র হূন-বন্যা এলো ঝাঁপিয়ে,
মিশরের মরুভূমিতে বেজে উঠলো বর্বর বাহিনীর দামামা,
বিস্মৃত কোন ইট্রাস্‌কান্‌ নগরীর শেষ আর্তনাদ
উঠলো আকাশে!

তারপর গভীর গহন স্তব্ধতা।
ইতিহাসের সমস্ত রক্তাক্ত অধ্যায়ের মতো
গ্রামান্তের ক্ষণিক কোলাহল
রাত্রির অতল তিমিরে লুপ্ত।

স্তব্ধতা

হে আমার মৌন নীল রাত্রি,
তোমার স্তব্ধতা কি ভাঙবে
শুধু শকট-ঘর্ঘরে!
হে আমার কালো গাঢ় সাগর-অতলতা,
তুমি কি ঢেউ তুলবে
শুধু মৎস-পুচ্ছ-তাড়নে!
হাটে তো যেতেই হবে,
দরদস্তুরও করবো।
জাঁতাও ঘোরাবো,
কিংবা লাঙলও ঠেলবো
নতুন বৃষ্টি-ভেজা মাঠে;
কিন্তু প্রান্তর-সীমায়
ওই বাজ-পড়া ন্যাড়া গাছটা তবু কাটবো না।
ফুল ফোটে না ও-গাছে,
ফলও ধরে না।
শুধু ওর আঁকাবাঁকা মরা ডাল বেয়ে
কোন্‌ মৌন নীল স্তব্ধতা আসে
আমার নিঃসঙ্গ অভিসারে।

পোলের ওপর পাঁচুই মাঘ

নদীর ওপর সকালবেলার কুয়াশা
যতবারই দেখি না, মন কেমন কেঁপে ওঠে।

জাহাজ স্টীমার জেটি ক্রেন আর
বিরাট যত কারখানা,
নদীর উপর হুমড়ে-পড়া আকাশ-কাটা শহর
মনে হয়, এই গেলো মুছে,
জল-মাখানো তুলির টানে কাঁচা ছবির মতো।

কি আছে সেই ছবির তলায়—একেবারে সাদা
ভাবীকালের কোন্ ভাবুকের
দিশাহারা রঙ-না-লাগা ভাবনা,
মন বুঝি তা টের পেয়েছে একটু।

আমার ছায়া পড়লো না আজ রোদ-লুকোনো ভোরে
নতুন গোলের গায়ে।
এই আনন্দে তবু হলাম পার,
পাঁচুই মাঘের ঝাপসা তারিখ ময়লা কাচের মতো,
আমার বুকের হাই লেগে তো
একটুখানি হবে পরিস্কার,
আরেক অবাক নতুন ছবির জন্যে।

ফ্যান

নগরের পথে পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব
ঠিক মানুষের মতো
কিংবা ঠিক নয়,
যেন তার ব্যঙ্গ-চিত্র বিদ্রূপ-বিকৃত!
তবু তারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর
জঞ্জালের মতো জমে রাস্তায় রাস্তায়,
উচ্ছিষ্টের আস্তাকুঁড়ে বসে বসে ধোঁকে,
—আর ফ্যান চায়।

রক্ত নয়, মাংস নয়,
নয় কোনো পাথরের মতো ঠাণ্ডা সবুজ কলিজা,
মানুষের সৎভাই চায় শুধু ফ্যান।
তবু যেন সভ্যতার ভাঙে নাকো ধ্যান।

একদিন এরা বুঝি চষেছিলো মাটি
তারপর ভুলে গেছে পরিপাটি
কত ধানে কত হয় চাল,
ভুলে গেছে লাঙলের হাল
কাঁধে তুলে নেওয়া যায়,

কোনো দিন নিয়েছিলো কেউ।
জানে নাকো আছে এক সমুদ্রের ঢেউ
পাহাড়-টলানো।
অন্ন ছেঁকে তুলে নিয়ে,
ক্ষুধাশীর্ণ মুখে যেই ঢেলে দিই ফ্যান,
মনে হয় সাধি একি পৈশাচিক নিষ্ঠুর কল্যাণ!
তার চেয়ে রাখি যদি ফেলে,
পচে পচে আপন বিকারে
এই অন্ন হবে নাকি মৃত্যুলোভাতুরা
অগ্নি-জ্বালাময় তীব্র সুরা?
রাজপথে কচিকচি এই সব শিশুর কঙ্কাল—মাতৃস্তন্যহীন,
দধীচির হাড় ছিলো এর চেয়ে আরো কি কঠিন?

ছোঁয়া

সারাদিন ঘেঁষাঘেষি মানুষের ভীড়ে
কত ছোঁয়া লাগে সারা হৃদয়ে শরীরে।
রাত হলে একা ঘরে এসে
একে একে সব দাগ মুছে দেখি শেষে,
একটি গভীর ছোঁয়া তবু লেগে আছে
হৃদয়ের একেবারে কাছে।
যে শহরে শুধু ধুলো ধোঁয়া,
সেখানে কোথায় এই ছোঁয়া
লেগেছিলো কার?
কত ভাবি তবু মনে পড়ে নাকো আর।
অপরিচিতের এই উদাসীন অচেনা নগরে
কাটালাম বহুদিন প্রবাসীর মতো,
শুনেছি অনেক নাম, ভুলে গেছি কত,
একা একা হেঁটে হেঁটে গেছি কত দূর,
তবু এতদিন দেখা পাইনি সে একটি বন্ধুর।
চোখ তারে চেনে নাকো,
মন তার জানে না প্রমাণ।
চেতনার অন্য পিঠে শুধু
আজীবন বয়ে ফিরি সুগোপন এক অভিজ্ঞান।
অগণন মানুষের ভীড়ে

কখন সে অভিজ্ঞান হলো বিনিময়
আনমনা জানে না হৃদয়।
তারপর নগরের দুটি বাতায়নে
একটি অতল রাত্রি বয় দুটি মন থেকে মনে।

প্রহসন

সূর্যের অঢেল রোদ পৃথিবী পেয়েছে এযাবৎ
অরণ্য-রসনা বেয়ে
সেই রোদ নেমে গেছে
পৃথিবীর সুগভীর পঞ্জরের তলে
গাঢ় গূঢ় প্রস্তরে পুঞ্জিত।
তবু মানুষের বুকে
কি দুর্ভেদ্য কঠিন আঁধার!
কি আদিম অন্ধ বিভীষিকা
কবন্ধের মতো সেই মহারাত্রি-শাসিত শ্মশানে
হানা দিয়ে ফেরে!
এই তো শরৎ হাসে শুভ্র মেঘে কি প্রসন্ন হাসি!
জলে স্থলে কি মধুর মায়া!
—এ-বিদ্রূপ রাখো মহাকাল
কেন এই নিষ্ঠুর ছলনা?
বুক যার অন্ধকার, চোখে তার এ-আলো নেভাও।
উদ্ভাসিত চেতনার অলীক এ-বিভ্রম ঘুচায়ে,
ডোবাও আদিম পঙ্কে,
নখ-দন্ত-আস্ফালিত
তামসিক জীবনের রুধিরাক্ত গহন প্রবাহে!
সেখানে শরৎ নেই,
অর্থহীন হৃদয়ের সমস্ত সৌরভ।
শুধু আছে ভয় আর হিংস্র জয়োল্লাস,
শুধু মৃত্যু, শুধু প্রাণ-ধারণের শ্বাস,
শুধু জৈব, অন্ধ আত্ম-বিস্তার-তাড়না!
তারই মাঝে নিহত চেতনা
সর্বদায়মুক্ত।
সীমাহীন সময়ের এ ক্ষণিক মরীচিকা-মায়া,
মানুষের সভ্যতার এ দুঃসহ ব্যর্থ প্রহসন,
কেন আর?

তিনটি গুলি

তিনটি গুলির পর
স্তব্ধ এক কণ্ঠরুদ্ধ রাত
ভুলে গেলো চন্দ্রসূর্য
ভুলে গেলো কোথায় প্রভাত।
তুমি কত কিছু দিলে,
তপোদীপ্ত জীবনের সমস্ত বিভূতি,
সূর্যের মতন দিলে সব পরমায়ু
বিকিরিত প্রেমে করুণায়।
আমরা দিলাম শেষে তুলি
তিনটি কঠিন ক্রূর গুলি।
প্রথম গুলির নাম
অন্ধ মূঢ় ভয়।
দ্বিতীয়টি আমাদের
নিরালোক মনের সংশয়।
বিবর-বিলাসী-হিংসা
তৃতীয় গুলির পরিচয়।
তিনটি গুলির শব্দ!
অন্তহীন তার প্রতিধ্বনি
কেঁপে কেঁপে দিগন্ত ছড়ায়,
মানুষের ইতিহাস পার হয়ে যায়।
দূর ভবিষ্যৎ পানে চেয়ে চেয়ে দেখি—
পিস্তলের শব্দ আর নয়।
অগণন মানুষের বুকে বেজে বেজে
যুগ থেকে যুগান্তরে
প্রতিহত সেই শব্দ নিজেরে ভোলে যে;
হয়ে ওঠে পরিশুদ্ধ
মৃত্যুজিৎ বাণী বরাভয়।
মারণ-অস্ত্রের নাদ পরম লজ্জায়
শান্তির অমৃত-মন্ত্রে পায় শেষে লয়।

সাগর থেকে ফেরা

জোনাকি-মন

এ এক জোনাকি-মন
জ্বলে আর নেভে,
অন্ধকার পার হ'বে ভেবে,
ইতি উতি ধায়;
আলোর ছুঁচের মত
বিঁধে বিঁধে মহা যবনিকা
অনন্তের এক প্রান্তে
ঝিকমিক চেতনার পাড় বুনে যায়।
বিদ্যুতের ব্রত নিয়ে
এতটুকু সীমার আকাশে
ক্ষণে ক্ষণে এও চমকায়
এ জোনাকি-মন জানি
কোনো দিন পাবে না উত্তর।
চারি দিকে অন্ধ রাত্রি তামসী, দুস্তর,
মৌন নিরন্তর।
তারই মাঝে জিজ্ঞাসার স্ফুলিঙ্গের মত
এ জোনাকি-মন যেন
অকারণে ফোটে আর ঝরে,
মিছে ভাবে, সব থাকা তার-ই
বৃন্ত ধ'রে।
তবু,
আঁধারের গূঢ় ধ্বনি
শুধু এ সৃষ্টির
ছপ্‌ ছপ্‌ বেয়ে চলা দমকে দমকে।
তারই ছন্দে জ্বলে, নেভে, চমকে চমকে
দপ্‌ দপ্‌ কি জোনাকি-মন ?
জানা না-জানার চেয়ে চায় কোনো
অন্য উত্তরণ!

তোমাকে চিঠি

শুনেছি, পেয়েছ নাকি নিভৃতির দুর্গ সুদুর্গম,

শান্ত এক নির্জনতা,
—ফিস্‌ ফিস্‌ বন-ঝাউ-কাঁপা
পড়-পড় পাহাড়ের কোল-আঁকড়ানো
আঁকাবাঁকা চড়াই-এর পথে
হঠাৎ শূন্যতা মেলে-ধরা।
দিন সেথা দিগন্ত-উদাসী
রাত সব নক্ষত্র-বিলাস।
তাকে যদি,
যেতে পারি পার হয়ে দুর্লঙ্ঘ পরিখা।
শেষ-চূড়া-সোপানে আসীন
নিতে পারি একবার
তোমার তৃপ্তির স্বাদ।
ভয় হয় শুধু
তোমার আমার প্রিয় তারা
যদি ভিন্ন হয়,
দুজনায় অন্য নামে ডাকে!
তুমি আমি দুজনেই
চোরাবালি-মগ্ন স্বপ্ন জেনেছি অনেক।
বানচাল সঙ্কল্পের
একই ঘাটে হ'ল ভরাডুবি।
তবু ছুটি নিতে পারি কই?
ফিরে ফিরে খেয়া বাই হাটে।
এত ভিড় কিলবিল, ক্ষুধা-ভয়-অন্ধতা-তাড়িত।
এত গোল, দিশাহারা ধূলিধূম্র আকাশ বধির!
জর্জর হৃদয় তবু কী বিশ্বাসে সব কিছু সয়?
হিজিবিজি এ-প্রলাপ—এরও হবে প্রাঞ্জল অন্বয়।

সাগর থেকে ফেরা

নীল! নীল!
সবুজের ছোঁয়া কি না, তা বুঝি না,
ফিকে গাঢ় হরেক রকম
কম-বেশী নীল!
তার মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল
ক'টা গাঙ্‌চিল।
ভাবি, বলি, সাগরের ইচ্ছে,
সাদা ফেনা থেকে যেন
শাঁখ-মাজা ডানা মেলে

আকাশের তল্লাশ নিচ্ছে।

মিথ্যেই
মিল-খোঁজা মন চায় উপমা।
নেই, নেই!
হৃদয় দু'চোখ হয়ে, শুধু গেয়ে ওঠে,
সেই! সেই!
মাটি, গাছ, তীর সব একেবারে ফেলে দিয়ে আসা,
সুবিশাল ডানা মুড়ে
নোনা ঢেউএ আলগোছে ভাসা,
কূল-ছাড়া জল আর
মেঘ, তারা, হাওয়া নিয়ে থাকা,
সময়ের নীলে শুধু
উদ্দাম অবিরাম আলপনা আঁকা,
কি যেন কি যেন ঠিক
মন দিয়ে জানতে না জানতে,
স্টীমার পৌঁছে যায়
আজ-কাল-পরশুর প্রান্তে।

দোকান

দাও না দোকান। দোষ কি তাতে!
মনোহারী দোকান।
সাজাও পুতুল, কাঁচের চুড়ি, জরির ফিতে,
রং-বেরং-এর ছবি।
হাতা খুন্তি হাঁড়ি কড়াই, তাই বা কেন নয়।
সুলভ সওদা স্বল্প সাধের।
একটু চটক, একটু পালিশ,
প্রাণের পণ্য একটু রঙীন করে'
দোকানদারী বুলি দুটো দিও না হয় জুড়ে;
ঝিরিঝিরি জীবন যদি তাতে-ই ঝলোমলো।
বেচাকেনা ইমানদারি, দেওয়া-নেওয়ার চলা,
এইতো সব-ই, পেশা, নেশা, এইতো পরম।
দেওয়া খুশির, খাঁটি, কোথাও নেইকো ফাঁকি;
নেওয়ার বেলা উচিত দাম-ই চেয়ো।
হিসেব তুলো পাকা খাতায়,
জমাখরচ, আর যা পেলে ফাউ,
চোখের, চুড়ির সমান ঝিলিক

সাগর থেকে ফেরা

লাজুক-বৌ-এর মুখে,
খোকনমণির চোখ-জ্বলজ্বল পুতুল-পাওয়া সুখ,
গিন্নীবান্নী, ভারিক্কি চাল, সাবধানী শখ—আহা!
হৃদয় ছিঁড়ে প্রাণের সলতে ওরাই পাকায়, আর
বুকের আড়াল আগলে ফেরে আশার প্রদীপ
ঝড়-বাদলে—
দরদস্তর, নাড়াচাড়া, যাওয়ার ভিড়েও থমকে থেমে
একটু দেখার গরজ,
ভালোমন্দ দুটো কথা, জলে ছায়া-র চলতি
চেনাশোনা।

মেলার ধারেই থাকাতো সই।
খাল পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে
পাঁচটা গাঁয়ের মানুষ আসবে যাবে
উড়বে ধুলো, থামবে না গোল সকাল সন্ধ্যে দুপুর
কত না মুখ কত না পা পেরিয়ে যাবে চলে।
এলোমেলো খেই-না-পাওয়া কত কথার ঢেউ,
ছুঁয়ে যাবে, রেখে যাবে হয়তো কি গুনগুন,
বন্ধ ঝাঁপের রাত প্রহরে শুনবে যা ফের
দোকান-দোসর অশথ-কাঁপা হাওয়ায়।

চণ্ডের ঘরে একা একা
শুধু নিজের নাইকুণ্ডুল খুঁজে,
হয়তো আখের পাতা হোতো। করবে কখন,
মেলার বেসাত মজায় যদি!
বসেই থাকো কিংবা চলো, বেচো কিংবা কেনো,
প্রাণের মেলায় তুমিও পাঁওদল,
ভালোবাসায় ভিড়ের মানুষ।
তোমার আখের চলার পায়ে-ই মাটি।
লাভ লোকসান খতিয়ে তবু, দেখো যদি
হিসেবে গরমিল,
জমার চেয়ে খরচ বেশী ফাজিল,
যত গুমোট মেঘ-সরানো
হৃদয় জুড়ে রোদ-ছড়ানো
সেইতো তোমার অগাধ অপার নীল।

শিখর ছুঁয়ে নামা

এখনো অরণ্য শুধু,

প্রচণ্ড প্রপাত যত সদাগর্জমান।
কুয়াশার ওড়নায়
এই ঢেকে, এই খুলে মুখ,
অসংখ্য অবাক্ ফুল
মৃদু হেসে ছড়ায় কুহক।
আরেক চড়াই ভেঙে
সুদুর্গম প্রত্যয়ের শৈল-শিরা খুঁজে
হওয়া যায় সহজ গৈরিক।
নির্মল হিমেল হাওয়া
বুক ভ'রে নিয়ে,
দুরারোহ রিক্ততায়
চেয়ে চেয়ে দেখা যায়
কত নিচে দূর সমতল।
সেখানে হবে না থামা তবু,
আগে টানে অদম্য আকৃতি;—
একে একে তরু গুল্ম সব পিছে ফেলে,
সেখানে প্রাণান্ত-শিলা
নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতায় আপনারে ঢেকে
জপ করে তুহিন নীলিমা,
সে শিখর ছুঁয়ে যারা ফেরে
তাদের হৃদয়
চূড়ান্ত মৃত্যুর স্বাদ রক্তে বয়ে এনে,
জীবনের প্রতি পদে
খোঁজে কোন্ নূতন অন্বয়?

কবি

আমাদের কথা কেউ সব জেনে নিয়ে,
তবু প্রমাণের খোঁজে, খুঁড়ে খুঁড়ে চলে যায়
কথার ওপারে। তারপর ফিরে চেয়ে দেখে এই
জন-গণ-মন, অলীক শব্দের জালে
কি ভাবে জড়ানো।
মাপা দিন, বাঁচার লাইন
পরিপাটি পাতা ব'লে, গড়গড় অনায়াসে
চলে যায় বটে স্বচ্ছন্দ মসৃণ,
বরাদ্দ মাফিক ক্ষুধা

মিটিয়ে উচ্ছিষ্ট অনুভবে;
কিন্তু আলগা মুহূর্তও আচমকা কখনো কখনো
পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে দেখায় ধুধু—ধাঁধা
অতল বিহ্বল।
চিহ্নিত সে জন তাই কথার পিছনে উপনীত
হয়েও, ফিরেই আসে আমাদের প্রাঙ্গণে প্রান্তরে
সেধে নিয়ে দায়,
শব্দের খোলস খুলে, অকপট খুঁজে খুঁজে ফেরে
অবিকল অনির্বচনীয়!
আমাদের নাম, ধাম, সব পরিচয়,
তার চোখে পড়ি যদি
দুঃসহ সে বিদ্যুৎ বিস্ময়।

আছে

খুঁজে দেখো, আছে, আছে,
নদী, তেপান্তর কিংবা পাহাড়ের কোলে কুণ্ডলিত,
তোমার সে শখের শহর।
ধুলো ওড়ে, মাছি ঘোরে ভনভন বোলতা সোনালী
সুরে হেঁকে ফেরি—করা সওদার গায়—
চিক-ফেলা বারান্দায় তোতা হীরেমন দাঁড়ে;
অকস্মাৎ মুখ তুলে
চেয়ে দেখা সরু নীল আকাশের ফালি
ঝলমল গেরুবাজ পায়রার ঝাঁকে চমকানো!
সেখানে ছোটে না কেউ তবু,
হাঁফায় না, হারায় না জিলিপি—গলিতে।
ছাদ যার নেই সেও
চকে এসে বাঁধানো চাতালে
মান্ধাতার অশথের পাতাঘন সবুজ মেঘের
হাওয়া খায়, আর
শোনে কি না শোনে দূর ফিকে নহবৎ—
মিহি জরি—কাজ যেন নগরের গুঞ্জনে জড়ানো।
সে শহরে ভিড় শুধু নয় ঘেঁষাঘেঁষি;
সেখানে জনতা যেন আপনারি বিচিত্র বিস্তৃতি।
খুঁজে দেখো, আছে, আছে,
আধ—আলো এঁদোগন্ধ পুরানো পুঁথিতে—ঠাসা

কোনো এক বেচারী দোকানে,
কিংবা পথে-পড়া কোনো রোয়াকে ছড়ানো
কাঙালী বই-এর ভিড়ে
বিস্মৃত সে লেখা,
—ধু-ধু সময়ের শূন্যে কার কবেকার
জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ের চিহ্ন এক ছিটে,—
উড়ো এক ভীরু ক্ষীণ সম্ভাষের কাপাসের আঁশ!
নিরালা একাকী এক হৃদয়ের
খোঁজা যোঝা বোঝাপড়া সব
জীবনের পৃথিবীর সাথে,
কতদূর ভেসে ভেসে চলে দুরাশায়,
দিগন্তের দ্বিধা নিয়ে
স্নেহ-ভিক্ষু সমভিপ্রায়ীর।
খুঁজে দেখো, আছে, আছে,
নির্জনে কি কোনো জনতায়,
সেই দুটি প্রতীক্ষার চোখ,
সে আকাশ সূর্যাতীত
তারই ছায়া-পড়া।
পৃথিবী এখনো রূঢ়,
ইতিহাস সংকীর্ণ সর্পিল।
তবু নক্ষত্রেরা আর সমুদ্র সমর
দিতে চায় যে প্রত্যয়
সেই চোখে জানি মিথ্যা নয়।

শহর

আমার শহর নয়কো তেমন বুড়ো।
অতীত কালের অস্থি মুদ্রা চৈত্য বিহার কিছু
পাবে না তার কোথাও মাটি খুঁড়ে।
হঠাৎ কখন নদীর ধারে ব্যাপারীদের নায়ে,
আমার শহর নেমেছিল কাদামাখা পায়ে
এই তো সেদিন, নারকেল আর খেজুর গাছের ঝোপে।
এই তো সেদিন, তবু যেন অনেক অনেক দূর,
অনেক শিশির ঝরে গেছে
তাতিয়ে গেছে কত না রোদ্দুর।
অনেক ধুলোয় মলিন পা তার

অনেক ধোঁয়ায় ঝাপসা দুটি চোখ।
আমার শহর ভুলে গেছে
তার জীবনের আদি পরম শ্লোক।
তবু হঠাৎ আসে যখন পাতা-ঝরার দিন,
দমকা হাওয়া থেকে থেকে
ছাদ-ছাড়ানো গাছের মাথায় লাগে,
আমার শহর খানিক বুঝি
ঝিমিয়ে-পড়া তন্দ্রা থেকে জাগে।
চিমনি-তোলা ঊর্ধ্বমুখে আকাশ পানে চেয়ে
কি ভাবে সেই জানে!
ভেবে ভেবে পায় কি নিজের মানে?
পোল বেঁধেছে কল ফেঁদেছে
বসিয়ে বাজার হাট,
রাস্তা পেতে মেলেছে ঢের রং-বেরং-এর ঠাট।
তবু যেন জংলা আদিম জলা
জুড়ে আছে আজো বুকের তলা।

জীবনানন্দ

সেই এক নাগরিক
এই শহরের পথে
একা একা ঘুরেছে অনেক।
ট্রাম, বাস, বিজ্ঞাপন,
মোড়ে মোড়ে ভিড় আর আলো,
আর গাঢ় স্তব্ধ মধ্যরাত
মনুমেণ্ট গীর্জার মাথায়—
সব কিছু দেখেছে সে
কখনো প্রবাসী কিংবা প্রণয়ীর মত।
তারপর
নিরিবিলি আপনার নীড়ের গভীরে,
মিশিয়েছে তার সাথে
ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে
হলুদ ফসলে-ভরা মাঠ,
চিল পুরুষের ডাক
সূচিবিদ্ধ শূন্যতার মত,
আর বুঝি প্যাঁচাদের ডানায় ধূসর
রাত্রির কুয়াশা, ঠিক ভুলে-যাওয়া শোকের মতন।

নেই সেই নাগরিক আর।
নগর–আত্মার কাছে নিবেদিত হ'য়ে
রেখে গেছে তবু এক সবুজ প্রত্যয়,
আভা যার কিছু কিছু
ছড়াবেই বহুদূর সমুদ্র–সময়।
সে বুঝি গিয়েছে জেনে,
সত্য যা তা আপনাতে আপনি–ই ধ্রুব নয় সব!
তারে পূর্ণ করে' চলে
আমাদেরই রক্তে–বওয়া
গূঢ় এক দীপ্ত অনুভব!

হারিয়ে

কোনো দিন গেছ কি হারিয়ে,
হাট–বাট নগর ছাড়িয়ে
দিশাহারা মাঠে,
একটি শিমুলগাছ নিয়ে
আকাশের বেলা যেথা কাটে?
সেখানে অনেক পথ খুঁজে
পৃথিবী শুয়েছে চোখ বুজে
এলিয়ে হৃদয়।
শিয়রে শিমুল শুধু একা
চুপ করে' রয়।
পথ খুঁজে যারা হয়রান
কোনো দিন সেই ময়দান
তারা পেয়ে যায়।
হঠাৎ অবাক্ হয়ে
আশে পাশে ওপরে তাকায়।
কোনো পথ যেখানেতে নেই
সেখানেই মেলে এক খেই
আরেক আশার।
সব পথ হারাবার পর
বুঝি খোঁজ মেলে আপনার।
একদিন যেও না হারিয়ে
চেনা মুখ শহর ছাড়িয়ে
অজানা প্রান্তরে,

একটি শিমুল আর আকাশ যেখানে
মুখোমুখি চায় পরস্পরে।

আবিষ্কার

মৃত এক মহাদেশ
বারবার করি আবিষ্কার!
তার নদী, প্রান্তর, পাহাড়
কতবার জীবনের ছক পেতে সাজিয়েছে খেলা,
মাৎ হয়ে গিয়ে শেষে
কোনো এক অনির্ণেয় চালে,
মহাবিলুপ্তির দণ্ড
মাথা পেতে নিয়েছে অকালে।
নিঃসঙ্গ নাবিক ফের
বাঁধি পোত শ্মশান-বন্দরে,
তরীর কঙ্কাল যত, যেখানে বিছানো স্তরে স্তরে
—দুঃসাহসী দুরাশাবশেষ।
যতদূরে চাই
প্রাণহীন মৌন রুক্ষ মাটি,
তারি 'পরে নিদ্রিত আকাশ
মাঝে মাঝে ফেলে শুধু ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস।
মৃত সেই মহাদেশ
আরবার করি বিচরণ,
একটি 'পুদ্‌গল' বীজ করিতে বপন।
সুধা দাও, স্নেহ দাও, হে মৃত্তিকা নিষ্প্রাণ কঠিন!
তোমার জঠরে রাখি আর-এক প্রতিজ্ঞা নবীন,
ধ্বংসের জঞ্জাল ঠেলে,
সাজাবে যা শঙ্কাহীন জীবনের মেলা।
শুরু হবে আর-এক লুপ্তিপণ খেলা।

জীবনের গান

শুধুই বন্যা
নয়কো, হয়তো
মানুষ অন্য

কিছু।
সামনে তাকালে
শুভ্র সকাল;
রক্তের পদচিহ্ন,
আদি সমুদ্র হ'তে আছে আঁকা
যদিও তাকালে পিছু!
রক্ত এখনও দিতে হবে ঢের
দিতে হবে আরো প্রাণ,
মৃত্যুর তীরে জীবনের ধ্বজা ওঠাতে!
সে-রক্ত কোনো শোধ চায় না তো,
শুধু দাবিহীন দান
আগামী দিনের মুখে রক্তিমা ফোটাতে।

ধ্বনি

এই ধ্বনি একদিন
সত্যদ্রষ্টা ঋষির ধেয়ানে,
মৌন ক্ষীণ স্বপ্ন আর ইতিহাস-কাঁপানো কল্লোলে
মিশে বুঝি দিয়েছিল ধরা;
তারপর যুগান্তের দুর্যোগ-সন্ধ্যায়
মহাসন্ধিক্ষণে হোলো
সহসা আকুল মুক্তি-স্বরা।
নিপীড়িত, রুদ্ধবাক্,
হিংস্রমুষ্টি-নিষ্পেষিত কোটি কণ্ঠ-নালিতে নালিতে
রুদ্রতাপ নিষেধের নির্মম বালিতে
কভু তপ্ত, কভু লুপ্ত
ক্ষীণ-ধারা সেই সুর তবু আর থেমেও থামে না।
সেই সুরে উদ্দীপিত
সংশপ্তক নারায়ণী সেনা
হাসিমুখে সব মৃত্যু হয়ে যায় পার।
অন্ধকার বন্দীপুর ভেঙে খোলে জ্যোতির দুয়ার।
আরো কতদূর যাবে,
এই ধ্বনি, কবে পাবে পূর্ণতা পরম
জানি না'ক। আশাদীপ্ত কণ্ঠে শুধু আজো নিনাদিত
বন্দেমাতরম্!

বরং

কোথায় যাব ভেবেছিলাম
হয়নি যাওয়া।
বন্ধ ঘরের সার্সি কাঁপায়
দমকা হাওয়া।
কাঁপাক, তবু ঘরে-ই আছি।
ভাবনাগুলোর পোকা বাছি,
জ্বালায় যখন তাড়াই মাছি,
ঠিক জেনেছি, চক্ষু দুটি
ঢাকলে পরেই ফুরোয় চাওয়া।
শিখেছি তো যে দিকে রোদ
সে দিক ঘেঁষেই বাড়তে,
আঁকশি-নাগাল স্বপ্নগুলো পাড়তে,
কিংবা কষায় অম্ল ব'লে-ই ছাড়তে।
যা করে হোক, অন্ন তো দিই প্রাণের পিপাসার্তে।
হবার-যা-নয় তার বিহনে আর কি কাঁদি।
হোতো-যদি-আহা-র বরং গল্প ফাঁদি।

প্রবাদ

শুনেছি প্রবাদ কোনো,—
সেই এক বন্ধ্যা গিরি-দ্বীপে
ঊর্ধ্বফণা হিংস্র ঢেউ যাহার প্রহরী,
দিনান্তের এক লগ্নে,
একটি আশ্চর্য পাখি
নেমে এসে বসে একবার।
চোখে তার নবারুণ-রাগ,
ডানা তার বিস্ময়-নীলিমা,
স্বর তার জীবনের সব সাধ মেটাবার বর।
আমার নাবিক-মন
যে প্রবাদ করে না বিশ্বাস।
যাত্রী ও পণ্যের বোঝা
বয়ে' বয়ে' বন্দরে বন্দরে,
বেচা-কেনা লেন-দেন সব সেরে, শুয়ে পাটাতনে,

তারাদের ইশারায় তবু মনে হয়
মানচিত্রে পড়েনি যা ধরা,
কম্পাসের কাঁটাও চেনে না,
এমন দিগন্ত বুঝি কোনোখানে আছে অপেক্ষায়।
সীমাহীন সাগর-বিস্তার
লুব্ধ চোখে তারপর খুঁজে খুঁজে ফিরে,
কত না অজানা দ্বীপে
নিষেধ ও নিমন্ত্রণ সব জেনে এসে,
হতাশ হৃদয়
যখন নির্জন তীরে
শুধু তার ক্ষতগুলি গোনে,
সহসা তখন
দেখি এক পাখি এসে মাস্তুল-চূড়ায়
ডানা মুড়ে বসে।
জানি না সে কোন্ পাখি।
দিশাহারা কম্পাসের কাঁটা শুধু
কেঁপে কেঁপে হয়ে যায় স্থির।
জাগে এক সংশয় গভীর।
সেই সে আশ্চর্য দ্বীপ
সে কি এই আমারই তরণী!

সত্য

পাতা চিরদিন নতুনই গজাবে
ফুল ধরবে ও ঝরবে
ফলটা কি হবে সেইটেই বলা শক্ত।
ছোঁয়াচে হুজুক এমনি মজাবে
পারা চড়বে ও পড়বে
জ্বর ছেড়ে গেলে মনটা শুধু বিরক্ত।

মত্ততা ছেড়ে মনের গভীরে এস না,
নেশা নয়, থাক পরম পাওয়ার এষণা।

চারা পোঁতাটাই নয়কো আসল সত্য,
আছে কিনা দেখো হৃদয়ের আনুগত্য।

শরৎ

এ শরৎ একদিন এসেছিল প্রসন্ন প্রান্তরে,
প্রাণের নির্মল হাসি কাশ-বনে মেলে,
গভীর হৃদয়তল স্নিগ্ধ করে' কুমুদ কহ্লারে,
অপর্যাপ্ত সুধা-শস্য-সম্ভাবনা-আশ্বস্ত জীবনে।

তারপর কত খুঁজি,
শ্রান্ত সকাতর চোখে আকাশে তাকাই।
সেদিনের শুভ্র মেঘ—একটি কণাও তার নাই।
সে প্রান্তর ঘিরে আজ ইট-কাঠ পাথরের বেড়া,
মেঘ নয়, চিমনির ধোঁয়া
আকাশের ম্লান মুখ ঢাকে;
হৃদয়ের শুষ্ক সরোবর,
ধুলো বালি জঞ্জালে ভরাট।

তবুও মানি না হার।
ক্ষীণ এক আশা নিয়ে
জনাকীর্ণ এ শহরে গলিঘুঁজি খুঁজি।
প্রান্তরে সে শরৎ কোনো প্রাণে জেগে আছে বুঝি।

তাহলে এ সংকীর্ণ শহর
আবার পেতেও পারে হৃদয়ের শুভ্র পরিসর।

জানা ও বোঝা

সৃষ্টি তো কতভাবে মাপলাম!
হিসাবে তো আজো তারে পাই নাই।
হৃদয়ের রঙে যেই ছাপলাম
মনে হোলো বোঝা গেল সবটাই।

এক জানা হাতড়ায় বাইরে,
আর-এক বোঝা চলে ভিতরে।
দুই ডালে কোনো মিল নাইরে
মিল শুধু সুগভীর শিকড়ে।

সূর্য-বীজ

শতাব্দী যায় গড়িয়ে
—সময়-সমুদ্রের সামান্য একটা ঢেউ।
হে কালের অধীশ্বর
অন্য মনে তুমি কি থাকো ভুলে?

পৃথিবী আবর্তিত অন্ধ নিয়তির চক্রে।
মানুষের ইতিহাস হিংসার বিষে ফেনিল।

'ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা, মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা
একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা, শ্মশানের প্রান্তচর',
আবর্জনা-কুণ্ড ঘিরে, বীভৎস চীৎকারে,
নির্লজ্জ হিংসায় তারা, হানাহানি করে,—
'মানুষ জন্তুর হুহুঙ্কার' দিকে দিকে বেজে ওঠে।
তুমি কি তখনও নির্লিপ্ত নির্বিকার?

মন বলে না,— না।

যুগে যুগে তুমি পাঠাও তোমার দূত
—সূর্যাংশের অনির্বাণ প্রাণ-শিখা।

দেশে দেশে হৃদয়ে হৃদয়ে সমস্ত দ্বীপ যখন নির্বাপিত,
মৃত্যুর তমিস্রায় সমস্ত পৃথিবী যখন নিমগ্ন,
অকম্পিত সে শিখা
তখনও জ্বলে পরম দুঃসাহসে,
অন্ধ রাত্রির সমস্ত বিভীষিকাময় ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে
দাঁড়ায় একা।
বলে,—'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।'

এই শিখা বার বার আমাদেরই মাঝে জন্ম নেয়,
ধন্য করে
এই ধরণীর ধূলি-মলিন শতাব্দী।
যে আধারে সে শিখা মূর্ত হয়ে ওঠে,
সে আধার যায় ভেঙে;
তবু সে শিখা তো হারিয়ে যাবার নয়।

আকাশের তারায় আর একটু অপরূপ দীপ্তি
সে শিখা রেখে যায়,
পৃথিবীর শ্যামলতায় বুলিয়ে দিয়ে যায়

আর-এক অনির্বচনীয় স্নিগ্ধতা,
আকাশের নীলিমা তার কাছে পায়
রহস্য-নিবিড় আর-এক মহিমা।

দেশে দেশে মানব-সত্যের যে সংশপ্তক বাহিনী
আজও সাজছে নিঃশব্দে চরম সংগ্রামের জন্যে,
যুগে যুগে যারা সাজবে,
তাদের মশালে সেই শিখারই আলো,
তাদের পতাকায় তারই অম্লান দীপ্তি।
কত শতাব্দীর ঢেউ
সময়ের সমুদ্রে হবে লীন;
মানুষের ইতিহাস কত আত্মঘাতী মূঢ়তায়
পথ হারাবে;
তবু হে কালের অধীশ্বর
হতাশ আমরা হব না।

এই অকিঞ্চন পৃথিবীর মৃত্তিকায়
যে সূর্য-বীজ তুমি রোপণ করো
তা ব্যর্থ হবার নয়।
মোহাচ্ছন্ন বর্তমানের সমস্ত কুজ্ঝটিকা অতিক্রম করে'
সুদূর যুগান্তে তার সঙ্কেত প্রসারিত।
মানবতার গভীর উৎস-মূলে
অক্ষয় তার প্রেরণা।

হে মহাকাল, তোমার অনন্ত পারাবারে
আমরা ক্ষণিকের বুদ্‌বুদ্‌,
তবু সেই সূর্য-শিখা যে আমাদের মাঝে
প্রতিফলিত হয়,
এই আমাদের গৌরব।

দুপুর

রাস্তা পিচের, বাস-টা নতুন
ঝাঁকানি নেই।
ভিড় কি ছিল?
ফোস্কা-পড়া তাত,
হল্‌কা-ওঠা আঙরা-রাঙা ডাঙা
চোখ ঝলসায়, মন ঝিম্‌-ঝিম্‌

কোথায় যে গেছলাম!

নেইকো মনে। অনেক যাওয়া-আসায়
জ্বলন্ত এক ছায়া-শোষা তেষ্টা-ফাটা দুপুর।
শেষ নেইকো উর্ধ্বশ্বাসের পারেও।

ভাঙা ঘরটা, চাল নেইকো, দরজা হাঁ হাঁ ফোকর,
শুকনো নালা, ন্যাড়া সজনে, ধ্বসা ইটের পাঁজা,
খাঁ খাঁ রোদে ঝিমোয় দূরে গ্রাম।
দিক্-ভোলানো দুপুর বেলায়
কোথায় যে গেছলাম!

ঠিকানা আজ না থাক মনে
স্মৃতির তেপান্তরে,
হারিয়ে-যাওয়া সেই দুপুরের
আগুন ঝরে।

শ্যাওলা ঘাটের কত দীঘির
শীতল কালো জল,
কত নদীর হঠাৎ অবাক্ নীল,
ঘন বনের সবুজ আঁধার,
লেপে লেপেও তবু
জ্বালার আরাম কই!

দারুণ দিনের সেই যাওয়া যে কাকে খুঁজতে যাওয়া
নেইকো মনে, জ্বলে শুধু আজও খোঁজ না-পাওয়া।

সাধু

সাদা মেঘগুলো ভেসে চলে যায়
কোনো তাড়া কোনো কাজ নেই।
জল নেই আর জ্বালাও নেইকো
বুকে তার আর বাজ নেই।
সাদা মেঘগুলো ভেসে চলে যায়
কোনো রং কোনো সাজ নেই।

পাহাড়ের গায়ে মাঠের চূড়োটা ছাড়িয়ে,
মেঘগুলো যায় নীল দিগন্তে হারিয়ে।
মঠ থেকে বাজে ঘণ্টা

মনটা কেমন করে,
মঠের মাঝের বুড়ো সাধুটিরে
থেকে থেকে মনে পড়ে

মেঘের মতন সাদা চুল তার,
গোঁফ দাড়ি ধবধবে,
মুখে লেগে আছে প্রাণের হাসির
ফেনাই বুঝি বা হবে।

পাথুরে সিঁড়ির ধারে বসে থাকে
মনে হয় কোনো কাজ নেই।
প্রীতির জারকে জরে' জরে' যেন
মনে আর কোন ঝাঁজ নেই।
ঢিলে কোঁচকান মুখখানি তার,
মনে শুধু কোন ভাঁজ নেই।

কেউ যদি তারে শুধায় কখনো,
এ হাসি কোথায় পেলে?
সাধু হেসে বলে,—পেয়েছি, হৃদয়
আঁখি জলে ধুয়ে ফেলে।

যে-মেঘ ঝড়ের তাড়া খেয়ে ফিরে'
কালো হ'য়ে নেমে আসে,
নিজেরে উজাড় করে ঢেলে সে-ই
সাদা হাসি হয়ে ভাসে।

জং

হাওয়া বয় সনসন
তারারা কাঁপে।
হৃদয়ে কি জং ধরে
পুরানো খাপে!
কার চুল এলোমেলো,
কিবা তাতে এলো গেলো!
কার চোখে কত জল
কে বা তা মাপে?

দিনগুলি কুড়োতে,

কত কি তো হারালো।
ব্যথা কই সে ফলা-র
বিঁধেছে যা ধারালো।

হাওয়া বয় সনসন
তারারা কাঁপে।
জেনে কিবা প্রয়োজন
অনেক দূরের বন
রাঙা হ'ল কুসুমে, না
বহ্নি তাপে?
হৃদয় মরচে ধরা
পুরানো খাপে।

ক্লান্ত

হে পৃথিবী, কোথায় যাব? শ্রান্ত।
আকাশে চাই, সেখানে উদ্‌ভ্রান্ত।
আমার মন, গহন বন, ফুরায় না।

অতল থেকে নাম-না-জানা তৃষ্ণা,
মিটাতে যা পান করেছি, বিষ না।
তবুও শাপ, বুকের তাপ, জুড়ায় না।

হয়তো হিয়া নিজের বাণে বিদ্ধ
বৃথাই খোঁজে শিকারী, সন্দিগ্ধ।
মানে না ভুল, ওষধি-মূল, কুড়ায় না।

মেঘের রাত, মরুর দিন, তপ্ত,
আঁধার আলো জেনেছি ভাবি সব তো।
ঝিমানো প্রাণ, কারো নিশান, উড়ায় না।

রাত-জাগা ছড়া

জল পড়ে, পাতা নড়ে,
এই নিয়ে পদ্য,
লিখে ফেলে ভাবলাম
হ'ল অনবদ্য।

ছাদ ছিলো ফুটো তা তো
পারিনিকো জানতে,
জেগে উঠে ব'সে আছি
বিছানার প্রান্তে।

চোখে আর ঘুম নেই
শুধু শুনি ভনভন
মশা ওড়ে আর চলে
চিন্তার পল্টন।

গাছে গাছে পাতা নড়ে
চালে শুধু পাতা নেই,
কাঁকর-মেশানো চাল
মেলে শুধু 'রেশনে'-ই!

ডিমডিম ঢেঁড়া শুনি
আসে দুর্ভিক্ষ,
এসে তবে বাকি ক'টা
ক'রে দূর দিক গো!

জল প'ড়ে দুনিয়ার
জ্বালা-করা চক্ষে।
পাতা নড়ে প্রলয়ের
ঝড়ে কি অলক্ষ্যে!

জর্জ বার্ণার্ড শ

মূঢ় ইতিহাস স্বখাত গোলকধাঁধায়
ঘুরিয়া মরে;
সূর্যের ক্ষোভ তাই যুগান্তে
বিদ্যুৎ-কশা হানে।
বিদ্যুৎ, না, সে বহ্নি-বাণীর
খরধার তরবার—
হাসি-ঝলমল, তবু নির্মম,
মার্জনা নাহি জানে!

অন্ধ মাটির নাগপাশ যত
জ্বালাও বারংবার,

সূর্যাংশের হে শুভ্র শিখা
তোমারে নমস্কার!

পালক

মানে খোঁজা নিয়ে যোঝা
একদিন থেমে যায়
তেপান্তরে ঝড়ের মতন।
শুধু থাকে চেয়ে থাকা, শুধু কান পেতে রাখা
শুধু নীল ছড়ানো গগন।

তখনো নদীরা থাকে,
থাকে স্রোত, থাকে ঢেউ, তীর;
শুধু হৃদয়ের আর থাকে নাকো কোনো ভার
কোন দায় কোনো বেসাতির।

তখনই পাখিরা আসে প্রাণের প্রান্তরে;
নিরুত্তাপ প্রসন্ন আলোয়
স্নান করে, খেলা করে, গান করে, আর
রেখে যায় দু-একটি খসে-পড়া পালকের কুচি
হাওয়ায় ফেনার মত।

হাটে যারা দাম খোঁজে নাকো,
তারা শুধু সে পালকে
নিজেদের স্নাতশুভ্র অভিমান সাজিয়ে খেলায়।

দ্বীপ

সাগরের পাখিদের একান্ত আপন
এখনো নির্জন দ্বীপ আছে এক দূর দ্রাঘিমায়।
তট তার সুকঠিন রূঢ় রুক্ষ শিলার ভ্রূকুটি,
সীমা তার ঊর্ধ্বফণা সমুদ্রের তরঙ্গ-বলয়।
সেই ভাঙা গাছে ঠেকে ভাঙে
কোনো কোনো জাহাজের হাল।
দুঃসাহসী নাবিকেরা বিপথ-বিলাসী
বারেক সে দ্বীপে বুঝি হয় নির্বাসিত।
তারপর অবিরাম শুধু এক অস্থির কল্লোল।

চোখে শুধু নীল এক সীমাহীন বিস্ময়-বিস্তার।
জনাকীর্ণ নগরের পথে পথে যত
সংগ্রহ ও চতুর সঞ্চয়,
নানা মূল্যে কেনা যত
বহুবর্ণ বেশ আর ভূষা
বন্দরে বন্দরে,
ধীরে ধীরে এই দ্বীপে
রোদে জলে উদ্দাম হাওয়ায়
একে একে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে খ'সে খ'সে যায়।
ঘুরে ফিরে এদিক-ওদিক
পরিশ্রান্ত নিঃসঙ্গ নাবিক
দ্বীপের নির্ঝর কুণ্ডে একদিন দেখে সবিস্ময়
ছায়া ফেলে আছে তার-ই আপনার উলঙ্গ হৃদয়।
অকস্মাৎ সে ভীষণ নির্লজ্জ সাক্ষাৎ
শুধু বুঝি আনে অপঘাত।
দিক্‌চক্রবালে যবে দেখা দেয় উৎসুক মাস্তুল,
উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল
কেউ কেউ ভুলে গিয়ে সমস্ত সঙ্কেত
চেয়ে রয় শুধু হতাশায়।
তাই এত সাদা হাড় সে-দ্বীপের সৈকতে শুধায়।
আর যারা কোনো মতে
সেই দ্বীপ হ'তে ফিরে আসে,
স্বজন বন্ধুর মাঝে থেকে তবু তারা
দিন যেন কাটায় প্রবাসে।
বোঝে না তাদের ভাষা কেউ।

রোদের প্রার্থনা

রোদ দাও।
একঘেয়ে একরঙা ম্যাড়মেড়ে ছবি
আত্মার অরুচি।
রোদ দাও
এ অশুচি মুছি'
মুখ তার মনেও পড়ে না।
ভিজে দিন, ফ্যাকাশে প্রভাত,
তারা-মোছা গুমোটের রাত,
আর কত?
মরা চারা, পাতাও ধরে না।

বন্দী মন রুদ্ধ ঘরে
স্যাঁতসেঁতে স্মৃতি নাড়ে চাড়ে।
কোথায় বা যাবে সন্তর্পণে পা টিপে পা টিপে!
আদিগন্ত পঙ্কিল পিচ্ছিল।
মুখ তার কত মনে করি।
রোদ দাও
ফাটল ধরাও
আকাশের পাঁশ-জমা বুকে।
সকৌতুক সবিস্ময় নীল
ঝরুক
ধরুক
নদী, সমুদ্রে ও প্রাণে।
মরা চারা স্মৃতির প্রহরী।
দাহদীর্ণ হৃদয়ের
শুষ্কতালু চাতক-প্রার্থনা
আজ পরিতাপ।
অগ্নিক্ষরা আকাশের
সে প্রথম স্নিগ্ধ নীলাঞ্জন
সে নগর নতমুখ
চেনে শুধু অন্তিম কাদায়।
মুখ তার আবছায়া অশ্রুর কুয়াশা।

স্মৃতি

কোথাও প্রবাসী নই!
এ সমুদ্র, নারিকেল বন,
কবেকার ফেলে-আসা দুরাশার মত
আদিগন্ত পাল অগণন,
সব বুঝি আছে মনে,
শোণিত-স্মরণে।
স্বাদ নিতে আসি শুধু
ভান-করা নব পর্যটনে।
দম্ভের যা ইতিহাস,
বৃষ্টি আর ঢেউ তা তো ধুয়ে ধুয়ে যায়,
কীর্তিস্তূপ ধুলো হয়

শ্রদ্ধাহীন সূর্যের ঘৃণায়।
প্রাণ শুধু এক স্মৃতি
সংগোপনে পুঁজি ক'রে রাখে,
বারে বারে
জন্মে জন্মে
জীবনে জীবনে
অবাক্ নতুন চোখে চাখে।
তা হয়তো শুধু এই
পাহাড়ে মাটির খাঁজে খাঁজে,
স্নেহ সাধ স্বপ্ন দিয়ে
ছবি-ছবি ছোট ঘর ছাওয়া,
ক্ষুধা রোগ শোক নিয়ে আর
দূষিত খাঁড়ির ডিঙি বাওয়া।
তা হয়তো শুধু তাই নয়।
হয়তো তা একবার
একাকার মেঘে ও সাগরে
গর্জমান তরঙ্গে তুফানে
উল্লাসের মত এক রোমাঞ্চিত ভয়।
হয়তো তা কদাচিৎ
ঝলসিত বিদ্যুৎ-কৃপাণে
বিদীর্ণ তিমির-শূন্যে
উদ্ভাসিত ও সত্তার গূঢ় পরিচয়।

হ্রদ

এ এক পাহাড়-ঘেরা স্বচ্ছ-হ্রদ, সরল নিষ্পাপ,
মেঘ আর যাযাবর হাঁসেদের ছায়া শুধু জানে।
ধ্যান তার নভোনীল। চেয়ে চেয়ে সারা নিশিদিন
সূর্যের বৃত্তান্ত থেকে পায় তার আপনার মানে।
এই হ্রদ পর্যটক একদিন খুঁজে পায় যেই,
বন্দুকের শব্দে ওঠে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি;
শিকারের তাজা রক্তে শুচি শিলা শিহরে সহসা,
আগুনের লোল জিহ্বা খোঁজে গূঢ় সত্তার ধমনী।
এ হ্রদ তো নদী নয়, শেখেনি তো সাগর-সন্ধান,
শুদ্ধ হবে প্রাণবেগে নিত্যমুক্ত স্রোতের ধারায়!
এ শুধু ধারণাবদ্ধ আকাশের বিম্বিত চেতনা,

প্রথম কল্মষস্পর্শে আপনার আতন্নাই হারায়।
পৃথিবী সংকীর্ণ হবে, এও বুঝি অমোঘ নিয়তি!
সব নদী, নালা হবে, সব হ্রদ পানীয়-সঞ্চয়,
গহনতা অনাবৃত। অগ্রসর উদ্যোগী 'সফরি'
পৌঁছোবার আগে, যদি, হে অস্পর্শ্যা পেতাম হৃদয়!

দশানন

যেখানেই থাকো তুমি করো স্বর্ণময়
তপস্যা-অর্জিত বীর্যে, দুর্ধর্ষ দুর্জয়।
তবু কোন্ ভুল
তোমার কীর্তির মূল কাটে চিরদিন?
তুমি অদ্বিতীয়, তবু চিরপ্রীতিহীন!
সে কি শুধু লোভ, শুধু ভোগীর লালসা,
স্ফীতদম্ভ অক্ষমের?
এ সবের কিছু বুঝি নয়।
দানবীয় দুর্বলতা, দেবতার দুর্বোধ বিস্ময়!
সীতারে পার না ছুঁতে।
ছলবল সমস্ত কৌশল
নিজেই বিফল করো
শেষ তার সম্মত-ভিক্ষায়!
হৃদয়ের এ সম্মানে
রামায়ণ অন্য দীপ্তি পায়।
ছোট ভিরু হাত দিলে
জীবনের মাপ নিয়ে যারা
নীড় বেঁধে নিরাপদ সঞ্চয়ের কড়ি ক'টা গোনে,
ঈর্ষায় হিংসায়
তোমার বিশাল মূর্তি তারা চিরদিন
পঙ্কলিপ্ত করে তো করুক।
এ সবের বহু ঊর্ধ্বে তুমি অন্য আকাশে উন্মুখ।
শুধু এক দিক্ চিনে
জীবনের ক'রো না খণ্ডিত,
দশদিক্ হ'তে আলো অসংকোচে কর অন্বেষণ
তুমি তাই সত্য দশানন।
সোপান হয়নি গড়া,
স্বর্গ আজো দূর।
তোমার চিতার শিখা কিংবদন্তী-কল্পনায়
তাই বুঝি নিভেও নেভে না.

হে অতৃপ্ত পৃথ্বী-প্রাণ
শূন্যবৈরী শাশ্বত বিদ্রোহ!

শ্রীরাম

কোথাও সরযূ বয়!
কাকচক্ষু জল তার
স্ফটিক-নির্মল।
ছায়া কাঁপে সেই জলে নবারুণরাগে
সহস্র হিরণ্য-শীর্ষ মহানগরের।
—আমার অযোধ্যা সেই।
সেখানে যজ্ঞাগ্নি জ্বেলে
হয়তো কখনো বর মেলে
ধরণীর মূর্ত মনস্কাম,
নবদূর্বাদলশ্যাম রাম।
সাধ হয় তাঁরে লয়ে
রামায়ণ রচা যেন হয় আরবার।
তাড়কা-নিধন নয়,
নয় শুধু অহল্যা-উদ্ধার।
নয় দীর্ঘ বনবাস বর্ষ চতুর্দশ,
দুঃসাহসী সাগর-লঙ্ঘন,
সীতা উপলক্ষ্য মাত্র
লক্ষ্য যার বুঝি দশানন।
পিতৃসত্য, লোকসত্য,
সকলের সব সত্য পালনের পর
আপন গহন সত্য
খুঁজিবার রহে যেন কিছু অবসর।
আমার শ্রীরাম
কে জানে যে কার মাঝে
ধন্য হবে তাঁর পুণ্য নাম।

অথবা কিন্নর

মুখ

একটা মুখ কাঁদায় হয়ে শীতের রাতে পথে অনাথ শিশু,
মেলায় বাজিকরের খেলায় একটা মুখ মুখোস পরে' হাসায়।
খেয়ার নায়ে ওপারে যেতে কবে যে কোন ভিড়ে
একটা মুখ এক নিমেষে অকূল স্রোতে ভাসায়!
কার সে মুখ, কার?
জানে কি তারা-ছিটোন অন্ধকার!

সে মুখ যারা দেখেনি তারা জানে না জ্বালা নিদান যার নেই।
শীতের দিনে পোহায় রোদ উঠোনে বসে আরামে কাঁথা গায়,
ঝুমকো লতা দেয়ালে তোলে, মরাই রাখে ভরে',
ফল কি ফুল পাড়তে শুধু নাগাল ডাল নামায়।
হোক সে মুখ যার,
অনিদ রাতে কাঁপে না অন্ধকার।

সে মুখ যার পড়েছে চোখে ঘরে-ই থাকে যায় না সেও বনে,
বসত করে পাঁচিল ঘিরে, হিসেব করে' পুঁজি যা আছে ভাঁড়ায়।
তবুও কোন হতাশ হাওয়া একটা ছেঁড়া ছায়া
তারার ছুঁচে সেলাই করে' রাত্রি জুড়ে টাঙায়।
কার সে ছায়া, কার?
প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার।

কিন্নর

নদীতে বাঁধানো ঘাট, সে তোমার, আমার, তাদের,
যারা শুধু ধাপে বসে বড় জোর শোভা দেখতে পারে
পূর্ণিমার খ্যাতি রাখতে। নইলে শুধু নৌকোয় বেসাতি
আকণ্ঠ বোঝাই করে ওপারের হাট বুঝে ছাড়ে।

আঘাটায় যায় না সেও। কিন্তু তার পায়ের তলায়
শান-বাঁধানো পইঠাগুলো দুলে ওঠে তরঙ্গে ইচ্ছার,
যেন কি ঠিকানা খুঁজতে যা কখনো পৌঁছোন জানে না।
তার কাছে সব নদী অচিরার সোহাগ সোচ্চার।

সময় শাসিত হোক, ধেনু ধান্যে পূর্ণ হোক ধরা

অথবা কিন্নর

প্রাণের বিক্রম নিত্য দিগ্বিজয় ছড়াক উল্লাসে।
সে শুধু না নির্বাসিত হয়, যার উৎত্রস্ত মন
খোঁজে না আয়ুর উহ্য, ভ্রান্তিকেই সেধে ভালবাসে।

সে কোথাও দেয় না ডুব, নদীতে কি জীবনে, সৃষ্টিতে।
চায় না কিছুরই মানে, শুধু বোঝে মুহূর্ত-মর্মর,
ব্যাখ্যা নয় ব্যঞ্জনাই। প্রপঞ্চে সে স্বেচ্ছা-প্রবঞ্চিত,
অবান্তর ক্ষণিকের নিরাসক্ত কামুক কিন্নর।

রোজ-নামাঃ আষাঢ়

এক।। আকাশ এখন আনমনে কি ভাবছে!
মেঘের তুলি হাল্কা টানে বোলায়,
জল ছিটিয়ে মুছে'
দমকা হাওয়ায় শুকিয়ে আবার আঁকে।
সেই তে-শূন্যে তিনটে চিলের আঁচড়,
বুঝি সই।

দুই।। ঘণ্টা বাজে জেলখানাতে।
সন্ধ্যে হওয়ার খবর ভেসে যায়
কোথায় সুদূর জলা থেকে
উড়ে-ফেরা পানকৌটির ডানায়।
নয়'ত পাখি,
কোন পুরাণের মহারথীর বিশাল ধনু থেকে
ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটেছে
পুব দিগন্ত পানে,
কাল সকালের রাঙা সূর্য
বিঁধে তুলবে বলে'।

তিন।। ঝাপসা দেখার সকাল হ'লো,
বিরামবিহীন বৃষ্টি ঝরে, ঝরে।
পর্দা ফেলা সব চেতনায়।
রিমি ঝিমি ধ্বনির নেশায় বুঁদ
মনটা ঝিমোয় আবছা অবসাদে।
চড়ুই দু'টো ঘরের কোণে আলমারীটার মাথায়
থেকে থেকে আমায় নিয়েই
কাটছে যেন ছড়া।

চার ।। বুনো লতার আঁকড়িগুলো
শূন্য হাতড়ে ফেরে,
ধরবে এমন নেইক কোথাও কিছু ।
মেঘে মোড়া বোবা বিকেলবেলায়
ওরা যেন প্রাণের ছোঁয়াচ-লাগা
অবোধ জড়ের করুণ বিমূঢ়তা!

বুড়ি

বুড়িটা ছিল ছোঁবার।
তাকেই ঘিরে সাজানো সব খেলা,
—রাতের ঘুম দিনের ঘাম, দোকান-পাট, পূজো
ধু ধু শূন্যে রং লাগাবার মেলা।

বুড়িটা গেল কোথা ?
নিশানগুলো যেখানে ছিল পোঁতা ;
সেখানে শুধু উদোম ফাঁকা মাঠ।
বিনি ঠেকোয় ভেস্তা সব ঠাট।

নতুন বুড়ি খুঁজি।
যে দিকে চাই ধাঁধা লাগায় চূড়ো কি গম্বুজ-ই।
কোথায় পাব বুড়ি ?
গুঁড়ির খবর নেইক, জীবন শুধুই আলগা ঝুরি।

নেই কি বুড়ি, নেই!
জট পাকানো আকাশ পাতাল, মিছেই খোঁজা খেই ?
প্রাণটা করে প্রাণের কার্য, কানা ঢেউয়ের দোলায়!
মনের বালাই থাকলে শুধু ছায়াবাজিই ভোলায় ?

জিৎ

শীতে না কাঁপলে
রোদ কে পোহাতে চায়!
রোদে ফাটা মাটি
মেঘের পানে তাকায়।
ঘরে তাকে পেলে পথে কি কখনো ঘুরতাম!
বানে না ভাসালে
কে ছোটে তুলতে বাঁধ ?
আকাল্পে মরে-ই

মরাই তোলার সাধ!
সে ভালোবাসলে ভিটের বনেদ–ই খুড়তাম।

না–পাওয়ার দাগা
শেখালো কিছু না চাইতে।
চূড়ান্ত হার
জিৎ হ'ল উৎরাইতে!

দূর ও নিকট

দূরের দিকে চাইতে গিয়ে
নিকট হ'ল ঝাপসা।
রোদ্দুরে আর দাঁড়িয়ে কেন
ছায়ায় এসে বোসো।
খুঁজোর জলে গন্ধ মাটির
জুড়োয় তবু বুক'ত।
মেঘ ভাসিয়ে যে হাওয়া যায়
জেনো সে আর ফিরবে না।

শুধু কি চোখ চাওয়ার জন্যে?
চোখের পাতাও নেই কি?
পাতা ফেলে একটুখানি
আঁধার নামাও। হয়ত
সেই আঁধারে–ই বোবা আকাশ
মনের কথা লিখবো
মোছা আলোর হিজিবিজি
বুঝলে ধাঁধা থাকবে না।

ঝাপসা নাম

ছেঁড়া তালির মেঘের তাঁবু ফেলে
আকাশ বুঝি সময় রুখে রাখে।
হাওয়াও তাই হঠাৎ ভুলে গিয়ে
প্রলাপে এক ঝাপসা নাম হাঁকে।

অনন্যা, অনন্যা,
মৃগতৃষ্ণার যায় কি কান্না পড়ানো?

এ মেঘ ঠেলে সময় ফের বইবে।
হাওয়া-ই হ'বে মাটির মত মৌন।
প্রত্যহের যেখানে পলি জমবে,
স্মৃতির কণা, একটা নাম গৌণ।

অনন্যা, অনন্যা,
জীবন মানে শুধুই ছায়া জড়ানো!

শুদ্ধি

ঝড়ে ও নীল নোংরা হ'ল? হয় কি!
আকাশ কই মাখে না মুখে কালি
নগ্নতায়! তখনো নেই লজ্জা।
মেঘের ঢাকা দিলেই নাগরালি
তুফানে মাতে, ঘোচায় তপোচর্যা।
উর্বশীই মুকুরে উমা নয় কি?

এই যে ঝড় শূন্যতারই শুদ্ধি
আবিল মেঘে ধুলোতে আর গ্লানিতে।
শুধুই বুঝি কালিমা ভাবো ধোয়া যায়!
শুভ্রতাও শোধন খোঁজে শোণিতে।
শোণিতে ঝড় প্রাণের ব্যাস বাড়ায়।
কে পরাশর হ্রদে না হতবুদ্ধি!

খিড়কি

চিলের ছাদে চিল বসে না
বেতার-ত্রিশূল শূন্য শুধু খোঁচায়।
কি পায়? কি চায়?

শূন্য আরো সৃজন্ন হ'ল।
দেয়াল ছাদে ঢাকা
বুক তবুও ফাঁকা।
দেশান্তরের ডাকাডাকি
শুনেও না পায় পাখা।

অথবা কিন্নর

মেঘ ছাড়ালাম
বেগ বাড়ালাম
ও মন, তবু যে সব ফাঁকি।
চোর-কুঠুরি হাতড়ে দেখি
শুধুই ভাঙা টুকিটাকি।
আসল সদরে খিল।
সদর খোলা পাই বা না পাই
খিড়কি নিয়েই থাকি।
তারা ধরার নাই বাসনা
পাই যদি জোনাকি।

বিফল নায়ক

অন্ধকারে ডুব দিয়ে নিরাময় হয় হয়ত কেউ
কেউ চায় শুধু স্বচ্ছ আলো দিয়ে হৃদয় ধোয়াতে।
আছে এক মূঢ়মতি আলোঅন্ধকারে ভেদাভেদ
বোঝে না যে, সাধেনা'ক জীবনের নির্যাস চোয়াতে।

একদিন সেও বুঝি হ'তে চেয়ে মামুলী নায়ক
পরিপাটি গেঁথেছিল সুখ দুঃখ উৎকণ্ঠা হতাশা,
সাজিয়েছিল আখ্যায়িকা শাদা কালো নক্সাকাটা ছকে,
পঞ্জিকা নির্ভুল জেনে লগ্ন ধ'রে মেটাতে পিপাসা।

তারপর সেজেগুজে ভূমিকায় নেমে এসে দেখে
গল্প সব ধুয়ে মুছে বয়ে যায় কৌতুকে সময়,
দিগ্বিদিক অনিশ্চিত, চিহ্ন সব অস্থির বিভ্রম,
ব্যাপ্তি বিন্দু সমার্থক, এক-ই সুরা সংশয় বিস্ময়।

সরাই

আবার কাফিলা থামবে।
ভুলে যাওয়া মগ্ন স্মৃতি যেন জেগে ওঠা
চমকে দেওয়া হঠাৎ সরাই।
কুঠরি সব খোপ খোপ
চুল্লির আগুন দোরে দোরে,
ধোঁয়া ধুলো, কটুগন্ধ শ্বাস

মানুষ ও পশুর গ্লানির।

এখানে বিশ্রাম করো, পর্যটক।
পোড়া মাংস সেঁকা রুটি, স্বাদু স্বচ্ছ জলে
প্রাণের শুশ্রূষা সারো।
শুধু যেন লুব্ধ চোখে
মাটি কিংবা মানবীর
উচ্ছলিত যৌবনে মজো না।

তুমি'ত হয়েছ পার
কত ক্ষুব্ধ জনপদ সতর্ক শান্তির,
নীড়-বাঁধা কত স্বপ্ন
মরুদ্যানে, পাহাড়ের কোণে,
কখনো বা নদীস্তন্যে সস্নেহে লালিত।
কোনো ধ্রুব দিগন্তের
তবু তুমি নও 'ত শরিক!
তোমার বিবাগী পথ
নিরুদ্দেশ ইচ্ছায় যদি না
গেঁথে গেঁথে রাখে,
শুকিয়ে যাবে সমস্ত বসতি
আপনার তন্ময় বিকারে।

কবিতা

একটা সকাল কি সূর্যাস্ত যদি পাও
চমক দেওয়া কি চোখ জুড়োনো,
ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখো এঁকে।
একটু মমতা কি বিশ্বাস,
সুখ কি সোহাগ, উল্লাস কি উত্তেজনা,
বেদনা কি বিক্ষোভ যদি পাও
সুর দিও তাতে।
আর গল্পে রেখো গেঁথে
সময়ের স্রোতে নিরুপায় ভাসতে ভাসতে
যা দেখলে শুনলে ভাবলে বুঝলে।
শুধু যখন যন্ত্রণার ঢেউ উঠবে
পাকা বনেদেরও তলা থেকে
তোমার তুমি-কেও ভেঙে চুরে,

অথবা কিন্নর

প্রাণের পুতুল–নাচের সুতো ছিঁড়ে
দুদণ্ডের জন্যে হবে স্বাধীন
তখন কবিতা লেখার চেষ্টা কোরো একটা।

বহতা

আলগোছে–ই ছুঁয়ো সব।
কিছুই ধোরো না মুঠো করে',
ধরাও কি যায়?
সব কিছু তরল বহতা
প্রেম, ঘৃণা, আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস,
কঠিন পাহাড়, নদী, বন,
ধ্রুব ওই তারকা ও।
তাই বলে অলীক ও বলি না।
এ সৃষ্টির গূঢ় অর্থ স্রোতেই ভাসানো।
কোথায় ধরবে তাকে থেমে?
তীর নেই তট নেই
বিধাতারও নেমে দাঁড়াবার।
শুধু বওয়া
অবিরত অনিশ্চিত হওয়া।

তারিখ

তারিখ কত? পাঁচুই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।
পাঁজির ছাপা ভুল!
মন ত জানে দমকা হাওয়ার
দামাল এক সকাল
মেঘের কুচি ছিঁড়ে ছিঁড়ে
ভাসাতে মশগুল।

ইতিহাসের পাতায় ছাপা থাকবে অনেক দিন
কীর্তি খ্যাতির ঘনঘটায় ভারী,
একটা তারিখ পালিয়ে এসে
উধাও নিষ্ফলতায়
দেয় যদি দিক পাড়ি।

বনের ঝরা পাতা ওড়াক,
সাজানো মন হেলায় ছড়াক,
পাক দিয়ে সব ভাবনাগুলোয়
অকারণে খুশি জড়াক।
দমকা হাওয়ার সকাল, তুমি কার?
নয় ইতিহাস নয়কো পঞ্জিকার।
হারিয়ে গিয়েই পায় নিজেকে
শুধুই বুঝি তার।

যোজনা

'সব সেতু ভেঙে যাক্
আমি আর ওপারে যাব না।'
বলেছিল ঋভু কোনো
নির্নিমেষে আপনার নাভিতে তাকিয়ে,—
'নিজেকে ছড়ালে শুধু
একই কান্না বারে বারে শোনা,
স্বরগ্রাম সাধা শুধু একই যন্ত্রণার।
আমি তাই নিজের গভীরে
মগ্ন হয়ে বুঝে নেব
এ সৃষ্টি ও এ সত্তার সার।'

সমস্ত নদীর সাথী অনাদি জলায়
নীরব কৌতুক হয়ে
আজো সেই সত্যশুভ্র ধর্মরূপী বক
থাকে না কি চিত্রার্পিত যেন?

শুধালে সে দেবে বুঝি আশ্চর্য উত্তর,—

'অর্থ নয় ব্যঞ্জনা মদির,
আলোর তাৎপর্য নয় সূর্যাস্তের ছটা,
একান্ত বিযুক্ত সত্য নির্যাস ও পুষ্পের মঞ্জরি।
সকাম তৃষ্ণায় প্রতি মুহূর্ত না পান করো যদি
অনন্তও অলীক কল্পনা।
নিত্যনব যোজনা-ই
এ সত্তার হেতু ও আহুতি।'

হলদী

ধোঁয়াটে শ্রান্তির পর, একটি নদী,
হলদী বুঝি নাম।
সেখানে দু'পারে ডাকে ঢেউ-তোলা
হাওয়ার নিলাম।
কে যে বেচে কে যে কেনে সারা বেলা
কেউ জানে না তা।
শুধু দুলে সায় দেয় তাল আর
খেঁজুরের পাতা।
ডিঙি করে পারাপার জলে জ্বলে
মাছের বিদ্যুৎ।
লোভ যার নেই সেই-ই লাভ গোণে
খুশির বুদ্‌বুদ!

বিভ্রম

কখন হঠাৎ যাই অজান্তে ছড়িয়ে।
মাঠ হই মেঘ হই
হই জল দুরন্ত নদীর,
অরণ্য পর্বত হই, পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্র রাত্রির,

শহরের রাস্তা ঘাট গাড়ি ঘোড়া ভীড়
সব কিছু হয়ে দেখি শত শতাব্দীর
যত স্রোত গাঢ় হয়ে আমাতেই মেশে
ইতিহাস আবর্তিত আমারই উদ্দেশে।

অস্বচ্ছ চেতনা আমি, ভঙ্গুর, নশ্বর,
কেন্দ্রবিন্দু তবু কি সৃষ্টির?
অদৃশ্য তন্তুতে বোনে মহাকাল অন্তহীন
আমারি কি আরেক শরীর!

পোড়ো বাড়িটা

আমার জানালার ওপারে
পোড়ো বাড়িটা।

তার আলসেতে অশথের চারা,
হাত বাড়ালে পাতাগুলো ছোঁয়া যায়।
কি বলব?
নোনা ধরা অসহায় মুমূর্ষু বাড়িটাকে
সর্পিল শিকড়ের নির্মম আলিঙ্গনে
বেঁধে মারছে শয়তান চারাটা?
তাই বলতে পারতাম,
যদি চারাটার চেয়ে বাড়িটা হ'ত বড়।

শুধু অশথ-চারা-ই নয়,
পোড়ো বাড়িটাকে
মানুষও আছে জম্পেশ ক'রে আঁকড়ে
অশথচারার মত শক্ত শিকড়ে নয়,
দুর্বল শিথিল ভীরু হতাশ হাতে।

ক'টা ছন্নছাড়া পরিবার,
বাড়িটা তাদের ভয়ে লুকোবার কোটর,
ভরসার ভেলা নয়।
এ বাড়ি তারা ভাঙতেও জানে না,
গড়তেও।

মরা মানুষের সঙ্গে ঝগড়া নেই।
কিন্তু হার-মানা আধমরা মানুষের চেয়ে
জ্যান্ত গাছ ভালো,
হোক, তা ভিটে-ধ্বসানো অশথের চারা।

অভাবিত

দমকা হাওয়ার ঝাপটায়
থেকে থেকে ঘরদোর কাগজপত্র
সব ওলট পালট।

মনের ভেতরও তাই।
ভাবনাগুলো দানা না বাঁধতেই, যাচ্ছে
তছনছ হয়ে।
এলোমেলো কথা
যেন দূরের অশথ গাছের অস্থির ডালপালার
উদ্দাম সব পাতা আকাশে উড়তে উন্মুখ।

অথবা কিন্নর

একটা খসা পাতা
কেমন করে ঘরে এসেছে উড়ে।
এদিক ওদিক ছোটাছুটি করল খানিক
আমার সঙ্গেই তামাসা করতে-ই বুঝি।
তারপর হঠাৎ যেন পাখা মেলে উড়ে গেল
আরেক জানালা দিয়ে

কি হল কে জানে ?
খাতার পাতা বন্ধ করে
কলম রাখলাম তুলে।
ঘর গোছাবার দরকার নেই আর,
মনেও।
খেয়ালী হাওয়ার জন্যেও
জানলা খুলে রাখতে হয় কখনো,
এলোমেলো কোনো অভাবিতের কৌতুক
সাজানো গোছানো সব ছকের নীতি
উল্টে দেবে তারই প্রত্যাশায়।

এই শহরে

যাদের তুমি চিনতে, তারাও
হারিয়ে যাবে,
এই শহরে। শহর বড় কঠিন।
মাটিকে সে পাথর করে,
অরণ্যকে কাঠ,
আকাশটাকে ছাদে ঢেকে
ভেজিয়ে দেয় কপাট।
কঠিন শহর!

তোমায় যারা চিনত, তারাও
খোঁজ পাবে না,
এই শহরে! শহর বড় নিষ্ঠুর।
কোথায় তুমি লুকিয়ে থাকো!
বেড়ার পরে বেড়া
আপনি তুলে এখন তুমি
জটিল জালে ঘেরা।
নিষ্ঠুর শহর।

খোঁজোনি যা তাই হয়ত
হঠাৎ পাবে,
এই শহরে। শহর বড় দরাজ।
হঠাৎ কোথায় ভিড়ের মাঝে
একটি পরম ছোঁয়া,
একটি পলক, চিরকালের
আলোর ধারায় ধোয়া।
দরাজ শহর।

পাকা বনেদ যতই গাঁথো
নাড়া খাবে,
এই শহরে। শহর বড় উদাস।
সব কিছু তার মাপা জোখা
আকাশ মাটি জল,
বুকের মধ্যে কান্না তবু
অথই অতল।
উদাস শহর।

কাচঘর

জানি এ কাচের ঘর,
তাই কি ঢিল ছুঁড়তে সাধ হয়?
ভাঙার ঝঙ্ঝনা হয়ত
আচমকা নিশুতি কাঁপিয়ে
তারার জমক সব ঝরিয়ে দেবে
ঝুরঝুর ঝুরঝুর।

তুহিন তমসা তারপর
ঘূর্ণিস্তম্ভে পাক খেয়ে পাক খেয়ে
ক্ষণিক উন্মত্ত সেতু
ঠেলে তুলে জুড়ে দিতে পারে
শূন্য আর সৎ।

একটা কাচের ঘর
আজন্ম জম্পেস করে' আঁটা,
—চেতনার চৌহদ্দি মৌরুসী।

বেশ থাকি, খাই দাই

অঙ্ক আর আকাঙ্ক্ষা মেলাই টেনে বুনে।
গুণে গুণে পা ফেললে
সে ঘরে-ই সব প্রশ্ন মেটে।
তবুও এক একদিন যন্ত্রণা নিশপিস্।
কি ফিসফিস কুমন্ত্রণা আদিম রাত্রির,
—-কাচঘরটা করো না চুরমার!

নিষ্প্রদীপ

নগরের বিদ্যুৎ-বাহিনী ধমনীর
কোথায় কি গলদ!
সব আলো হঠাৎ গেল নিভে।
আমাদের শহরতলি অন্ধকার।
ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মেঘে মোড়া আকাশে তারা নেই একটি।
তিমিরলিপ্ত পৃথিবী।
কোথায় আমার দিন রাত্রির চেনা শহর?
নিবিড় কালিমা-স্তূপ দিকে দিকে ছড়ানো—
যেন উদ্‌ভ্রান্ত কোন দানবীয় উদ্যোগের-
নিরবয়ব ভূমিকা।

মনে হ'ল মানুষের সমস্ত পিপাসা আর হতাশা
দম্ভ আর দীনতার
নাট্য-লীলা যেখানে চলে,
সেই রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে যেন গিয়ে পৌঁছেছি।

এই নগরের গহন গোপন মুখই কি
সেখানে দেখলাম,
আলোর পবিপাটী প্রসাধন যা ঢেকে রাখে?
সন্দেহ হচ্ছে,
সেই আদিম অরণ্য থেকে
বেশী দূর এসেছি কি না।

এ বিলম্বিত সমাধি নয় তবু
চিরকালের চরম দাঁড়ি-টানা।

ও নয় বুঝি ঝিল্লীর ঝংকার।
অন্ধকারের গহন হৃদয়তলে
মহাজীবন শংকাহরণ জ্যোতির্মন্ত্র জপে
তিমির-বিদার আরেক অভ্যুদয়ের।

একটি নির্জন প্রান্তর

এখানে তারারা বিজলী বাতির
প্রতাপে হয়না ম্লান,
অস্তসূর্য পূর্ণিমা চাঁদে
এখনো হয় দেখা হয়।
হাঁসের দলেরা নির্ভয়ে এসে
পথেই আসর পাতে।
এখানে হৃদয় ফিরে পায় তার
ভুলে যাওয়া পরিচয়।

নদী সদাগর পাথুরে পোল

হয়তো সে নদী আছে
কোনোদিন ছোঁয়নি যা ঘাট,
পড়েনি পালের ছায়া
দেখেনি কোথাও হাট বাট।

শুধু ধু ধু তেপান্তর
এঁকে বেঁকে পার হয়ে যেতে
আপনার মনে একা একা
মেঘ পাখি নিয়ে থাকে মেতে।
একদিন সে নদীও
সদাগর খুঁজে পাবে কেউ,
তারপর বাঁধ দিয়ে
বেঁধে দেবে তার নীল ঢেউ।

ভাসাবে হাজার দাঁড়ী
ব্যাপারীর বজরা তার বুকে।

গঞ্জ ও নগর সব
বসাবে পাথর ঠুকে' ঠুকে'।

তখনও সে নদী বুঝি
কিছুতেই মানবে না'ক হার।
আঁধার নিশুতি রাতে
কুয়াশায় ঢেকে চারিধার
গান গাবে ছলছল
—বোবা তার হৃদয়ের গান,
পোলের পাথুরে থামে
বুক ভেঙে হোক খান্ খান্!

ধন্যবাদ

ধন্যবাদ তোমাকে, সঙ্ঘমূর্তি শঠতা!
আমায় তুমি চমকালে।
ভুলতে বসেছিলাম হয়ত, যে
শিব শক্তি অভেদ,
অবিরোধী মানে নির্বীর্য নয়।
শুধুই মেঘ হ'তে চেয়েছিলাম হয়ত,
—করুণা কোমল ধারা আর লঘু রঙীন শোভা।
আমার বুকে বজ্রবহ্নি তুমি জ্বালালে।

তোমার কাছেই ঋণী হ'লাম,
বিষকীটচক্র কপটতার!
তোমার বৃশ্চিকপুচ্ছই
আমার শান্ত শোণিত স্রোতে
এনেছে তপ্ত দুর্বার বন্যা-বেগ,
আমার অসন্দিগ্ধ শৈথিল্য দিয়েছে ঘুচিয়ে।

পরমপ্রীতিতে প্রসারিত
আমার দক্ষিণ করের বরমুদ্রাই তুমি দেখেছ।
আর দেখো আমার আমার উদ্যত লৌহমুষ্টি,
হিমালয়ের ওপারেও যা পৌঁছোবে।

ভাঙা ভেবে যা-তে ঘা দিতে চেয়েছিলে
তা-ই আজ অখণ্ড অয়স্কঠিন
মৃত্যুপণ এক শপথ,
কুমারিকা থেকে কৈলাস অবধি।

অথবা কিন্নর

আমার চূর্ণ বিশ্বাসের প্রতিটি কণা থেকে
উৎক্ষিপ্ত হবে
তোমার যূথবাহন দম্ভের বিস্ফোরক কালস্ফুলিঙ্গ।

আমিও হিমালয় পার হয়ে গেছি কতবার,
গেছি, অমিতাভের অমৃতবাণী নিয়ে,
আর তুমি এলে লোলুপ শ্বাপদসঞ্চারে।
তবু আমার ঋণ তোমায় স্বীকার করাব,
গিরিরাজের পবিত্র তুষার আবার নিষ্কলুষ করে'
তোমার চোখের মদমত্ত রক্তিমা-ই
যেদিন দেব কাটিয়ে।

ভয়াল

চক্ষে তব বহ্নি জ্বালা মধ্যাহ্ন সূর্যের
শিরে ঝন্ঝা-ধূলি-জাল-জটা,
ঊষর রিক্ততা ধ্যান, রুক্ষ দেহে ক্ষতচিহ্নসম
কোথাও বা পলাশের বুঝি রক্তছটা।
তবু জানি হে তাপস, হে কঠিন, ভয়াল, নিষ্ঠুর,
দুঃসহ এ দাহ তব, স্নিগ্ধ শ্যাম ভবিষ্যের-ই
আশ্বাসে মধুর।

এ তপ্ত আকাশ হ'বে
একদিন মেঘেতে মেদুর।
এ ধরণী তৃষ্ণায় আতুর
পাবে তার প্রাণ-সুধা-ধারা।
শূন্যতা সূচনা যার
পূর্ণতায় হবে তাই সারা।
তাই তব রুদ্র রোষে
হে ভৈরব, আর নাহি ডরি।
ভয়াল ভ্রূকুটি দিয়ে
কোমল করুণা জানি রেখেছ আবরি'।

জানলায়

একলা যদি হও কখনো, আসবে তখন?
আমি থাকব বসে।

আমি আর এই জানলা দিয়ে কাটা রাস্তাটুকুর ফালি,
যেখানে সব ছবি ফোটায়,— টুকরো ছেঁড়া ছবি
রোদের আলোয় ধুইয়ে কিংবা অন্ধকারে একটু ঢেকে মুছে
সংগত নেই, শেষও কিছু,
তোমায় আমার চাওয়ার মত বুঝি।

আখালি ঢেউ কোথায় ভাঙে কূল!

কথা যখন ফুরিয়ে যাবে, আসবে তখন?
তখন শুধু নীরব বসে থাকা
শুধু কেবল বুঝতে পারা ছায়া জমছে, ঠান্ডা গাঢ় ছায়া
ছাপিয়ে শরীর, ছাপিয়ে হৃদয় মন,
জীবন দিয়ে সময় যা যা লেখায়
যে ছায়াতে হারিয়ে গিয়ে আবেক ভাষা পায়।

অবোধ পাখি মেঘে-ই ডানা মোড়ে!

পাওনা দেনা সব মিটিয়ে আসবে কি আর?
আমি থাকব বসে।
আমি আর এই জানলা-পেতে-ধরা আকাশ একটুখানি,
যে আকাশে ছবি ভাষায়,—মেঘের পাখির ছবি
আবার কখন সব কিছু দেয় মুছে
এঁকে দিতে একটি সুদূর তারা
তোমায় আমার পাওয়ার মত বুঝি।

হতাশ নদী মরুর বালি খোঁজে।

বালির কণা

বালির কণাটা দেখেছ?
শহরের কোন নালার ধারে
চিক্ চিক্ করছে শরতের রোদে!

কি দেখব বালির কণা?
আমার আকাশ-ছোঁয়া শহরের মিনার
বাঁধানো রাস্তা, সাজানো বাগান, স্বচ্ছ সায়র,
আমার দিগ্বিজয়ী, দম্ভ, শোভা আর সমারোহ।
তুচ্ছ বালির কণা কি আমার চোখে পড়বার?

কিন্তু ওই বালির কণাটিতে
মহাকালেব কৌতুকেব হাসি-ই যে চমকায়।
এই ত বিলুপ্তিব বীজাণু
এসেছে কত ইতিহাস মুছতে মুছতে:
এব পেছনে বিস্মৃতিব কি অনিবার্য ঢেউ!
এক থেকে অগণন হয়ে
পুঞ্জ পুঞ্জ সুষুপ্তিব অন্ধকাবে
একদিন আমাব এ শহব ও দেবে তলিয়ে।
তখন কি থাকব শুধু
প্রত্ন পণ্ডিতদেব খনিত্রেব আশায়?
তাব চেয়ে
এই শহবেব সমস্ত হাসি সমস্ত কান্না নিংড়ে
একটি আশ্চর্য রূপকথা যদি বানাতে পারতাম
যা কুহেলী জালেব মত বিছিয়ে থাকবে নীল শূন্যে,
আমাদেব সমস্ত খোঁজা বোঝা ও বোঝাব যন্ত্রণা ও উল্লাস
ভাবীকালেব কোনো শুক্তি-কোষে
স্বাতী তাবাব শিশিবেব মত ঝবিয়ে দেবাব জন্যে।

নিরশ্রু

একদিন কাঁদবে না আর।
দেখবে সব নদী নম্র ধীর
সেচে জল দিয়ে দিয়ে,
[illegible] স্নেহভবা নিবশ্রু ধবণী।
সুশৃংখল স্বচ্ছল জীবনে
প্রসারিত পবমায়ু
অশান্ত শৈশব থেকে
ধীরে ধীরে [illegible] আসে প্রসন্ন বার্ধক্যে।
তাই [illegible]
[illegible]
[illegible] পিপাসা
[illegible] হবে না?
শুধু [illegible]
খোজাব, বোঝাব,
মবীচিকা প্রেমেব সন্তোব।
তাব চেয়ে ভালো নয় কি
নিরাপদ নিশ্চিন্ত পৃথিবী

উচ্ছলিত লক্ষ্মীশ্রীর,
ফ্রেমে ঘেরা পরমায়ু,
দুদিকে মলাট দেওয়া উজ্জ্বল মজবুত
বাঁধানো প্রাণের পুঁথি,
সব অর্থ যার মধ্যে ধরা ?
কোন মূঢ়, নিঃসঙ্গ একাকী,
তবু কান্না চায় !

প্রদাহ

সব কিছু তাই আছে
বাড়ি আর বেড়া,
আশা, তৃপ্তি, অসন্তোষ,
উল্লাসে ও অবসাদে
জীবনের বৃন্ত খুঁজে ফেরা,
হেমন্তের কুয়াশায় ধোঁয়ার ভেজাল,
নির্মল প্রাণের ধারা
রুদ্ধ করা মিথ্যার জঞ্জাল।

তবু এক দুঃসহ প্রদাহে
অন্য সব জ্বালা মুছে গেছে,
আর সব চেতনা অসাড়।
আকাশ পৃথিবী সব ভিন্ন চোখে চায়,
সূর্যোদয় রক্তিম ধিক্কার,
রাত্রি গাঢ় গ্লানির কালিমা।

আত্মায় ধর্ষিত আমি।
আসমুদ্রহিমাচলবিস্তৃত সত্তায়
অশুচি স্পর্শের ক্ষত
পাপের ব্যাধির মত দহে।
শিরায় শোণিত নয়,
বিষতিক্ত আর কোনো স্রোতে
হৃদয় স্পন্দিত।

সুখ, প্রেম, শান্তি আর সত্যের পিপাসা
থাক তবে আজ মুলতবি।
বাঁচার চেয়েও বড়

জীবনের অত্যাজ্য সুরভি,
মাটির মমতা আর মানবতা মেশানো আধারে
স্বাধীনতা যার এক নাম।

একটি ভাস্বর মানুষ

সূর্য খুঁজি কোথায় ?
শুধু আকাশে নয়,
নয় মৃত্তিকার হরিৎ উল্লাসে,
পৃথ্বী-পঞ্জরের পুঞ্জিত তাপ-শিলাতেও নয়।
খুঁজি এই মানুষের মধ্যে
গহন পরম অনাদি সূর্য।

ইতিহাসের পট কতবার রক্তাক্ত হতে দেখলাম,
দেখলাম উৎক্ষিপ্ত আলোড়িত মানব-প্রবাহের মত্ততা।
সে সবও বুঝি ক্ষণিকের সূর্য-কলঙ্কের রিষ্টি।
তবু তারই মধ্যে
অবিরাম সময়ের ধারায় ছড়িয়ে যাওয়া
আগামী প্রস্তুতির পলি।

সমস্ত ভাবীকাল যাতে রঞ্জিত
সেই সূর্য মাঝে মাঝে চমকায়
শুধু মানুষেরই মধ্যে।

সৃষ্টিমূল বিধাতার ত্রিকালের পালার খসড়া-ই
কি আধেক উদ্ঘাটিত,
বারেক অনাবৃত, জীবনের পরম রহস্য-মুকুর,
শীতার্ত একটি দ্বীপে
একটি ভাস্বর মানুষ
জীবনকে মঞ্চে তুলে দেখেছিল বলে ?

নকল মিছিল

অনাদ্যন্ত এ মিছিলে
তুমি আমি সকলেই আছি।
তবু যে ভাবে-ই দেখি

দূর কিংবা নিকট বীক্ষণে
অভেদ্য ধাঁধায় ঢেকে সব দৃশ্য বিফল বিহ্বল
এল গেল হার মেনে
কত ভাষ্য কত ব্যাখ্যাকার।

সকৌতুকে শুধু একজন
[illegible] কি এক নকশা মোছেন
রাজা ও ফকির, শঠ, সাধু প্রাণ [illegible]
ভালবাসা, হিংসা, ঘৃণা,
তৃষ্ণা, স্বপ্ন যন্ত্রণা আহ্লাদ,
রং মাখিয়ে পুতুলগায়, [illegible]
সাজানো পালায় গেঁথে
খেলাচ্ছেন সে মঞ্চে [illegible]

সময় নিথর হয়ে সেই একবার
দীপ্ত স্বচ্ছ চেতনার
ক্ষয়হীন ত্রিপল স্ফটিকে,
ব্যাখ্যার অতীত, যা, তা
বিচ্ছুরিত করে যায়
অফুরন্ত বর্ণালী-বিস্ময়ে।

জ্যোতিষ্ক সত্তা

কালপুরুষের ধনু
নিদাঘের অভিশপ্ত রাত্রিশেষে কোনো
অকস্মাৎ দিল কি টঙ্কার?
ক্ষীণবৃন্ত নক্ষত্রেরা ঝরে গেল আতঙ্ক-পাণ্ডুর।
বিহ্বল প্রভাত এল শোকাহত আরক্ত নয়ন

অলীক কল্পনা জানি।
অরণ্যে ও সমুদ্রে পর্বতে
পৃথিবীর হাটে মাঠে ঘাটে
জীবনের স্রোত নিত্য বয়ে যাবে ছেদহীন বেগে,
স্তব্ধ কোনো মুহূর্তও
কোনখানে হবে না নিথর।
সৃষ্টির প্রবাহ বুঝি চির-উদাসীন।

জন্ম মৃত্যু-ডোর হ'তে খসে গিয়ে তবু,
একটি জ্যোতিষ্ক-সত্তা
মানুষের ইতিহাসে
রেখে দিয়ে গেল না কি
সূর্যাংশের শাশ্বত স্বাক্ষর ?
স্বাক্ষর, না অবিনাশী সংকল্পের বীজ।
যেখানে প্রাচীর তোলা
দেশে দেশে মানুষে মানুষে,
শক্তির সংগ্রাম যেথা
লোভে, দম্ভে, হিংসায় নির্মম
শঠতা ও কৌটিল্যের শ্লাঘামত্ত
কণ্টকিত রক্তাক্ত প্রান্তরে,
সেইখানে অংকুরিত সে-বীজের সত্যমূল প্রীতির পাদপ
দূর করে' সব ভেদাভেদ
অগণন প্রসারিত পত্রপুষ্প পুঞ্জিত শাখায়
একদিন সারা বিশ্ব ছেয়ে
বিছাইবে সুবাসিত ছায়া।

আশুতোষ

নিরবধি সব নদী
নিজেদের প্রাণ ধারা ঢেলে
শুধু-ই কি দিয়ে গেছে
পলি মাটি কোমল শিথিল
এ দেশের বুকে ?
শুধুই স্তিমিত প্রাণ আলস্য মন্থর ?

না, না, তা ত নয়।
মৃত্তিকা কোমল, আর্দ্র, সমতল, তাই
মানুষ উত্তুংগ হেথা
অভ্রভেদী মহিমা শিখরে।
চেয়ে দেখো ঊর্ধ্বে আঁখি তুলে
বিশাল হিমাদ্রী-সত্তা কত না অতুল
বজ্রদৃঢ় পৌরুষ-প্রতীক।

আমাদের গর্ব ও বিস্ময়
তুমি সে অমিততেজা পুরুষ প্রবর আশুতোষ

এ বঙ্গের অন্যতম নব-যুগ-মানস-স্থপতি।
জ্ঞানালোক জনে জনে বিতরণ-ব্রতে
সে সমিধ তোমার ও আহৃত
মহামুক্তি যজ্ঞে যার আত্মাহুতি-পবিত্র শিখায়
অবসান বিঘোষিত ভারতের গ্লানির রাত্রির।

খণ্ডিত কর্দম

লুই অন্টার মেয়ার

কে এমন তুমি, হে মরশরীর
যে, চিন্তার মিনার, আকাশ লুণ্ঠনকবা স্বপ্ন
      আর আদর্শ প্রেমের সাম্রাজ্য, করো দাবী?
যে বাসায় তুমি বাঁধা,
পাঁচটি মাত্র তা থেকে পালাবার দ্বার;
আনন্দের পাঁচটি মাত্র পথ, আর সেই পাঁচটিই যথেষ্ট।

কিসে তুমি অস্থির   হে মরশরীর
যে-দুঃস্বপ্নে তুমি কাৎরাও
আর পেলে যা বিষ লাগে আর না পেলেও হয় অসুখ
সেই সব কিছুর জন্যে চেঁচাও?
শুধু কি কটা কথা, বা কথার প্রেতছায়ার জন্যে
      নিজেকে তুমি করেছ ক্ষয়!
হাঁকাচ্ছ তোমার সমাধিকে
      যে সমাধি চলেছে স্থির সমাধির-ই দিকে?

সত্যের মানে কি মাপ কেমন করে পাবে তোমার চোখ?
বিশ্বাস কি তোমায় অন্ন দেবে, পুণ্য দেবে আরাম কি উত্তাপ?
কিসে তুমি উদ্‌ভ্রান্ত হে মরশরীর,
যে এইসব ছায়াবাজির কাছে সান্ত্বনার আশায় আছ বসে,
সেই তুমি, যে আত্মার চেয়ে বড়, একাধারে আকৃতি ও গতি?

তাহলে ধ্বংস হোক তোমার নিয়তি, হে মরশরীর,
কারণ প্রথম নিঃশ্বাসে যে বলে, 'হয়ত পারি।'
আর শেষ নিঃশ্বাসে, 'পারতেই হবে।'
তাকে পথ দেখানো অসম্ভব।
ফেরো সংসারের ঊর্ধ্বলোকে খণ্ডিত আত্মপ্রবঞ্চিত,
হে-ধূলির গ্রাস!

ঝরাপাতা

রবার্ট ফ্রস্ট

ঝরা পাতা চেঁছে তুলতে
কোদাল যা তাই চামচেও।
শুকনো পাতার বস্তা
বেলুনের মত হাল্কা।

সারাদিন আমি অবিরাম
মর্মরধ্বনি তুলি,
শশক কি মৃগ ধাবমান
যেমনটি তোলে পালাতে।

পাতার পাহাড় যা তুলি
এড়িয়ে আলিঙ্গন
বাহু বেয়ে বহে গিয়ে
মুখে এসে পড়ে কিন্তু।

ফিরে ফিরে আমি যত-না
ওঠাই নামাই বোঝা,
সারা চালাটাকে ভরলেও
আমার কি থাকে তার পর ?

ওজন বলতে শূন্য।
মাটির ছোঁয়ায় ক্রমশঃ
বিবর্ণ হতে হতে
রঙ আছে নামমাত্র।

কি কাজে বা তারা লাগবে!
তবুও ফসল সত্য।
কার হিম্মৎ বলবার
ফলন কোথায় থামবে ?

পরম্পরা

টমাস হার্ডি

আমি সেই মুখ—বংশের আদলে গড়া।

দেহ নশ্বর। আমার বিনাশ নেই।
কাল থেকে কালান্তরে
চিহ্ন আর চরিত্র করি প্রক্ষেপ,
দেশ থেকে যাই দেশান্তরে
বিস্মৃতি-পারাবার ডিঙিয়ে।

কালের ওয়ারিশ যে আদল
গড়নে, স্বরে আর দৃষ্টিতে
মানুষের আয়ুকে করতে পারে অবজ্ঞা
—আমি সেই।
মানুষের মধ্যে আমি সেই চিরন্তন
মৃত্যুর ডাকে যা বধির।

শান্তি

জেমস সি মরিস

অবিরাম যারা লড়ে এসেছে
প্রায় কুড়ি বছর
সেই আমরা, সৃষ্টি কাঁপানো সব শত্রুতা
দিয়েছি ঘুচিয়ে।

নতুন বিয়ে করা বরকনের মত আমরা ঘুমোই,
আর সোনালী সেই কথা বলি কানে কানে।
তবু তোমার মুঠোয় ছোরার হাতল,
আর আমার হাত তলোয়ারের কাছে।

জাপানী হাইকু কবিতা

১ বসন্তেব বাগানে যেখানে
কুসুমিত 'পীচ'-এ দীপ্ত পথ
সেখানে কে হেঁটে যায় মেয়ে।

—ইয়াকামোচি

২ সকালে অনেকক্ষণ
বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনি
ইজুমি নদীতে সব
মাঝিদের নৌকা বেয়ে যাওয়া।

—ইয়াকামোচি

৩ তুমি'ত আসোনা, আমি প্রশান্ত সন্ধ্যায়
মাৎসুয়োর তীরে বসে থাকি।
ওখানে জ্বলন্ত জল।
আমিও'ত তারই মত জ্বলি।

—ফুজিওয়ারা নো সাদাই

৪ শূন্য পাহাড়ে হরিণের ডাক এত ব্যাকুল,
প্রতিধ্বনিতে হরিণীই যেন সাড়া দেয়।

—ইয়াকামোচি

৫ দুদণ্ড শুধু দুজনে ছিলাম সঙ্গী,
ভেবেছি এ প্রেম হাজার বছর থাকবে।

—ইয়াকামোচি

৬ পাহাড়ে পাইন বনে, ঝরা পাতা নেই।
নিজের স্বরেই তবু বোঝে মৃগ
শরতের আগমনী।

—ইয়োশিনোবু

৭. গ্রীষ্মের ক্ষেতে আগাছার মত
রটনা বেড়েই চলে,
আমি আর প্রিয়া বাহুবন্ধনে সুপ্ত।

—হিতোমারো

৮. পলাতক এক ঢেউয়ের চূড়াই
যেন হিমে জমে গিয়ে
পাহারায় খাড়া সারসটি সাদা
বন্দর মোহানায়।

—সম্রাট উটা

৯. আসুকার স্থির জলে
কুয়াসা ঘনায়।
স্মৃতি অত সহজে মোছে না।

—আকাহিতো

১০. একাকী শুয়ে কাঁদার রাত
জানো কি কত দীর্ঘ?

—অধিনায়ক মিচিৎসুনার জননী

১১. পাহাড়ী গাঁয়ে পাতার রাশি
হাওয়ায় মর্মরিত
স্বপ্নসীমা ছাড়িয়ে কোথা গহন গভীর রাতে
হরিণ ওঠে ডেকে।

—মিনামোতো নো মোরোতাদা

১২. শরতের ঘাসে হাওয়ার ঝাপ্‌টা
শুভ্র শিশির কণা
চূর্ণ রত্নহারের মত ছড়ায়।

—বুণিয়া নো আসায়াসু

১৩. সরষে ফুলের তেপান্তরে
পুবে ও পশ্চিমে
চন্দ্র ওঠে, সূর্য ডুবে যায়।

—বুসন

১৪. দুরন্ত সাগর দূরে।
ছায়াপথ সাকোর শিখরে।

—বাসো

১৫. এ'ত সেই চাঁদ নয়
এ বসন্ত নয় আগেকার।
আমি শুধু আছি সেই এক।

—আরিওয়ারা নো নারিহিরা

প্রমেথিউস

গ্যয়েটে

মেঘ বাষ্পে তোমার আকাশ আবৃত করো জিউস্,
ছোট ছেলে যেমন করে ওক গাছে আর পাহাড়ের ওপর
কাঁটা গাছের মাথার ফুলের গোলক কেটে বেড়ায়
তেমনি করে তোমার গায়ের জোর ফলাও,
তবু, আমার এই পৃথিবী আর আমার এই কুটির
তোমায় দিতেই হবে রেখে।
এ কুটির তুমি নির্মাণ করোনি, আমার এই অগ্নিকুণ্ডও
—যার উত্তাপ তোমার ঈর্ষার বস্তু।
হে দেবতারা!
সৌরমণ্ডলে তোমাদের চেয়ে হতভাগ্য আর কিছু আছে বলে
আমি জানি না।
পূজার নৈবেদ্য আর প্রার্থনার নিশ্বাসই
তোমাদের রাজগৌরবের যৎসামান্য খোরাক।
শিশু আর ভিখারীরা যদি অমন আশার স্বপ্নে ভোলা
মূঢ় না হ'ত, তাহলে তোমরা থাকতে উপবাসী।

ছেলেবেলা কোথাও কোন কূল না পেলে
উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমি সূর্যের দিকে চেয়েছি,
যেন সেখানে কেউ কান পেতে আছে
আমার বিলাপ শোনবার জন্যে,
আমারই মত কোন হৃদয় সেখানে আছে
আমার দুর্দশায় আমায় করুণা করতে!

দাম্ভিক দৈত্যরাজদের বিপক্ষে
কে আমার সহায় হয়েছে?
কে আমায় রক্ষা করেছে মৃত্যু আর দাসত্ব থেকে?
হে আমার দীপ্ত পবিত্র হৃদয়
তুমি কি একাই এই অসাধ্য সাধন করো নি?
যৌবনের সরলতায় প্রবঞ্চিত হয়ে
ঊর্ধ্বাকাশের সেই সুপ্তিমগ্নকে
তোমার পরিত্রাণের জন্যে কৃতজ্ঞতা কি
তুমি বিকিরণ করো নি?

তোমায় আমি শ্রদ্ধা করব ? কেন ?
বেদনায় আমি যখন কাতর
তখন আমায় তুমি কি কখনো সান্ত্বনা দিয়েছ ?
যখন আমি শঙ্কাতুর তখন মুছে দিয়েছ আমায় অশ্রুধারা ?
তুমি ও আমি যাদের অধীন
সেই সর্বশক্তিমান সময় আর শাশ্বত নিয়তিই কি
আমাকে গড়ে তোলে নি মানুষ করে ?
তুমি কি ভেবেছিলে জীবনকে আমি ঘৃণা করব ?
আমার কুসুমস্বপ্ন সফল হয়নি বলে
পালিয়ে যাব অরণ্য গহনে ?
এইখানেই আমি থাকি আর মানুষ গড়ি আমার আদলে,
গড়ি এমন এক জাতি যারা আমারই মত দুঃখ পাবে আর কাঁদবে
উপভোগ করবে আর সুখী হবে আর তোমায় করবে আশীর্বাদ।

প্রথম দাঁত ওঠবার পর

মোটেট

জয়ধ্বনি করো। ছোট্ট দুধে দাঁতটি উঠেছে।
এসো মা, এসো বাড়ির ছোট বড় সবাই,
মুখের মধ্যে দেখো শাদা ঝিলিকটুকু।
দাঁতটির নাম দেবো সেকেন্দর।
লক্ষ্মী সোনা, ঠাকুর তোমার এ দাঁতটি যেন রাখেন,
আর তোমার ছোট্ট মুখটি যেন ভরে' সাজিয়ে দেন
ঝকঝকে দাঁতের পাটি
আর সে দাঁতে কাটবার কিছুর অভাব যেন কখনো না রাখেন।

কখনো মেঘ

মামলা

পোকাটা দেওয়ালে
নোংরা প্রাণের ফোঁটা,
কামনার চেয়ে কড়া তেষ্টায়
মোহিনী আলোর পলকের শুধু
হবে জ্বলন্ত জার।

সরীসৃপটা ঘৃণ্য ঠান্ডা হিংসে,—
বিদ্রুপ-কশা-রসনা গুটিয়ে
ওৎ-পাতা সংহার!

কি হবে হৃদয়, কি হবে?
রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত গোণা
শেষ হবে কি পরাভবে!

পোকা টিকটিকি দুই-এর মামলা দুনিয়ায়।
কার হয়ে বলো লড়বে?
কে আসামী কে যে বাদী না বুঝে-ই
কত ওকালতি করবে!

কালোয় সাদায় আলোয় ছায়ায়
নক্সা সাজাতে স্বখাত মায়ায়
কাটাকাটি ঢের করলে।
গহন গভীরে ডুব দিলে কত
তুহিন শিখরে চড়লে।
মানে তবু কিছু পেলে না।
হাঁ-এর না-এর মনগড়া আঁক
গোঁজামিল ছাড়া মেলে না।

কে জানে, বুঝি বা পোকা টিকটিকি
দুই নয়।
পর্দাটা ঠেলে উঁকি দেবে কত,
অজে-ই দেখো না অভিনয়!

লুপ লাইনের গ্রামটা

লুপ লাইনে যেতে হয় গ্রামটা,
—সবুজ শিরোপা বাঁধা তে-ঢেঙা তালের পাহারায়
শর-ঝোপের ফোয়ারা-তোলা, রাঙা মাটির ঢেউ-এ গড়ানো।
সেখান থেকে এনেছিলাম
এক বুক নিস্তব্ধতা
—শিরিষের ঝুমঝুমি-সীমের ঝর্ঝর
আর কচিৎ বন-ঘুঘুর গোঁয়ানিতে গাঢ়।

সেই মধুর মৌনের বুদ্‌বুদের মত স্বচ্ছ ঢাকনায়
নিজেকে রাখতে চেয়েছি ঢেকে।
কিন্তু ক'দিন বা রাখব!
চিড় ধরেছে এর মধ্যেই।
না, মোটরের হর্নে কি ট্রামবাসের ঘর্ঘরে নয়,
নয় মিছিলের হুঙ্কারে।
চিড় ধরেছে খবরের কাগজের খসখসানিতে
যা নিঃশব্দে চেঁচায়, সুর খোঁজে না,
যা খবর শোনায়, মানে চায় না।

খবরের কাগজের দুনিয়াতে-ই হবে থাকতে।
কত কি-ই না ঘটেছে আর ঘটবে,
রাজ্য ভাঙবে, রাজ্য গড়বে
মানুষের স্পর্ধা মহাকাশকে করবে ব্যঙ্গ,
শুধু লুপ লাইনের আমার গ্রামটার
সেই নিটোল নিস্তব্ধতা
কেউ বুঝি আর কোথাও ছাপবে না।

সাপ

প্রথম সাপ-টা দেখবে নিথর পাথর সম্মোহিত,
কোন সে আদিম অন্ধ অঘোর অন্বেষণের দ্বিধা
আঁধার-চোয়ানো ছায়া-বিদ্যুৎ হেনে খোলে কুণ্ডলী!

তারপর সাপ অনেক দেখবে
কেঁপে ওঠা শরবন।
কাঁটা দেওয়া ঘাস সভয়ে শুনবে
গোপন সঞ্চরণ,
—শোনা না-শোনার সীমানায় শুধু স্তব্ধতা শিহরিত।

সবশেষে এক সাহসী সকাল
গহন অতল থেকে,
হিমেল হিংসা ছেঁকে নিয়ে এসে
রোদ্দুরে মেলবে কি ?
ছন্দে মেলাবে ঘৃণা-পিচ্ছিল বিবরের
সরীসৃপের বিষফণা আর পাখীদের নীল মুক্তি।

দিনটা

ট্রাম-বাসের ঠাসাঠাসি
আর ট্রাক, মোটর, লরির
ধোঁয়া-ছাড়া ধুলো-ওড়ানো কাৎরানিতে
নোংরা নাট দিনটা
চেয়েছিল নিভাঁজ মসৃণতায়
রাত্রের আকাশে নিজেকে টাঙাতে
মনুমেণ্ট থেকে মেমোরিয়াল অবধি।

ছেঁড়া মেঘে জড়িয়ে গিয়েও
ক'টা তারার চুমকির নিখাদ স্নেহ
আর বাদুড়ের ডানার নিরুদ্বেগ মন্থরতায়
সে শুদ্ধ স্বচ্ছন্দ হয়ে গেল।

এসপ্ল্যানেডের রঙীন কটাক্ষ
হয়তো তাকে নাচাতে চাইবে।
কিন্তু গড়ের মাঠের পাড়-বসানো গাছগুলো
থেকে থেকে মৃদু মর্মরে
তাকে মন্ত্রণা দেবে এলায়িত প্রশান্তির,
যদি না হঠাৎ কোনো দমকলের ঊর্ধ্বশ্বাস ঘণ্টা
কোথাও সর্বনাশা আগুনের পানে তাকে ছোটায়।

আয়নায়

কখনো পিঁপড়ের দেখা
কখনো পাখির।
তাই নিয়ে গেঁথে গেঁথে
দুঃখ সুখ যন্ত্রণা উল্লাস
জীবনের বয়ন-বিলাস।

সে নক্সায় মনে হয়
নেই কোনো ফাঁক।
ছক কাটা তার রঙ দাগ,
তাই থেকে সোজা মানে খুঁজে
দিন রাত্রি এঁকে যাই
লাল নীল হলুদে সবুজে।

তারপর হঠাৎ অবাক,
দেখি নক্সা ফুটো ক'রে
কাগের বল্মীক
উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের কাছে
খুলে দেয় আর এক দিক।

সেখানে সঞ্চয়মত্ত
পিপীলিকা-মন দিশাহারা।
উধাও পাখির ডানা
সেখানে পায় না সুখে ছাড়া।

বিবরের দেখা নয়
নয় মুক্তি নীল শূন্যতায়।
নিজেরি স্তম্ভিত মুখ
দেখি আয়নায়।

ইস্তাহার

ধৈর্য ধরো।
এই সহরতলির ওপর একদিন কুয়াশা ছড়াবে রাত্রি।
মুছে যাবে ওই নোংরা সর্পিল গলি
আর ভীরু মিটমিটে বাতির পাহারা,
উপছে পড়া ওই ডাস্টবিন,
জংধরা টিন আর শ্যাওলা-ধরা ঘেয়ো সব কোঠার
উদ্‌ভ্রান্ত বিস্তার।

জ্যোৎস্নার নেশায় তখন মেতো না।
জপ কোরো বীজমন্ত্র
বিনিদ্র ওই স্তূপাকার ধূসরতার দিকে চেয়ে।
কে জানে, ওই কটু আর্দ্র কুয়াশায় গলে'
দেওয়ালে দেওয়ালে কণ্ডূতির মত
বিজ্ঞাপনগুলো হয়ত যাবে মিলিয়ে

—ক্ষীণ ক্রন্দন যার উত্তেজনাটুকুই
স্তিমিত অসাড়তার নিদান ও সান্ত্বনা।

তারপর রাত শেষ হবার আগে
একটি নির্ভীক আশা হয়ত চোখ মেলবে।
প্রথম কান্নার ছলে তার প্রচণ্ড ঘোষণাই হবে
আগামী সূর্যোদয়ের ইস্তাহার।

বারান্দা

ঘর বার শেষ করে' নয়,
হিসাবের জের থাকতে কিছু,
বুঝি বারান্দাটা।
ঝুলে থাকা ত্রিশঙ্কু-বিরাম।

চলা নয়, নয়ক থামাও।
চেয়ে চেয়ে দেখা, আর
কখনো বা জীবনের ঢেউ
একটু ফেনার ছিটে
দিয়ে যায় কৃতজ্ঞ হৃদয়ে।

এ বারান্দা একদিন
একা একা কেদারা-হেলান
কাউকে বসায়।

সংসার, বাজার, রাস্তা,
তা ছাড়িয়ে দূর তেপান্তর
আকাশের সীমায় উধাও,
সব তার চোখে মেলে দেয়।
কানে তোলে সমস্ত কল্লোল,
সে কল্লোলে তার কণ্ঠ নাই বা মেশাক।

হে নির্মম উদাসীন, হে মহাজীবন,
কোনদিন বরখাস্ত কারে-ও
সমস্ত কড়ার ভুলে
এই বারান্দায় যদি ফেলে রেখে যাও,
থাকবে না নালিশ।

শূন্যতার ভ্রূকুটির নিচে

আবর্তফেনিল প্রাণ অন্ধ বেগে আপনি বিফল
নিরালম্ব এ সেতুতে
পায় বুঝি উহ্য তার পদাঙ্ক-সংকেত।

হয়ত ত্রিশঙ্কু একা দেবতা-ঈর্ষিত।

পাঠোদ্ধার

মাঝে মাঝে হানা দেয়
বিনিদ্র প্রহরে,
স্মৃতির সীমান্ত থেকে
গাঢ়ছায়া হৃদয়ের অলিন্দে চত্বরে
জনান্তিক বাণী এক।
শব্দ নয়—স্বাদ যেন তার
শোনা, না-শোনার মাঝে অপ্সরা-ঝঙ্কার।

কথা কই অনর্গল।
ত্রস্ত-ব্যস্ত জীবনের ঊর্ধ্বশ্বাস মুখর প্রবাহ
প্রতিদিন আকাশ কাঁপায়,
কাগজে-কালিতে রেখে যায়
মলিন কলঙ্ক-রেখা

ছড়ানো জঞ্জালে আর
মসীলিপ্ত দেয়ালের গায়।

তবু এক নিশাচারী ধ্বনি
কোন লুপ্ত ভাষা হ'তে
উঠে আসে মৃদু দীর্ঘশ্বাসে,
নিভৃত স্নায়ুতে টানে—
আকাঙ্ক্ষা না শঙ্কার শিহর!

এ ধ্বনি কিসের? কার?
গুপ্ত কোন গর্ভগৃহে
ধ্বংসস্তূপে ছিল মূর্চ্ছাহত,
ব্রাহ্মী কি খরোষ্ঠী নয়
অপঠিত কাদের লিপিতে
শীতল খোদিত মৃৎফলকে!

কখনো মেঘ

জীবন ত' কত বার
কত সাধে খেলাঘর পাতে।
তারপর হেরে গিয়ে সময়ের হাতে
বিস্মৃতির পলিতে হারায়।
পলির জমানো স্তূপ
ফের এই আনমনা
নির্বিকার জীবনই মাড়ায়।

তবু এত ঘুম ঠেলে
প্রাচীন মুদ্রিত সেই ধ্বনি
কেন আজো চায় পাঠোদ্ধার ?
আনে কি সঙ্কেত কোনো
ঘোচাবে যা সময়ের
ফিরে ফিরে এ রূঢ় ধিক্কার।

লগন

নাম বললে চিনবে না'ত
দেখে থাকবে হয়ত।
সেই লোকটা সন্ধ্যেবেলা গড়ের মাঠে গিয়ে
একা একা বসেই থাকে,
এদিক ওদিক চেয়ে
মনুমেণ্টটা দেখে, দেখে চৌরঙ্গীর আলো
গাড়ি ঘোড়া মানুষ দেখে, শহরটা জমকালো।

খেলার মাঠের ভিড় ভেঙে যায়
ঝিমিয়ে আসে ফেরিওয়ালার হাঁক।
তবুও সে একলা বসে থাকে,
কাছাকাছি পেলে কাউকে
শুধোয় কখনো বা
বলতে পারেন, এখন 'কটা বাজে' ?

রাত বেড়ে যায়,
তারাগুলো সাহস করে চায়,
মাঠে মানুষ বিরল হয়ে আসে
ঠায় সে বসে থাকে একাই তবু।
দৈবাৎ কেউ কাছে এলে
একই কথা শুধোয়,
—এখন কটা বাজে ?

কেন যে চায় ঘড়ির খবর
কিসের প্রহর গোণে,
ধুলোয় ধোঁয়ায় হট্টগোলের নোংরা এ-শহরে
কি অঘটন ঘটার আশায় থাকে,
হয়নি জানা।

এক এক রাতে গড়ের মাঠের তরল অন্ধকারে
আচমকা তার 'কটা বাজে' প্রশ্ন শুনে-তবু
ভ্রম হয় যে
এই শহরের প্রাণ-পুরুষই বুঝি—
মহামুক্তি লগ্ন জানতে চায়!

হরিণ

আতঙ্ক অরণ্যকায়া
কবে লুব্ধ চেয়েছিল
ধরে রাখতে কোন এক সোণালী সকাল
গহন গভীরে অন্তরীণ!
সচকিত সে সকাল
মুক্তিব্যগ্র উদ্‌ভ্রান্ত শঙ্কায়
অতর্কিতে হ'ল কি হরিণ!

পলাতক সে হরিণ
—লঘু এক আর্ত স্বপ্ন-ধ্বনি
ছুটে চলে, শুধু ছুটে চলে,
কি র্মমর তুলে বন-তলে!
কখনো উৎকর্ণ থামে।
কোন দূর বিষণ্ণ আকাশ
দুনয়নে নামে।

কতনা কেটেছি বন।
বরাভয় বার্তা বয়ে বয়ে
কত পথ দিগন্ত ছাড়ায়,
তবুও হরিণ কেন
উর্ধ্বশ্বাস ছুটে ছুটে ফেরে
অন্তহীন অরণ্য-কারায়?

বনে নয়,
সে হরিণ

হৃদয়ের অন্ধকারে কখন এসেছে চুপি চুপি।
হিংসাকীর্ণ ভূমি নয়
বন্দী তারে করে রাখে
আমারই কি অভিমান
মহারণ্যরূপী।

পাবে

একদিন খুঁজে পাবে
একে একে সব ক'জনাকে,
যে নামে থাকুক,
ছত্রের মেলায় কিংবা
পাকদণ্ডী চড়াই-এর পথে
শূন্য-সিন্ধি-ধ্যানস্থ তীর্থের।

কেউ তারা চেনা নয়।
তবু মনে হবে
জীবনের বহু লেনদেন
কবে থেকে হয়ে বুঝি আছে।
কোন খাজাঞ্চির খাতা
টুকে রেখে দিয়েছেও সব।
বারে বারে দেখা শুধু
এ প্রাণের পরীক্ষা, উৎসব।

একজন কোথায় মেলায়
শুধু বুঝি রেজগি ভাঙায়।
পরিপূর্ণ হৃদয়ের দাম
খুচরোয় খণ্ড খণ্ড ক'রে
তুলে দেয় হাতে।
কিছু বা চলে না, কিছু
ক্ষয়ে ক্ষয়ে হয় অপচয়।
হৃদয় ভাঙাতে এসে
নিয়ে যাবে সংশয় ও ভয়।

বোঝা যে নেবেও তাকে
হয়ত চটিতে কোনো পাবে।
পথ সে দেখাবে,
—নিশ্বাস-ফুরিয়ে-আসা

বিরূপাক্ষ শিলারূঢ় পথে
আরণ্য-নিষেধ তোলা।
কখনো বা ভুলে
মেঘ-মায়া বিজড়িত
অতর্কিত অতল খাড়াই।

কে জানে কোথায় পাবে
আর সে জনারে!
এই সোজা সড়কেই যেতে পার ফেলে।
একবার দৃটি চোখ মেলে
কুতূহলে হয়ত চাবে সে!

তারপর ভিড় অগণন।
চিনবে কি, চিনবে কি মন?

কলধ্বনি

কান নাই পেতে রাখো,
শুধু যদি জেগে থাকো স্তব্ধ মধ্যরাতে,
ধ্রুব সব তারাদের নির্ভুল ইঙ্গিতে
হাল ধরে নৌকোর মাচানে,
হয়ত শুনতে পারো
হাঁসেদের কলরব
দূর কোনো নামহীন চরে,
হৃদয়ের নেপথ্যে বুঝি বা।

তোমার চিহ্নিত পথ মানচিত্রে আঁকা।
পণ্য নিয়ে নিয়মিত
আনাগোনা ঘাট থেকে ঘাটে
গঞ্জ থেকে আর গঞ্জে, হাটে।
তবু সেই ঝঙ্কৃত আঁধার
একবার যায় যদি কানে,
বিকল হ'তেও পারে, জীবনের দিশারী চুম্বক,
বাঁকিয়ে হালের টাল
ভোলাতেও পারে চেনা পথ।

তারপর
অতর্কিতে কখন যে নৌকো ছোঁবে হাঁসেদের চর!

কখনো মেঘ

অন্ধকারে কাকলি–মুখর
উল্লাস না যন্ত্রণার কি দুঃসহ দুর্বোধ প্রহর!

কেউ কেউ অস্থির কাতর
এই চর ছেড়ে আসে প্রাণান্ত–প্রয়াসে
গুটি কয় হাঁস নিয়ে শিকারের ছলে।
আর কেউ এই কলকাকলি–বিহ্বল
বাঁধা পড়ে থাকে সম্মোহিত।

ঋতুর অধ্যায় সায়,
হাঁসেরাও উড়ে চলে যায়।
ধু ধু শূন্যতায়
তবু সেই কলস্বর গেঁথে নিয়ে গহন সত্তায়
নিঃসঙ্গ সন্ধানী এক চর থেকে চরাচরে—
নিরুদ্দেশ ধ্বনি–ই ধেয়ায়।

জল্পনা

বুঝি বা নিত্যই এক, রোদ বৃষ্টি মেঘ ফুল পাখী।
চাবি দেওয়া যন্ত্র শুধু, ঘুরে যায় পাতা রাস্তা ধরে।
দেওয়ালে শ্যাওলা জমে, ধোঁয়া ওঠে কলের চিমনিতে।
কেউ মাঠে ঘাটে ঘরে ছাপানো কথা–ই ভেবে যায়,
অদল বদল একটু। কেউ তার শূন্যতাটা নিয়ে
রাস্তায় টহল দিয়ে অবশেষে ভীড়ে–ই মেশায়।

রঙ লাগায় ইতিবৃত্ত। তত্ত্বজ্ঞেরা দেখায় দলিল।
বুকে হাঁটা সরীসৃপ পাখা পেয়ে উড়ে এল কবে!
বন–মানুষের হাড় পোতা আছে মাটির গভীরে,
খুঁজে খুঁড়ে পাও যদি বিস্ময়ের নদী মিলে যাবে!
যায় তা কি? একঘেয়ে ঘোরানো সিঁড়িতে
হয়ত উঠছে সবই। কিন্তু সেটা সিঁড়ি কি না তাই
ঝাপসা চোখে কে বলবে? পাক খাওয়া প্যাঁচালো প্রগতি
সুরু আর শেষ যদি গোঁজামিলে দিয়ে থাকে জুড়ে!

তবু হাই ওঠে না'ক। দীর্ঘশ্বাস পড়িবেই বা কেন?
সাজানো ছকের ঘুঁটি। ওঠা নামা সমান অলীক।
কলেই ঘুরুক সব। পৌছোবার ভাবনা যদি ছাড়ো
নিষ্ফল নাগরদোলা দেখবে নিজে ঘুরেই মোহিত।

আরণ্যক

শিকার কোথায় শেষ ?
কত বন কাটা হোলো,
কত পশু সবংশে নিহত,
তবু চকচকে চোখ অন্ধকার বিদ্ধ ক'রে জ্বলে।
লকলকে জিহ্বা নিয়ে আসে
নিঃশব্দ সতর্ক পায়ে ভুলে-যাওয়া ভাবনায় তুলে'
সশঙ্ক মর্মর
—হিংস্র নিশাচর।

জড়াজড়ি গুঁড়ি ও শিকড়
যন্ত্রণা-জটীল যত ডালে ও লতায়
কাঁটার নিষেধ নাড়ে
কালো ভয়-ছোপানো পাতায়।
হাওয়া বয় গুপ্ত কোন হিংসার নিশ্বাসে।
সহসা স্তব্ধতা চূর্ণ কখনো কখনো,
উল্লাস না আর্তনাদে।
রোমহর্ষ আকাশে তারার।

এ অরণ্যে কোথায় মাচান
শ্বাপদের নাগাল ছাড়িয়ে'
যতই জঙ্গল কাটো
তেপান্তর বেড়া দিয়ে ঘেরো,
হৃদয়ের সীমা তারা আরো জুড়ে বসে থাকে বুঝি।
রাত্রির দুঃস্বপ্ন কাড়ে দিনেরও প্রহর।

আমাকে সনদ দাও
শান্তি, সুখ, শষ্যের গোলার।
থেকে থেকে শুধু শোনা যাক,
ঘরের লাগাও আদি অনুচ্ছিন্ন অরণ্যের ডাক ।

বিস্ফোরক

কত দীর্ঘ মন্থরতা,
কত বাঁক
কত না বেষ্টনী।
কোনো দিন হঠাৎ প্রপাত।

অবিশ্বাস্য মীমাংসার ছদ্মবেশ যেন অপঘাত।

সঙ্কীর্ণ হয়েও তাই
বহু শিখা-বিভক্ত জীবনে
পিছনে ফিরি না।

প্রাণের গভীরে জানি
গূঢ় এক বিস্ফোরক-বীজ
দিন গোণে সহিষ্ণু প্রত্যয়ে।
নুড়ি ও পাথর সব
নম্র হয়ে মেনে নিয়ে বয়,
নত হয় সবখানে
যত ধুলো মলা নিয়ে
নীরবে মলিন নিজে হয়।
মরু তারে শুষে নেবে,
মনে হয়, পথ ছেড়ে দেবে না প্রাকার।
কিন্তু সে দুর্জয়।
তারপর থরথর সৃষ্টি কাঁপে!
উন্মত্ত প্রহর!
উৎক্ষিপ্ত বিদ্রূপ শূন্যে
লজ্জা দেয় সূর্যেরে ভাস্বর।

ধৈর্য ধরো বিন্দু বারি।
তোমাতেই সূর্যের বিস্ময়
প্রলয়ের ভাষ্য রূপে
ভেঙে দেবে সমস্ত সংশয়।

অগাণিতিক

কষে ফেলে দেবে! অঙ্ক কি সোজা?
ধাপে ধাপে গরমিল।
কার্য কারণে বাঁধানো কি সব?
আগাগোড়া পঙ্কিল।

সে পঙ্ক ঘেঁটে পেলে বটে ঢের,
পদ্ম উঠেছে কিছু?
বিশ্ব হয়ত মুঠোয় মিলেছে,
আকাশ হয়েছে নিচু।

দেশ কাল সব ছাড়াতে ছাড়াতে
ছাড়াবে কি প্রাঙ্গন,
সীমার শাসনে প্রাণে প্রাণে যেথা
পরম আলিঙ্গন!

যত দূরে যাও, যা কিছু ছাড়াও
হৃদয়ের সেই নীড়
সব অভিমান শেষে যেন থাকে
আপন কেন্দ্রে স্থির।

সৃষ্টির কূট অঙ্ক মেলাতে'
অতল ধাঁধায় ঢুকে
যা কিছু পাও না, প্রাণের পাওনা
তাতে-ই যাবে না চুকে।

তার দাবী দাওয়া আরেক ভাষায়
হিসাব কিন্তু সোজা,
হাত দিয়ে হাত ধরাটুকু আর
মন দিয়ে মন বোঝা।

কঠিন গণিত নিজে-ই বেভুল
প্রাণের অবুঝ প্রেমে।
স্থির সূর্য-ই ঘুরে ঘুরে সারা
পৃথিবী রয়েছে থেমে!

অসীমতা ভুলে নীল হয়ে নেমে
আকাশ ধরারে ঢাকে।
সুগোল পৃথিবী কৌতুকে যেন
সমতল হয়ে থাকে।

সৃষ্টির মূল সত্য খুঁজতে
যত দূরে দাও পাড়ি,

প্রাণের ভিত্তি গাঁথা আছে জানি
মিথ্যায় মনোহারী!

নহবত

শুধু মাপামাপি নয়,

নয় শুধু ভয়ের প্রাচীর;
স্বার্থ সঙ্কীর্ণতা নিয়ে
নতমুখ লোভীদের ভীড়।

মৃদাশ্রয়ী জনতাকে
যে বন্ধনে বাঁধে প্রয়োজন
তার ঊর্ধ্বে সূর্যালোকে
হৃদয় মেলায় পৌরজন।

নিচে জীবনের স্রোত
সংসার বাজার রাজপথ।
ঊর্ধ্বে তার নীল শূন্যে
সুধার ফোয়ারা নহবত।

নিচে খণ্ড খণ্ড খোঁজা
ক্ষুধা আর লোভের সংগ্রাম
ওপারে সমস্ত ভুলে
সত্তা পায় সুরে তার দাম।

ছলনা

দশ প্রহরণ দশ হাতে ধরে দেবী
অসুর দলনী সাজো।
কেন এ ছলনা বারে বারে মহামায়া?
অসুর মরেনি আজো।
শ্বাপদ-ই তোমার বাহন করেছ, দেখি
হে নিখিল-বন্দিতা,
সংশয় হয় গোপনে সিংহরাজ
বুঝি অসুরের-ই মিতা।
এই শুধু আশা কখনো যদি বা ভুলে
এই অভিনয় বারেক সত্য হয়।
সহসা হাতের দশ প্রহরণ খসে'
সিংহ অসুর দুয়েরি দেখি বিলয়।

মেঘ হয়ে দেখা

নদীর মতন যাকে
পাকে পাকে জড়িয়ে জেনেছি,

তৃপ্ত জনপদ পেতে,'
প্রাণের সবুজ স্নেহ
চারিপাশে সযত্নে বিছিয়ে,
অধীর উদ্দাম
কখনো প্লাবনে তার
দুই কূল ভাসাই যত না,
অতৃপ্তি ঘোচে না তার,
সকাতরে আকাশে তাকায়।

এ নিবিড় আলিঙ্গনে
কোন খানে ফাঁক থেকে যায়।
মাটির পূর্ণতা সব
পায় যদি তবু শূন্য থেকে
নিরাসক্ত দূর ও দুর্বোধ
মেঘের আরেক জানা চায়।

নদী হয়ে যা দাও যা পাও,
হৃদয় পাবে না তার
মেঘ হয়ে না যদি তাকাও।

শব্দ

সারা দিন কথার জনতা
অস্বচ্ছ আবিল ঘূর্ণি গ্লানির জঞ্জাল রেখে যায়।
তারপর কখনো কখনো
ধ্যান গাঢ়
ধেয়ানের নীল নীরবতা।

একা একা
একটি হয়ত ক্লান্ত শব্দ তখনও খুঁজে ফেরে নীড়।
একটি কথার তারা চোখ মেলে প্রাণের গভীরে।
একটু মর্মর তোলে কোন দূর কান্তার স্মৃতির।
তারই মাঝে হৃদয়ের স্পন্দনে ধ্বনিত
সৃষ্টিমূল আকুলতা আজো অকথিত।

সমস্ত শব্দের মাঝে
যে বিদ্যুৎ-চঞ্চল শূন্যতা;
তাই যদি খুঁজে পাও
উদ্ভাসিত চেতনায় নিরর্থক সব মুখরতা।

সনদ

পাহাড় না হলে
পারবে কী নদী বহাতে!
নদী না বহালে
বন্যা ভাসাবে কি দিয়ে?
ঝোড়ো মেঘ তার বজ্রবাণী কি শোনাবে
বেড়া দিয়ে শুধু
হৃদয় রাখলে বাঁধিয়ে?

উচ্ছেদ করো
অরণ্য যদি হারাবার,
অতলে ডোবার
সাগর কোথাও না থাকে,
নিরাপদ দিন রাত্রিরা
কভু দেবে কি,
অজগর বাধা
যে সুধা লুকিয়ে রাখে?

কিছু সংকট-শিখর সুগম
কোরো না,
কটি অরণ্য থাক মৃত্যুকে
খোঁচাবার।
শহর ছড়াও
বাঁধানো রাস্তা বাড়িয়ে,
সে রাস্তা নয়
প্রাণের সনদ ঘোচাবার।

কারিগর

সমতল ক্ষেত গুটিয়ে নেবে কি ফের?
ঠেলে তুলে দেবে পাহাড় অভ্রভেদী?
ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নদীর সূত্রগুলি
সাজাবে আবার নতুন করে কি বেদী?

বিগ্রহ বহু গড়ছ ধৈর্য ধরে
চির-একাগ্র জীবনের কারিগর!
মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ছাড়িয়ে এসে

নৃসিংহ হয়ে বামণই বংশধর।

সূর্যের ঢেউ ছলকায় শুধু বহ্নি,
সেই আগুনেও কোথা ছিল এত খাদ!
বিগ্রহ যত ধ্যানের মন্ত্রপূত
বোধন না হতে, কেন তার অবসাদ!

আদি কারিগর মাটি ছেনে দেখো খুঁজে
প্রাণের মশলা কোথায় ভেজাল-মেশা।
সূর্য শুধুই দেয়নি হয়ত জ্যোতি।
হয়ত বাছাই করেছ–ই ভুল পেশা!

ছবি

একদিন এই ছবি
কে জানত, সকলকে এঁকে যেতে হয়,
—নিষ্প্রাণ বালির চড়া
মরা এক নদীর খোলস।
ওপারে প্রান্তর ধুধু
প্রখর রৌদ্রের ঘেরাটোপে
মূর্ছাহত।

এ ছবি অনেক হাতে
কতবার আঁকা হয়ে গেছে,
তবু সেই আশ্চর্য প্রেরণা
এখনো কিসের লোভে
জনে জনে এ ছবি আঁকায়!

কি সে চায়, এ ছবিতে?
একটি সবুজ ছিটে
জীবনের দৃপ্ত বিদ্রোহের?
এক ফোঁটা সাদা রং
—হাঁস নয়,
সব কিছু দিগন্ত–ছাড়ানো
দুঃসাহসী অক্লান্ত জিজ্ঞাসা?

শ্যেন

কোনো এক দুরারোহ হিম-শৈল-শিখরে এখনো
নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ এক সংগোপনে বাঁধে তার নীড়
চঞ্চু তার হিংস্র বাঁকা, চোখে তীব্র জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা
ডানা তার সুবিশাল আকাশের স্তব্ধতা-নিবিড়।

জনপদ নদী বন প্রান্তরের সব স্বাদ নিয়ে
কতকাল ফিরেছে সে উগ্র মূর্ত ঝটিকার বেগ
হেলায় ব্যাধের বাণ তুচ্ছ করে' দিগন্ত সরিয়ে
মিটিয়েছে সব ক্ষুধা জীবনের সমস্ত আবেগ।

তারপর কবে কোন বজ্রগর্ভ বৈশাখের মেঘ
প্রচণ্ড আহ্বানে তার প্রাণমূল ধরে নাড়া দিয়ে
চকিত বিদ্যুতে কি যে রেখে গেছে দুর্বোধ নির্দেশ
মৃত্যু আর জীবনের সব তুচ্ছ সীমান্ত ছাড়িয়ে।

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ আজো ডানা মেলে' কখনো কখনো
পার হয় অবিরাম গিরি বন মরু ও সাগর।
লক্ষ্য তার কি শিকার? শ্যেনদৃষ্টি তীক্ষ্ণ তৃপ্তিহীন
ধরণীর মানচিত্রে খোঁজে নব সত্তার আকর?

শূন্য

ছন্দ খোঁজে পদান্ত বিরতি,
গান খোঁজে ছন্দিত স্তব্ধতা।
প্রাণ চায় ধ্যানের আকাশ
যেখানে গহন নির্জনতা।

তাই বুঝি ঘরে জানলা রাখা,
জনপদ ছাড়িয়ে তেপান্তর।
জ্যামিতি-জটীল এ জীবন
তার ঊর্ধ্বে নীল অবসর।

আছে যা যা এ সৃষ্টি'ত তার
নাই দিয়ে মালা নিত্য গাঁথে।
কিছুই 'ত পূর্ণ হয়না'ক
শূন্য যদি না মেশাই তাতে!

তির্যক

নাক মুখ চোখ ঠিক
ভুরুর ভঙ্গিমা,
কপালের মসৃণতা
চিবুকের টোল।
সর্পিল আঁধার যেন
একমাথা এলোমেলো চুল!
নিখুঁত এঁকেও দেখি ভুল বিলকুল।

প্রাণ নেই বলে নয়।
কেন বা ছবিতে চাই প্রাণ!
প্রাণ'ত সময়-সত্য, জানে আদি জানে অবসান।
প্রাণ নয়,
শুধু এক পলকের মৃত্যু তার চাই।
যে মুহূর্তে এ সৃষ্টিতে
আমার দেখার বেশী আর কিছু নাই।

নিরুপায় অবিরাম বওয়া।
ফিরি না, ফেলে যা আসি ছুঁতে।
তবু নিয়তিকে
কখনো বিভ্রান্ত করি
ধারা ধরে' জমানো অচল
মর্মর মুহূর্তে।

পাশাপাশি চলি তবু
দুজনেই আদিগন্ত একা।
একবার চাই শুধু সে তির্যক দেখা,
—যে দেখে ও যারে দেখি
দুজনেই যে দেখায় মরে
টাঙানো যখের যাদুঘরে!

সীতা

তাই কি এ মাটি আজো
উথলায় লাবণ্যে শ্যামল,
অতৃপ্ত আকূতি মেলে'
ক্ষণশোভা পল্লবে কুসুমে?

এখনো দুখিনী তুমি নিয়তি-লাঞ্ছিতা
ধরণীর গূঢ় প্রাণ-পুত্তলিকা সীতা!

নারী 'ত আদিম সৃষ্টি,
চিরন্তন জননী ও জায়া।
তবুও অশ্রান্ত ধাতা গেঁথে গেঁথে আমাদের
সুপ্ত যত স্বপ্ন-চয়নিকা,
ধরিত্রীর গাঢ় গর্ভে রেখেছিল একটি মালিকা।

দেবতা মানুষ হয়ে সেই মালা পরেছে গলায়,
মানুষ দেবতা হ'তে তারে ফের দলে যে হেলায়।
পুরুষ চেয়েছে ছায়া
শাস্ত্র চায় ধর্ম-সহচরী।
হৃদয় যা চায় তার
অবজ্ঞায় শুখায় মঞ্জরি।

শুধু কেন ছায়া হ'লে, চির-মৌন আত্ম-বিলোপন!
হে জানকী, কায়া হলে
ভিন্ন জ্যোতি পেত এ জীবন।

পৃথিবী কর্ষণ করি প্রাণমূল্যে,
তবু অপহৃতা
আরবার হল-মুখে ফিরে কভু পাব সেই সীতা!

বাল্মীকি

অন্যেরা ফেনায় তুষ্ট,
খুশি থাকে রামধনু রঙে।
নির্যাস খুঁজেছ তুমি
আদ্যোপান্ত জীবনের
পঙ্ক পদ্ম সব কিছু দলে।

তাই ঋজু রেখা টানো,
কোনো দুর্বলতা যাকে টলাতে পারে না।
কঠিন গণিতে
সত্তা ও সত্যের দুই ভাজ্য ও ভাজকে
নিশ্চিহ্ন মিলিয়ে দিয়ে
অবশিষ্ট রাখোনি কোথাও
হৃদয়ের উদ্বৃত্ত কিছুই।

অস্খলিত তরুণী তোমার
দৃঢ় হাতে গড়েছে যাদের
তাদের রেখেছে বন্দী অলঙ্ঘ্য শাসনে
যে ধর্ম জানে না চ্যুতি তারি ধারণায়।

জীবন উদ্বেল হোক
হোক ব্যগ্র উদ্‌ভ্রান্ত হতাশ,
অশিথিল রশ্মি ধরে
তুমি স্থির কেন্দ্রের বিন্দুতে।

ওরা বলে অনুতপ্ত দস্যু রত্নাকর
ত্রাণ পেল আপনার
করুণায় আর্দ্র আদি শ্লোকে।
সে করুণা তবে বুঝি
শুধু ক্রৌঞ্চ-মিথুনে নিঃশেষ।
তপস্যার নির্দয় বল্মীক
সব ধূলিসার করে'
রেখে গেছে শুধু কচি নীতির নিরিখ ?

তা'ত নয়, জানি, জানি।
বিধাতার মত
আপন সৃষ্টির সত্যে তুমি শৃঙ্খলিত।
জীবনের বিমূঢ় ব্যথায়
দস্যুর অন্তর কাঁদে
ঋষি নিরুপায়।

মেঘটা

নাই দিও না, মেঘটা শেষে
চূড়োয় গিয়ে চড়বে।
যতই করো সাধাসাধি
গলবে কি আর ? নড়বে !
গলবে না সে গলবে না,
টঙ্ থেকে তার টলবে না।
বরফ হওয়ার গরমে কি
মাটিতে পা পড়বে !

দেবে না জল, চাতক কিংবা
চাইলে চষা মাঠ।

তুষার–সাদা হ'লেই ভোলে
তুচ্ছ ওসব পাট।

জল হয়ে আর ঘামবে না।
মাঠে কাদায় নামবে না।
চূড়ান্ত সাধ মিটিয়ে শুধু
স্বপন–গড়ই গড়বে।
নাই দিও না মেঘকে কোনো,
চূড়োয় গিয়ে চড়বে।

রঙ্গ

এ তো বড় রঙ্গ যাদু
এ তো বড় রঙ্গ!
নিজেই আগুন জ্বেলে
আবার
নিজেই হই পতঙ্গ!
ওপর তলায় আসর মেলা।
চলছে সতরঞ্চ খেলা।
ঘুঁটি কিন্তু নীচের তলায়
যা নড়ে তার ব্যঙ্গ!

এ বড় আফ্‌শোষ যাদু
এ বড় আফ্‌শোষ!
এমন জমি চষি,—
ফসল আগাছায় আপোষ!
বিনা ফাঁদেই ধরি পাখী
শিকল দিয়ে বেঁধে রাখি,
শিকল কেটে যায় না উড়ে
মানেও নাকো পোষ!

এ তো বড় ধন্দ যাদু
এ তো বড় ধন্দ!
তরী হওয়া
শিকড় গাঁথা তরুরই
নির্বন্ধ!
নাও ভাসিয়ে তুলে দি পাল।
ঘাট খুঁজলেই যত বেচাল।

হাল ছাড়লেই পালে লাগে
বাতাস মৃদুমন্দ।

এ বড় আশ্চর্য যাদু
এ বড় আশ্চর্য।
সিঁধ না কেটে নিজের ঘরের
মেলেনা তাৎপর্য।
প্রাণের এমন তেজারতি
না হাতালেই অধোগতি।
শোধ লাগে না সুদ বাড়ে না
করো যতই কর্জ।

লঙকাভাগ

মিঠে জলের দেশেরে ভাই
নরম মাটির দেশে
ক্ষুদে ক্ষুদে লঙকাগুলো
দারুণ সর্বনেশে।

নধর মিঠে চেহারা, রঙ
দেখতে একটুখানি,
খোঁচা একটু দিলে কিন্তু
চক্ষে ঝরায় পানি।

বাঘ মানে না সাপ মানে না
ফিরিঙ্গি মগ ছার।
অনেক মরদ এলো গেল
সাত সমুদ্দুর পার।

নরম মাটির জলই মিঠে
লঙকা আগুন ঝাল,
কপাল দোষে ঝালই বুঝি
হয়েছে তার কাল।

এই লঙকা খুঁচিয়ে যারা
জ্বালায় মরে জ্বলে,
লঙকা নামের বালাই তারা
ঘুচিয়ে দেবে বলে।

কেউবা তোলে মাঝখানে কোপ
কেউ বা দুটি ধারে
ওদিক থেকে মামাও ওৎ
পাতেন আড়ে আড়ে।

অনেক মন্দ দ্বন্দ্ব যখন
লঙ্কা কুটতে কাৎ,
আসেন মামা কালনেমি কি
করতে বাজি মাৎ ?

হায় গো মামা জানে না'ত
লঙ্কা এযে ধানী
চিড়বিড়িয়ে শেষকালে চিড়
খাবে কি রাজধানী!

মামা গো মামা কালনেমি
ভোলো লঙ্কা ভাগ।
কেঁচোর মত ঠান্ডা ও যে
খোঁচালে কালনাগ!

রোগ

হয়ত শুধু নাকালই সার
হয়ত মিছে যন্ত্রণা,
শুনতে তবু যেও নাকো
হিতৈষীদের মন্ত্রণা।

চরকা নিজের থাক্‌না তবু
পরের জন্যে তেল মাড়াও।
ঘরে খেতে পাও বা না পাও
বনে গিয়ে মোষ তাড়াও।

হোক্ না এ রোগ চিরন্তন।
পরের হাঁড়ি পুড়লে চাগে
কাঠি নাড়ার কণ্ডূয়ন।

কিস্তি যদি নাও বা ডোবে
কড়ির বেলা বঞ্চনা।
খেয়াপারের বরাত নিয়ে

মিলবে শুধু গঞ্জনা।
কানা ভেবে পথ দেখাতে
নিজের চোখে-ই দেবে আঙুল
ভুল ভাঙাবার নেই যে ক্ষমা
জেনেও তবু ভাঙবে কি ভুল।

হাসুক না সব বিচক্ষণ।
সাগরে নুন ছাঁকতে গিয়ে
চোখের জলে-ই ঝরুক লবণ।

হাওয়া কি ঝরায় মন

হাওয়া কি ঝরায়, মন?
শুধু শুক্‌নো পাতা।
শূন্য ডালে নাড়া দিয়ে
কিছু কি বলে না?
কতদিন আগে ছিল চেনা।

বৃষ্টি কি ভেজায়, মন?
শুধু তপ্ত মাঠ।
ঝরঝর ধারে আর
কিছু বলে যায়?
চিহ্ন তার খুঁজো না ধূলায়।

আলো কি দেখায়, মন?
শুধু শূন্য পুরী।
বিজন চত্বরে লেখে
ছায়া-লিপি কোনো?
মিছে আর দিন শুধু গোনো।

রাত্রি কি চেনায়, মন?
শুধু দূর তারা।
স্তব্ধতায় তোলে না কি
কোন ক্ষীণ স্বর?
শুধু বুঝি স্মৃতির মর্মর।

গরমিল

সোজা করে তীর অনেক ছুঁড়েছি
দেখি যে গিয়েছে বেঁকে।
মুছে একেবারে ফেলেছি যা ভাবি
চিহ্ন গিয়েছে রেখে।
ছেড়েছি তাইতে পণ।
হিসাবের ছকে যতই ফেলি না
ধরবে না এ জীবন।

বেণুবন চায় ঋজু সরলতা
হাওয়ায় তারে নোয়ায়
কঠিন দৃঢ়তা ধ্যান করে' গিরি
নির্ঝরে গলে যায়।
বুঝতে চাই না মানে।
গরমিল আগাগোড়া প্রাণে আর শাস্ত্রের অভিধানে।

পঁচিশে বৈশাখ

বলেছিলে 'নাই বা মনে রাখলে
সে কথা যে মিথ্যে তা' ত জানতে।
মনে কেন মর্মে আছ,
গহন গভীর উৎস হতে
ছড়িয়ে আছ শেষ চেতনা-প্রান্তে।

আছ প্রাণের পরম ক্ষুধায়
নয়ন-শ্রবণ-ভরা সুধায়।
এই জীবনের প্রতি পাতায়
নিত্য তোমার সই থাকে।

দিয়েছ সুর দিলে ভাষা,
আকাশ লোভী অসীম আশা।
প্রণাম লহ মুগ্ধ মনের
আজ পঁচিশে বৈশাখে।

রবীন্দ্রনাথ

মাটি আর মাটি নেই
আকাশের মেঘ শুধু মেঘ।
যা কিছু দেখি বা শুনি
হৃদ্-স্পন্দন পেয়ে মন্ত্রে কার
হ'ল সব বাঙময় আবেগ।

বৃষ্টি জানি তৃপ্ত করে তৃষার্ত মৃত্তিকা,
সূর্য দেয় আলো।
জাহ্নবী যমুনা আনে
হিমগিরি হতে আশীর্বাদ।
সব দেওয়া তাতেই ফুরালো।
তুমি আরো কিছু দিলে,
অনির্বাণ আরেক আকৃতি,
—সমস্ত তমিস্রা ঠেলে
প্রপঞ্চের প্রাণ খুঁজে ফেরা
দুঃসাহসী দ্যুতি।

সে দ্যুতির স্পর্শ লেগে
এ সৃষ্টিও হ'ল মধুময়,
এ জীবন শাশ্বত প্রভাত!
সত্তার গহন কেন্দ্রে
সুপ্তির জড়তা দাও ভেঙে
হে রবীন্দ্রনাথ!

জ্যোতির্বন্যা

মানুষের ইতিহাস
লোভ হিংসা গ্লানিতে ফেনিল
ক্ষুব্ধ স্রোতে বয় দিশাহারা
যুগ হতে ব্যর্থ যুগান্তরে।
কখনো আবর্তে বন্দী
কখনো বা ক্ষণিক প্রপাতে
ঝাঁপ দিয়ে শূন্যতায় অপঘাত-ই বরে।

তার-ই মাঝে মহালগ্নে কোনো
অকস্মাৎ আকাশ ভাস্বর
জ্যোতির্বন্যা ধরণী ভাসায়।

প্রাণের আকুল ঊর্মি
শুদ্ধ মুক্ত সে আলোক-স্নানে
পেতে পারে সিন্ধু-সত্তা
খুঁজিছে যা অন্ধ হতাশায়।

সেই জ্যোতির্বন্যা তুমি
হে রবীন্দ্র মহাকাশ-দূত!
এনেছ অমৃত-বার্তা
যার লাগি চির পিপাসিত
মৃত্যুমগ্ন মাটির বুদ্বুদ।

পৃথিবী পবিত্র হবে?
ইতিহাস খুঁজে পাবে পথ?
সাড়া দেবে শঙ্খনাদে
বাজায় যা ভবিষ্যের মূর্তমুক্তি প্রাণ-ভগীরথ!

নাম

সব কথা স্তব্ধ হলে
দেখি এক পবিত্র যন্ত্রণা
সৃষ্টিমূল থেকে তরঙ্গিত
সময়ের শূন্যপটে
এঁকে যায় জ্বলন্ত বিস্ময়।
আনন্দাৎ এব খল্বিমানি—
জেনেও তা রক্তাক্ত সংশয়।

নিজেকে তা মাটিতেই বাঁধে
কথা সুর ছবি হয়ে
সকলের সাথে হাসে কাঁদে।
তবু অনির্বাণ
সত্তার অতৃপ্ত প্রশ্ন বিদ্রোহের যন্ত্রণাবিধুর
উদ্‌ভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ যুগে কখনো হয়ত
নাম নেয় রবীন্দ্র ঠাকুর।

নদীর নিকটে

ওল্টানো দূরবীনে

পৃথিবীতে আগে নাকি বড় স্বাদু শান্ত ছায়া ছিল
সুশীতল অন্তরে প্রান্তরে!
কাদম্বরী, মেঘদূত, পাণ্ডুচ্ছায়োপবন বৃতয়ঃ কৈতকৈঃ.
বসন্তসেনার চোখে মাদকতা
তাও যেন মাধবী সুষুপ্তির,
উজ্জয়িনী অবন্তীতে শ্যামলিমা নাগরিক মনে,
দুষ্যন্তের লাম্পট্যও গরীয়ান রাজ-সমারোহে।

বিস্মৃতির অস্ত আভা
চিরদিন অতীতকে মায়ায় ছোপায়।

সময়ের ওল্টানো দূরবীনে
একদিন আমাদেব এ শহরও হবে বুঝি
সুদূর মধুর।

আর সব মুছে গিয়ে
জাগবে শুধু গম্বুজ, মিনার,
রেস কোর্স, রেড রোড, ইডেন গার্ডেন
মেমোরিয়্যাল থেকে মনুমেণ্ট,
হাওড়া ব্রীজ,—ইস্পাতের লেস্ যেন আকাশ-গ্রীবায়
এই শুধু ঝলমল স্বপ্নাতুর আচ্ছন্ন আলোয়।

প্রত্যহের প্রাণ-পণ্য খোঁজা
কাতারে কাতারে এই আমি
রাস্তায় ফুটপাতে,

বিলুপ্তির প্রান্তে ঝোলা
ট্রামে, বাসে, ট্রেনে,
এ আমার সংশপ্তক শুষ্ক রক্ত চোখ,
মোহাঞ্জন চক্ষে মাখা কোনো প্রত্নবিৎ
বলবে নাকি ছিল গাঢ় আবেশ রঙীন?

মস্ত বড় বাজারের যত সব সর্পিল গলিতে
চোরাই বিবর থেকে
যে সমস্ত লক্‌লকে জিহবার লেহনে
আমাদের সময় পাণ্ডুর,
সব বুঝি ভুলিয়ে দেবে মেকী রূপকথা
উচ্ছ্বাসে ভেজাল!

নদীর নিকটে

বদ্ধমুষ্টি এ আমার নিরুদ্ধ হুঙ্কার
শোনাবে কি স্বকালের স্তুতির মতন?
হায়, অন্ধ মূঢ় ভীরু কাল
আত্মপ্রবঞ্চক!

চৌরঙ্গী

বাস থামলেই হাঁক শুনবে,
চৌরঙ্গী।
নামতে পারো,
বদল যদি করতে চাও ত' তাও,
চার তরফেই রাস্তা খোলা—
সাগর পাহাড় অরণ্যে উৎসুক।
মন চাবে না, ঘুরতে হবে
হুকুম মেনে হলদে, সবুজ, লাল,
অনেক জনের মাঝে কেউ-না হয়ে।

অন্য কোথাও পালিয়ে যাবো,
সবাই ভাবে,
দার্জিলিং কি দীঘা, পুরী
প্রয়াগ, হরিদ্বার
কিংবা আরো সুদূর কোনো
শুদ্ধ নির্জনতায়
ডালহাউসি, কুলু কি আলমোড়া।

যেখানে যাক,
পেট্রোল আর ডিজেল-ধোঁয়ার
খুনে গন্ধ পাপের মত টানে,
সঙ্গে ফেরে রক্তে বিষের মত,
চৌরঙ্গী!
যেখানে রোজ
কেউ-না হবার ঢালাও নিমন্ত্রণ,
'আমি-তুমি'র শূন্য খোলস
ভরাট করে রাখা
ঝলমলানো নিয়ন-বিজ্ঞাপন।
চৌরঙ্গী!
দুনিয়া খুঁজে যেখানে যাও,
ইতিহাসের একই অবোধ করুণ ঘূর্ণিপাক!

এই ঠিকানায় ফুরিয়ে গেল,
ভাবী কালের ডাক?

সর্পযজ্ঞ

এখন উদ্যত অসি
কলম ও বল্লম!
এবার ঘৃণা-ই হোক
প্রাণবায়ু নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে!

হিংস্র হও দুর্নিবার,
ঘৃণ্য ক্রূর শঠতার
কণ্ঠনালী ছিন্ন করে' শাণিত নখরে
উদ্গাত রুধিরে উল্লসিত।

আমার এ সত্তা নয়
শুধু স্নিগ্ধ মাধুর্যে সার্থক।
শুধুই উদার প্রীতি, তিতিক্ষা, করুণা,
নয়ক সন্তোষ শুধু নিরাপদ নির্বীর্য শান্তির।

হিংসা ও জীবন-সত্য,
—যে হিংসা জানে না ক্ষমা
মিথ্যার পাপের
দয়াহীন দুষ্কৃত দলনে।

দৃপ্ত হও, দীপ্ত হও, হও ভয়ঙ্কর।
রেখো জ্বালামুখী উৎস
বুকের গভীরে,
রুদ্র রোষ-বহ্নি-স্রোতে

নিমেষে যা পাপচক্র
ভস্ম করে প্রলয়-দাহনে।

শতাব্দীর সর্পযজ্ঞে
দনুজ-বিনাশ ব্রতে
দীক্ষা নাও আহিতাগ্নি বীর।

এই আকাশ অন্ধকার

একটি মানুষের মধ্যে আমি
　　　　এক আকাশ অন্ধকার দেখেছিলাম।

কতজনের সঙ্গেই'ত মিশি,
ভালবাসি, ঘৃণা করি, থাকি উদাসীন।
তারা সব টুকরো টুকরো আলো
　　　　　　　　উজ্জ্বল কি স্তিমিত।

তাদের চেনা যায়, পড়া যায়
　　　　মানেও পাওয়া যায় ছাড়াছাড়া।
তাদের সঙ্গে পরিচয় দিয়েই
জীবনের প্রাঞ্জল পুঁথি প্রতিদিন লেখা।
কিন্তু মন নিজের অগোচরে
　　　　খোঁজে সেই অনাদি আশ্চর্য অন্ধকার
সব অভিধান যেখানে অচল, সব নামতা নিরর্থক।

সেই এক আকাশ অন্ধকার
　　　　আমি পেয়েছিলাম একবার
পথে যেতে কোন এক স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে
　　　　দুপুর রোদে গাড়ির জন্যে দাঁড়িয়ে
　　　　দুটি অতল চোখের মধ্যে।

সে পুরুষ কি নারী
　　　　কেউ যেন জানতে না চায়,
জানতে না চায় কি তার বয়স।
সে সময়ের অতীত, যৌনতার ঊর্ধ্বে।
তার অন্ধকার'ত না-এর শূন্যতা নয়,
নীহারিকা-গর্ভ এক রহস্য-নিবিড়তা।

সত্তার গহনে এই অন্ধকার যদি লুপ্ত হয়,
　　　আমাদের সাজানো শহর
　　　আর সফল জীবন'ত শুধু
　　　　　　　পরিসংখ্যানের অঙ্ক।

এত খণ্ড খণ্ড আলোর জটলায়,
এত মাপজোকের দুনিয়ায়
　　　সেই অন্ধকার বয়ে বেড়াবার মানুষ
　　　　　　কি সব ফুরিয়ে গেল!

স্বরগ্রাম

নিবিড় ঘুমের ঘেরাটোপ।
সত্তার সেই নীরন্ধ্র নিশা বিদীর্ণ-করা
যন্ত্রণার এক তড়িৎ-তরঙ্গে
সহসা উৎক্ষিপ্ত হলাম
কোন্ কুজ্ঝটি-বিহ্বলতায়,
চূর্ণ বিচূর্ণ সমস্ত চেতনামূল
সেখানে ছত্রাকার।
হারানো ছড়ানো সেই চৈতন্যের ঘুঁটি
খুঁজে সাজালেই কি মিলবে
জীবনের গহন ছক?

অসহ যন্ত্রণা আর উত্তাল উল্লাস
মিলেছে শেষে বোধ-বৃত্তের এক বিন্দুতে।
সেই বৃত্ত ধরেই পরমায়ুর পরিক্রমা।

অবলুপ্তির বেদনা-সীমা থেকে
রোমাঞ্চের শীৎকার-শিখর পর্যন্ত
অনুভবের স্বরগ্রাম সাধা।
সে স্বরগ্রাম তবু সংগীতে কি সত্যি পৌঁছোয়?

জীবনের ছন্দ আর মিল খোঁজা
হয়ত মিথ্যা,
মিথ্যা তার অর্থ খোঁজা।
এ শুধু নশ্বরতার বিলাস আর সান্ত্বনা।
জীবনের মর্ম সব সাজানো ছকের বাইরে।

সাক্ষী

রাতের অন্ধকার
কখন নামিয়ে দিয়েছে জানি না,
নদী দিয়ে বিনানো
ঝাপসা বিবর্ণ এই শহরে!
বিরল স্তিমিত তার কটা আলোয়
ছিল যেন ক্ষীণ একটি মিনতি।

সকাল হতেই বুঝলাম
এই নদী আমায় খুঁজছে,
আর এই শহর।

নদীর নিকটে

পাথর-বাঁধানো, পায়ে পায়ে পিছল গলিটা
সাহস করে মুখ বাড়িয়েছে
সদর রাস্তার নোংরা কোলাহলে
শুধু আমায় ইশারায় ডাকার আশায়,
ইনিয়ে বিনিয়ে তার সাবেকী সমারোহ
আর হালের হেলাফেলার কথা শোনাতে শোনাতে,
কোথাও ভাঙা ধ্বসা মন্দিরের গায়ে
কোথাও পুরানো বট অশথের শিকড়ে
হোঁচট খাইয়ে,
সময়েব উজান বেয়ে নিয়ে তুলতে
সেই বাঁধানো ঘাটটার চত্বরে,
খাড়াই যার ধাপগুলো
অনেক নিচেব নীল জলের ধাবায়
এখন নামতে ডরায়।

কি বলবে আমায়
এই ফুরিয়ে-আসা নদী,
এই ভুলে-যাওয়া শহর?
নক্ষত্রলোক ছাড়িয়ে যেতে চাও, যাও,
ভেদ করো পরমাণুর রহস্যপুরীর রুদ্ধদ্বার
তবু দূর আর নিকটের দুই অনন্ত,
যদি না মেলে
হৃদয়ের সেতুবন্ধনে,
বিস্ময়েব বর্ণালীতে
নশ্বরতা না হয় বিচ্ছুরিত,
কঙ্কাল-সাক্ষীই হয়ে থাকবে শুধু
আমাদের মত
বিলুপ্তির উদাসীন মরু প্রান্তে।

অকীর্তিত

নাই হ'ল কীর্তিধ্বজা
শূন্যে আস্ফালিত।

সন্ধ্যার আকাশ থেকে
তুমি আমি রোজ
একটু করে ধোঁয়া আর
এক ছিটে কালি যদি মুছি,
প্রিয় নদীগুলি থেকে

তুলি নিত্য কিছু পঙ্ক
কিছু বা জঞ্জাল,
আর যদি চোখ থেকে
পবিত্র কান্নায়
ঘৃণা আর হিংসার কণিকা
ধুয়ে ফেলি কখনো কখনো,
তা হলেই পৃথিবীতে কোনো জন্ম বিফল হবে না,
কোনো মৃত্যু অনিশ্চিৎ
আতঙ্কে প্রস্থান।

অকীর্তিত এ ব্রত কে নেবে?
শুধু কি যৌবন?

শিথিল হোক না পেশী
নিঃশ্বাসের বুক সঙ্কুচিত
পায়ে পায়ে বাধা দিক পথ,
তবুও হৃদয় যার
সকালের শপথে সজীব
তাকেও হয়তো পাবে
নামহীন এ দীন মিছিলে।

সময়

চোপসানো,
কোঁচকানো
বাঁকানো
তিনটে বুড়োকে আমি দেখেছি
পার্কের বেঞ্চিতে
মুখোমুখি বসে ঝিমোতে,
রাস্তার বাতি জ্বলে ওঠার আগে
আকাশের ধোঁয়াটে বিষণ্ণতায়।

তিনটে বুড়োর আলাপ আমি শুনেছি,
—বাঁধানো দাঁতের কি ফোকলা মুখের
আলগা ফসকে যাওয়া কথা।
জীবনকে এরাও ভেবেছিল, কষে ফেলেছে!
আশ্বিনের নরম সোনালী একটা সকাল,
কখনো ফাল্গুনের হাওয়ায় মাতানো কটা রাত

কিংবা শ্রাবণের
ঝিমঝিম কোনো আবেশের অবসর
পুরানো বইএর ভাঁজে ভাঁজে রাখা
শুকনো বিবর্ণ পাপড়ির মত
এদের স্মৃতি থেকে গুঁড়িয়ে ঝরে পড়ে,
আমি জানি।

সময় তাই হাসাহাসি করে
তিনটে বুড়োকে নিয়ে।
তা করুক।
দামটুকু শুধু দিক
জীবনকে কষতে চাওয়ার সাহস
আর শাস্তির।

কলম

ভয় করে না কবিতা লিখতে বসতে?
কলমটা হঠাৎ অবুঝ বিদ্রোহে
বল্লম হতে চায় কি,
—যে বল্লম নিবিড় কালিমায় জমাট
জন্মরাত্রির হৃদয় বিদ্ধ ক'রে
ফিনকি দিয়ে আলোর ফোয়ারা ছোটাবে?

বেশ তো পারা যায় থাকতে,
নিজের মাঝেই মগ্ন
পিচ্ছিল আত্মরতির বিকারে,
নির্বীর্য জরার বেহায়া বিলাপও যাতে
সাজানো শব্দের কারিকুরিতে ভরিয়ে
মাসিকে সাপ্তাহিকে লেপা যায়।
ভারী ভারী কেতাব লেখা হবে কত
তার কালোয়াতি নিয়ে,
নাক উঁচিয়ে ফিরবে কর্তাভজা নকলনবিসেরা
নিজেদের নীরক্ত মেকী নৈকষ্যের
অসার গোষ্ঠীগর্বে।

বেয়াড়া এই কলমটা
পাথরের দেওয়ালেও মিথ্যে মাথা কুটে
তবু কি তুলতে চায় সেই স্ফুলিংগ,
যা সুপ্ত বারুদ খুঁজে ফিরবে

আপামরের বুকে
আগামী বিস্ফোরণের আশায়?

শপথ

মনে করো দেখেছ কোথায়
পৃথিবীর দগ্‌দগে ক্ষত,
উরুতে, নাভিতে, বুকে,
উৎপাটিত চোখের কোটরে।
উন্মাদ গ্যাংস্টার এসে
পাশব তান্ডবে,
পবিত্র প্রসূতি মাটি
হত্যা করে পীড়নে, ধর্ষণে।

ক্ষমা নেই এ পাপের।

মনে রেখো, মনে রেখো
ভুলো না শপথ
সাক্ষী যার মহাকাল
সাক্ষী মানবতা,
—চামড়ার রং নয়,
শ্বেত কৃষ্ণ পীত
হৃদয়ের কালো রক্ত যেখানে যত না,
নিংড়ে ফেলে দিতে হবে
শেষ বিন্দু
হিংসাজীবী দানব দম্ভের।

চক্রান্ত

আমিই শাসন,
আমিই বিদ্রোহ।
শিরায় শোণিতে মজ্জায় অস্থিতে
নিজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বেড়াচ্ছি বয়ে
কখনো গোচরে কখনো অগোচরে।

এই চক্রান্তই আমার ইতিহাসকে ছোটায়
বাঁধন আর ছুটির ঠোকাঠুকিতে।
দৃষ্টির গহনে আমার
এই চক্রান্ত-ই লেপে দেয় তার ছোপ।

সে ছোপ মুছতে পারলে
পৌছোতাম বুঝি
এ সৃষ্টির সব ধাঁধার পেছনে
কে চায় ধাঁধার উত্তর ?

বিস্ফোরণ

কমজোর বিজলীর বাতি
বাড়ন্ত বিদ্যুতে।
ম্যাড়মেড়ে আলোয়
রুগ্ন মেঘলা অন্ধকার
বিষণ্ণ পান্ডুর,
নোংরা রাস্তা কাদায় প্যাচপেচে।
কোথাও মানুষ নেই।
অগুণতি সত্তাব পিন্ড
চটকে মেখে শশব্যস্ত কাল
ফুট্‌পাথে ট্রামে ও বাসে
লেপ্‌টে কিংবা ঠেসে দিয়ে নাড়ে।
অত ঘন ঘেঁসাঘেঁসি
ঠাসবুনুনি জনে জনে—তাই
পবস্পর কি দুস্তর দূব!
হঠাৎ আঁৎকানো হাঁক,
বোমা! বোমা!
এক সাথে শাসন বিদ্রোহ
ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাস।
সময়! সময়!
কত বিস্ফোরণ চাই
এ প্রাণেব পরিসর একটু বাড়াবার ?

দু পিঠে

সব মেঘ সরে যায়
সব বৃষ্টি একদিন থামে।
প্রচণ্ড দিনের দাহ
ভুলিয়ে দিতে অনিবার্য গাঢ় রাত্রি নামে।

জীবন তা বলে শুধু
এই নিত্য দোল-খাওয়া
ছন্দ মাত্র নয়।
নদীর মতন শুধু
কোন দু'টি তীরে বাঁধা
বয় না সময়।

যা দেখি যা জানি তার নিচে
প্রাণের খোদাই চলে
মহামুক্তি মন্ত্র খোঁজা
সংগোপন সত্তামূল বীজে।

জানি তাই গভীর গহনে।
সময় প্রবাহ নয় শুধু।
আলো ছায়া দুঃখ সুখ
হৃদয়ের মেরু আর মরু—
শুধু অনুভূতি নয়
জীবনের লাভ আর ক্ষতির হিসাবে।

এক পিঠে এ সত্তার সময় বাহিত
উদয়াস্ত ইতিহাস চলে,
অন্য পিঠে খুঁজে ফিরি
নিজেকেই নিজের অতলে।

এ শহর

অযোধ্যা হস্তিনা নয়,
—সময়ের অতিদূর মহিমার আভা
স্মরণের দিগন্তে সঞ্চিত।

যতদূর খুঁড়ে যাও
এ শহরে এক খণ্ড শিলাও পাবে না।
শুধু পাললিক পুঁজি অগাধ অতল,
আদি অরণ্যও যাতে সমাধিস্থ হয়নি কখনো।

এই ত সেদিন সবে
লুব্ধ শঠ বণিকের নায়ে
এ শহর কর্দমাক্ত
নেমেছিল মৃত্যুকীর্ণ জলায় বাদায়।

না তুলুক অভ্রভেদী মিনার গম্বুজ,

নদীর নিকটে

ইতিহাসে কলঙ্কিত গরিমার স্তূপ,
সদ্য দুই শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
এ শহর প্রাণ-বেগে অস্থির উদ্দাম,
নিত্য-আলোড়িত
তুলেছে অনেক স্বপ্ন ঊর্ধ্ব মহাকাশে
মর্মরের চেয়ে শুভ্র শুদ্ধ
মানুষের প্রেম আর আশা দিয়ে গাঁথা।
সেই স্বপ্ন বিচূর্ণ সহসা?
কোথা যেন আর্তনাদ যন্ত্রণা-জর্জর
রক্তে ভাসে মাটি!
বিস্ফোরণে প্রত্যয়ের ভিত্তিমূল কাঁপে।

এ কি মহাসমাপ্তি-সঙ্কেত
কিংবা জীর্ণ যুগান্ত-ঘোষণা?

ছাপ

মন থেকে ময়লা ছাপ ঘসে তোলার
কোনো বব্বার নেই,
হৃদয় থেকে বেয়াড়া ছোপ মুছে দেওয়ার
কোনো চুনকাম।

দগদগে ঘাগুলোর রগরগে রং
সময় একটু ফিকে করে দেয় শুধু
ঢাকা দেয় মরা চামড়ার কিণাঙ্কে।
কিন্তু প্রতিদিনের
আপাততুচ্ছ গ্লানি আর যন্ত্রণাগুলো
রক্তের মধ্যেই লুকিয়ে ফেরে
ঘুমন্ত জীবাণুর মত
কখন হঠাৎ বিরস রসনায়
জীবনের স্বাদ বিষিয়ে দিতে,
কিংবা আচমকা জ্বলে উঠতে
সংক্রামক বিস্ফোরণে।

ভুলতে চাই, তবু পারি কই,
বড়বাজারের ঠেলায় রিকশায়
লরীতে মোটরে ঠাসা
পাঁওদলে কিলবিল সেই বুকচাপা গলিটা,
নোংরা রুগ্ন কামুকতার চেয়ে

বীভৎস এক লুব্ধতা
পান জরদার উগ্র সুবাস ছড়িয়ে
ফিনফিনে আদ্দির উদ্ধত শুভ্রতায়
নির্লজ্জভাবে যেখানে আস্ফালিত,
আর ভয়ে সিটোনো
অঝোর কান্নায় ঝাপসা চোখে
একটা চেনা মুখ খুঁজে-না-পাওয়া
এক রত্তি সেই দুটো বেওয়ারিশ মেয়েকে,
হাওড়া স্টেশনের ওয়েটিং রুমে
দুনিয়ার জমজমাট উনিশশো আটষট্টি
অকাতরে যাদের ফেলে পালিয়ে গেছে।

ক্ষণিকা

চিরকালের কবিতা
যারা লিখতে চায় লিখুক,
আমায় লিখতে দাও
হারিয়ে যাবার, ভুলে যাবার, মুছে যাবার,
মুহূর্তের পরমায়ু নিয়ে নিশ্চিহ্ন হবার কবিতা।

সজ্ঞানে আমার সে কবিতা
সেতু হতে চায় না
কাল থেকে কালান্তরে,
স্মৃতির যাদুঘরে অক্ষয় হ'তে
শ্রদ্ধার মোড়কে।
সময়ের ক্ষীণায়ু বুদ্বুদ হওয়াই তার সাধ,
এই ক্ষণকালের হৃদ্স্পন্দন,
আর এই মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গ,
বিক্ষুব্ধ হুংকার আর উৎক্ষিপ্ত বজ্রমুষ্টি
প্রতিফলিত প্রতিধ্বনিত করেই
সে যাক্ ফুরিয়ে।

ইতিহাস যা ভুলে যায়,
সাহিত্যের রাজকোষে যা জমা পড়ে না,
সেই অগণনের একটি কণার কবিতা আমার
আজকের মিছিলের পতাকা বয়েই
বিস্মৃতির পাথারে বিলীন হোক।

ছোট্ট মানুষ

ছোট্ট মানুষ, শ্যামলা মানুষ,
জালিম যত জুলুমবাজের
জবর জবাব রক্তি মানুষ,
সাবাস ভাই !
আজ সবাই
কালো, ধলো হলুদ মানুষ,
ছোট্ট এবং মস্ত মানুষ,
সাচ্চা এবং জ্যান্ত মানুষ,
ভাগ করে নিই তোমার বালাই
পরমাণু পোষ মানিয়ে
ধরা সরা দেখছে কে ?
আরো প্রলয়-ঠাসা কিছু
নেই কি আদ্যিকাল থেকে ?
সৃষ্টি ধসায়,
সূর্য খসায়
মহাকালের ফেরায় হুঁস,
সব অসুরের ত্রাস জাগানো
কি সে ? কে সে ?
এই মানুষ !
সবার ওপর সেই যে ভয়াল
চরম পরম বিস্ফোরক,
ছোট্ট মানুষ, শ্যামলা মানুষ,
সব মানুষই তার মোড়ক ।
ছোট্ট মানুষ আপনি জ্বলে
জ্বালাও তুমি ছেষট্টি সাল ।
সেই আলোতেই পড়ুক ওরা
ঝলসে ওঠা কালের দেয়াল ।

রোদ

হঠাৎ আকাশ উপচে
এ রোদ্দুর যেন গড়িয়ে পড়ল
আমার শহরের ওপর
স্নিগ্ধ সুরার মত ।

মধুর মৃদু তাপে
মেঘগুলো যাচ্ছে গলে।
মন-মরা বাতাস, আর
রুগ্ন ঝিমোনো রাস্তাগুলোকে চাঙ্গা করে,
এ শহরের শিরা উপশিরায়
ছড়িয়ে যাচ্ছে রোদটা
খুশির নেশা ধরিয়ে।

দেখছি, চিলটা বসেছে
সামনের বাড়ির চিল-কোঠার মাথায়
রোজ যেমন বসে তার উন্নাসিক একাকিত্বে।
আজ যেন তার আত্মনিমগ্নতায়
ক্ষুধা, কাম, হিংসা, সব কিছু ছাড়ানো
এক সুদূর নির্লিপ্ত প্রশান্তি।
শহর মাতানো এই রোদ
হয়ত তার যথার্থ দাম পেয়েছে
চিলটার ওই অর্ধনিমীলিত চোখে।

সে দাম দেবার ক্ষমতা আমার নেই।
ও ঘরে রেডিও বাজছে।
আকাশ দূষিত করা
বইছে শব্দের পয়োনালী।
এ ঘরে আমার হাতে
খবরের কাগজ।
দম্ভ আর দীনতা, হিংসা আর লালসার
জালে জড়ানো
মূঢ় জর্জর মানুষের
সত্য মিথ্যায় ঝাপসা
নীরব আর্তনাদ আর আস্ফালন।

চিল না হ'তে পারি,
এ সব ছাড়িয়ে
ছাদে ছাদে উদ্দাম ছেলেগুলোর
ওড়ানো ঘুড়ির মত
নীলাকাশের এই সোনালী উৎসবে
যদি নিজেকে ভাসাতে পারতাম নিরুদ্বেগে!

কিন্তু দেয়ালে দেয়ালে আঁটা
ছেঁড়া খোঁড়া এই ইস্তাহার গুলোও
চোখ সরাতে দেয় কই!

উনিশ শো সত্তর

একটা পা আছে
পেট ফাটা বাসের পা-দানিতে,
আর একটা তে-শূন্যে।
একটা হাত ধরেছে
তেল ময়লা চটা ওঠা হাতল
আর একটা হাতড়াচ্ছে।

একটা চোখ আছে
রাস্তার মিছিলে
আর একটা কোথায়?
আমরা সব মূর্তিমান দ্বিধা
নড়ছি চড়ছি সময়ের খাম খেয়ালে।
উনিশ শ' সত্তর
আমাদের খেতে দেয় নি
শুতে কি জিরোতে।

মনের জানলা কবাট বন্ধ করে
কে হতে চায় মৌনী
নিজের মোক্ষে ধ্যানস্থ?
পারবে কি?

তুফান উঠবে-ই তা কি জানে না?
কে ঠেকাবে দুরন্ত সব ভাবনার, ধারণার ঝাপটা,
সব আগম নিগম ঘুচিয়ে
ভিতটাই যা দেবে উলটিয়ে!

নদীর নিকটে

নদীর নিকটে থাকব,
নদী যদি ভ্রষ্টা হয়, তবু।

পণ্য নিয়ে পারাপার,
চলুক না বাঁধাঘাটে লাভের বেসাতি,
তবু ছল ছল জল
তীক্ষ্ণ সব তারাদের দ্যুতির নিক্কণে মোহাবেশে
কখনো নিঃসঙ্গ রাতে
হৃদয়ের কূলে বাজবে নাকি?

পৃথিবীতে বহু আগে
আমাদের শৈশবের ভোরে
কোনো এক সন্ধ্যাভাষা নিয়ে বুঝি
বয়েছে নদীরা।
পিতৃপুরুষেরা সব সেই ভাষা শিখেই মোহিত
গাঢ় মৌন প্রত্নপলি বুকে টেনে নিয়েছে বিদায়।

উচ্চারণ শেষ হলে
সময়ের স্রোত থেকে ইচ্ছাসুখে সরে যেতে হয়,
নদীদের দীক্ষা শুধু তাই।

আমার এ নগরের গভীর হৃদয়ে,
আজও সেই সর্বনাশা নদীর মন্ত্রণা
শুনব বলে কান পেতে থাকি।
যাদের বনেদ পাকা,
বাঁধ বেঁধে পাড় গেঁথে গেঁথে
ভাবে তারা নদী বুঝি
চিরকাল থাকবে নালা হয়ে!

তারা ত' জানে না
সব নগরের সাধ আপনাকে নদীতে হারানো।
সিদ্ধি তাই!

লেনিন

মানুষের কত মাপ
কতজন কষে রেখে গেল,
—দেহের নিরিখে কেউ,
চেতনার, মেধা ও মতির
হৃদয়ের।

সব মাপ তবু যেন
হিসাব মেলাতে শেষে
হয় উপহাস।
জীবনকে স্বপ্নময় কুয়াশায় আদ্যন্ত ঢেকেও
সূচতুর্ম শৃঙ্খলের
ঝনৎকার লুকোন যায় না।

উর্ধ্বার শুনেছি ঢের
ভাগবত পরম-করুণা

পাপী তাপী পতিতেরে
ত্রাণ করে পবিত্র ধারায়।

সে স্বর্গীয় সমাধান নয়।
একজন একান্ত পার্থিব
সকলের সাথী হয়ে শুধু
পাশে পাশে হেঁটে চলে গেল
দুস্তর দুর্গমে।

সবিস্ময়ে নিজেরি পা ফেলে
মানুষ হঠাৎ জানে
মাপ তার আকাশ-ছাড়ানো
সত্যব্রত দুঃসাহসে
প্রতিজ্ঞা প্রত্যয়ে।

শোষণ পীড়ন শূন্য
ভয়-গ্লানি-মুক্ত ভাবী দিন
স্পন্দিত আরেক নামে
লেনিন! লেনিন!

ম্যাক্সিম গর্কি–কে নিবেদিত

অজানা সমুদ্র নয় নয় মহাদেশ,
নদী, গিরি, অরণ্য প্রান্তর;
ভিন্ন এক নিরুদ্দেশ দুর্গমতা রহস্যগহন
তোমাকে টেনেছে দুর্ণিবার।
তুমি ছিলে সমর্পিত ক্লান্তিহীন আরেক সন্ধানে।

নির্জনে ও জনতায়
দুঃখ ও মৃত্যুর সাথে
তুমি শুধু হেঁটে হেঁটে ঘুরে সমুৎসুক
আবিষ্কার করে গেছ
কিমাশ্চর্য মানুষের মুখ।
নিরালোক বুকে তার গভীর কন্দরে,
কোনখানে জ্বলে কিনা
অনির্বাণ দিব্য কোন প্রত্যয়ের দ্যুতি,
খুঁজে গেছ তাই।
বিষণ্ণ করুণ
সহোদর বিধাতার গাঢ় মমতায়
তারপর রেখে দিয়ে গেছ কটি
হৃদয়ের প্রদীপ্ত সংকেত,

আগামীকালের পানে
প্রার্থনা ও প্রত্যোদের মত।

তিক্ত শুধু তুমি ছদ্মনামে।
তোমার লেখনীমুখে
বিশাল উদার এক মহামানবতা
বিগলিত ধারা হয়ে
জীবনের মানচিত্র আদিগন্ত স্নিগ্ধ করে নামে।

গুরুনানক

তুষার মৌলি হিমালয়ের অভ্রংলিহ মহাশিখর দেখে
কি মুগ্ধ বিহ্বল ?
ধ্যান গাম্ভীর্যে তার চেয়ে উত্তুঙ্গ মহিমা দেখেছি
মানুষের মধ্যে।
মহাসমুদ্রেব অসীম অতলতা কি স্তব্ধ করে
নির্বাক বিস্ময়ে ?
মানুষের মধ্যে পেয়েছি তার চেয়ে উত্তাল দিগন্ত বিস্তৃতি।
মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত সূর্য কি চোখ ধাঁধায় দারুণ দীপ্তিতে ?
তার চেয়ে জ্যোতির্ময় সত্তা দেখেছি মানুষেরই মধ্যে,
দেখেছি, হিমবাহ-গলিত মন্দাকিণী ধারার চেয়ে
নির্মল পবিত্র প্রবাহ,
অনন্ত নীলাকাশের চেয়ে
প্রসন্ন উদার প্রশান্তি।

সেই আশ্চর্য সব মানুষেরা
এই আমাদের ভারতবর্ষের মৃত্তিকাই ধন্য করেছেন।
আজ তাঁদের এক পরম জনকে
বিক্ষুব্ধ এ শতাব্দীর প্রণতি জানাই।
অধ্যাত্ম সাধনা বীর্যবন্ত হয়েছে যাঁর প্রেরণায়
সত্যানুসন্ধানের সঙ্গে সাহসিকতা মিশেছে
আমাদের জীবন-ব্রতে
ধর্মাচরণকে সমস্ত অন্ধ সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে
অখন্ড মানবতার সাধনায় যিনি নিয়োজিত করেছেন,

শুধু এক সম্প্রদায়েরই নয়
সমগ্র ভারতের অমৃত পন্থার দিশারী
সেই গুরু নানককে জানাই
সমস্ত দেশবাসীর প্রণতি।

সে মানুষ

(রমাঁ রলাঁ-কে মনে রেখে)

দিব্যদ্যুতি লিখি বটে অভ্যাসের মসৃণ কলমে,
বুঝি না কেমন বস্তু।
মর্ত্যের দীপ্তিই বরং দেখেছি অবাক চোখে চেয়ে
কতবার মানুষের মাঝে
—যে মানুষ অকপট
আপনাকে জীবনের গূঢ়তম শোকে সুখে ধুয়ে
মেজে ঘষে হিমে তাপে আলো অন্ধকারে
হয় স্বচ্ছ পরিস্রুত স্ফটিকের মত।
সত্তার বিস্ময়দ্যুতি তারই চোখে সদাবিস্ফুরিত।

আমাদের ইতিহাসে
সে মানুষ যে নির্জনে যেখানেই হেঁটে চলে যাক,
পদপাতে প্রতিধ্বনি অগণন শতাব্দী কাঁপায়।

কান্না

সমস্ত যন্ত্রণা বুঝি
স্তব্ধ করে রাখা যায়
অসাড় স্নায়ুতে,
মোছা যায় সমস্ত বিষাদ
স্মৃতির গাহনে কিংবা শ্রুতির প্রত্যয়ে।

শুধু এক কান্না গভীরের
কিছুতেই হয় না নীরব।

ধ্বনি তার সূক্ষ্ম সূচীমুখ
ভেদ করে যবনিকা
সপ্তস্তর মায়ার, মোহের
নিত্য করে সব বাঁচা
বিক্ষত জর্জর।

সে কান্না, কিসের ? কেন ?
এই টুকু জানি
হৃদয়ের সে রোদন
নয় কোনো কামনার
দেহাতীত অথবা পার্থিব
সিদ্ধি কিংবা পরম মোক্ষের,
সে কান্না সান্ত্বনাহীন ধ্রুব অবিরাম

নিজেকে দেখার আয়না
সব বুঝি ভাঙা বলে শুধু।

নিরালা

সে সব স্তব্ধতা আমি
এসেছি সুদূর যত শতাব্দীতে ফেলে।
ধাবমান ইতিহাসে
সেই সব শতাব্দীও ছিল কল্লোলিত,
হামুরাবি, তথাগত, অশোক বা
কখনো তৈমুরে
আবর্তিত উদ্বেল সময়।

তখনই হুঙ্কার ছিল কণ্ঠে মানুষের
ছিল দৃপ্ত অট্টহাসি।
তবু সব উচ্চারণ ঘিরে
কি নীরব অকূল বিস্মৃতি!

সমুদ্র, বাতাস আর
নদী কিংবা মেঘ ছাড়া কেউ
সেদিন উত্তাল কণ্ঠ
তোলেনি এ হৃদয়ের গাঢ় মগ্নতায়।
তারপর লোভের ইজারা
একে একে গ্রাস ক'রে সব পরিসর
সমস্ত দিগন্ত ঢাকে
সান্নিধ্যের কপট উৎসাহে।

কাকে যেন কানে কানে
অনেক বলার কথা ছিল।

আর তা হবে না বলা।
পৃথিবীতে আজ শুধু শূন্যে ও হাওয়ায়,
—না, না, বজ্রনাদ নয়,
নয় জন-প্লাবনের রোল,
শুধুই দুঃসহ দক্ষ
সমতল জ্যামিতিক স্বরে
খবর! খবর!

এ পৃথিবী প্রেম নয়, বিমুগ্ধ বিস্ময়,
নয় আর বুক-চেরা রক্তাক্ত জিজ্ঞাসা।
শুধু ক্লান্ত কৌতূহল,

নদীর নিকটে

স্পন্দহীন চেতনায় সাড়-তোলা
মাদকের কশা।
অবিরাম নিরর্থক খবর! খবর!
ধ্বনির এ শবস্তূপে
মিছে খুঁজে ফিরি সেই
হৃদয়ের দুর্গম নিরালা।

গোপন

একটি গোপন কথা
পৃথিবী নিজের মনে রাখে সংগোপনে।
কখনো একান্তে শুধু বুঝি
নিজেই তা চুপি চুপি শোনে!

সে কথা শুনতে কেউ
তুহিন নিষেধ ঠেলে
উত্তুংগ শিখর সব খোঁজে।
কেউ পিপাসার শেষ
দেখতে চায় অন্তহীন জ্বলন্ত বালিতে।
শূন্যে কেউ পাড়ি দেয়,
কেউ নামে আপনারই অতল গহনে।

সে গোপন কথা কেউ
কে জানে শুনেছে কি না কোথাও কখনো!
প্রপঞ্চের চাবি
হয়ত খোঁজা-ই ভুল।

তবু আমি কান পেতে থাকি,
দুর্গম নির্জনে নয়,
মানুষেরই জনতার মাঝে,
অতি পরিচিতি এই সংসারের তীরে,
যত অবোধের মুখে,—এর, ওর, তার।
হয়ত সহসা
সেখানেই শেষ সত্য শুনব উচ্চারিত!

রঙিন তারিখ

হে মহাজীবন,
আমি বন কাটলাম, কি
ধোঁয়াটে কুয়াশায় আকাশ ঢাকতে!

রাস্তা বাঁধলাম
পৌঁছোতে এই পাটোয়ারদের অমরায়!
সভা ডাকলাম,
সমবায় গড়লাম
শুধু সদস্য হয়ে সম্মতির হাত তুলতে,
আর ভালবাসলাম
বিবাহ-বার্ষিকীর ঘটা করব বলে?

কোথায় আমার নিরাবরণ হবার
সে ভয়ংকর নির্জনতা?
বুকে বুক দিয়ে নিষ্পেষণের
দুঃসহ সব মুহূর্ত থাকবে
নির্বীজ নিশ্চিন্ততায় ঘড়ির কাঁটায় গোণা?

পরিপাটী ছাপানো বাঁধানো
ঝকঝকে মলাটে ঢাকা
আমাদের জীবন হোক
বসানো রোজনামচার বসদ,
—এই'ত আমাদের প্রার্থনা'

অরণ্য প্রান্তর যাতে উন্মনা উদ্দাম,
পৃথিবীর গহন হৃদয়ের
সেই সহসা বক্তিম উন্মোচনের
মত্ত বিহ্বলতা নয়,
জমিয়ে রাখা জীর্ণ পুরানো বেশে
আমাদের রঙিন হবার তারিখ তাই
খুঁজতে হয় পঞ্জিকার পাতায়।

সোনার জলে লিখলে
কথার দাম যাদের কাছে বাড়ে,
আর পীনোন্নত যৌবন মসৃণ মখমলে হয় মহার্ঘ্য,
পরপুরুষের ঘ্রাণ-মাখা নারী
আর উৎকোচের উচ্ছিষ্ট নিয়ে
পরমসুখে যারা কূজনমুখর,
তাদের সঙ্গে হোলি খেলতে
চাও ত যাও

নিরুদ্দেশ

সকলের সামনে দিয়ে

নদীর নিকটে

কাউকেই না জানিয়ে তবু
এই এক নিরুদ্দেশে এসে বসা যায়।

পাহাড়ের গুপ্ত গুহা নয়,
নয় কোন দুর্গম শিখর
কিংবা ধূ ধূ মরু-ঘেরা
নিঃসঙ্গতা অসীম ধূসর।

এ এক আসন ঠিক
আপনারই উল্টোদিকে পাতা হয়ে আছে।

মেলো! মেলো! —চেঁচায় মাইক!
মিলব ঠিকই
একলা হওয়া সব চেয়ে বড় অভিশাপ।

তবু একটু ফাঁক চাই।
মিলতে হবে বলেই মাঝখানে,
এক ফালি বন্ধ্যা মাঠ
কিছুই যা ফলায় না
শুধুমাত্র আকাশের মালিকানা মেনে।

নদী ও যদি

নদীর সঙ্গে একটা মিল ত' যদি।
ধ্বনিটুকুর বাইরে আর খাটে না।
ভবিতব্য স্বপ্নলোকের কাছে
একটি কড়াও রাখতে কি চায় দেনা!

যত-ই কেন এ কূল ও কূল ভাসাক
ক্ষ্যাপা ঝড়ের রাতে,
বন্যা বেগেও নদীর দাপট বাঁধা
অঙ্ককষা খাতে।
মুক্তি আমার যদি-র মধ্যে তাই
যদি-র শূন্যে ছড়াই অলীক পাখা।
আষ্টেপৃষ্ঠে আইন-বাঁধা প্রাণ
এই যদি-তেই বিদ্রোহী বলাকা।

ন'উই আশ্বিন

আজ আবার রোদ উঠল একটু সোনালী

শুক্রবার, ন'উই আশ্বিন,
এলোমেলো হাওয়ায় শীতের
আল্‌তো ছোঁয়া আছে কিংবা নেই।
রাস্তায় মানুষ জন যেন কোন আশ্বাসে উজ্জ্বল।

ইতিহাস ভূগোলের
প্রতিচ্ছেদ-বিন্দু আমি এক
হাওয়া আর এ রোদের রং
আমাকেও না ছুঁপিয়ে ছাড়ে!

কবে ফের কালো কালো
মেঘ তুলবে ঈশান নৈর্ঋত,
কবে যে মিছিল ভাঙবে
দপ্তরের পাথুরে দেয়ালে,
কিছুই ভুলিনা
তবু
মুহূর্ত কয়েক
বৃত্ত ই অমোঘ মেনে
এ বিশ্বের নীতি ও নিয়তি,
কেদারায় শরীর এলাই।
কেটে গিয়ে দুর্যোগের
তিনটে ভেজা সপ্‌সপে দিন,
রোদ উঠল শুক্রবার ন'উই আশ্বিন।

তবু

ওরাও কূপ খনন করেছে,
রোপণ করেছে তরুবীথি সময়ের প্রান্তরে।

তৃষ্ণার্ত পাবে জল,
পরিশ্রান্ত পাবে ছায়া,
হয়তো ক্ষুন্নিবৃত্তির ফলও।

তবু কেন বহ্নিময় এক ঘূর্ণি
উন্মত্ত হয়ে ওঠে থেকে থেকে
ইতিহাসের দিগন্ত ভুলিয়ে?

কোনো কূপই মানুষের হৃদয়ের মতো
গভীর নয় বলে কি?
কোনো মহীরুহই মানুষের বিশ্বাসের চেয়ে
নিশ্চিন্ত নিরাপদ নয় বলে?

টবে ক্যাক্টসের মত

টবে ক্যাক্টসের মত,
দুঃখের কয়েকটি চারা অলিন্দে মনের
সাজিয়ে রাখি নিজেকে শেখাতে
পৃথিবীতে কোনো সুখ
আঁখিজলে না ধুলে বাঁচে না,
সব চেয়ে স্নিগ্ধ আলো
মেঘ-ভাঙা রোদে চুইয়ে পড়ে।

টবে ক্যাক্টসের মত,
ছোট ছোট দুঃখগুলি
কিছুই চায় না যেন
যত্ন কিংবা জল,
ধরে না অরণ্য-কায়া
বিনম্র সঙ্কোচে নিত্য শুধু
মৃদু করাঘাতে রাখে
চেতনার নেপথ্য চঞ্চল।

টবে ক্যাক্টসের মত
কিছু ক্ষয়, কিছু ক্ষতি, কিছু বা বঞ্চনা
নাতিস্নেহে হোক না লালিত।
হৃদয় ত তারই স্পর্শে খোলে।
অগ্নিক্ষরা মধ্যাহ্নে কি
ঘনঘটা দুর্যোগের রাতে
এ প্রাণের নিভৃতির
তারাই অলঙ্ঘ্য বেড়া তোলে।

আলিগিয়েরি দান্তে*

স্বর্গোদ্ভবা

যেখানে এসেছি সেখানে হায়, হ্রস্বদিন আর বিশাল ছায়ার বৃত্তাংশ, আর তৃণভূমি থেকে রং যখন যায় লুপ্ত হয়ে, গিরির সেই শুভ্রতা। আমার বাসনাও তাই বলে তার হরিৎরূপ বদলায় না, রমণীর মত যা কথা বলে ও শোনে সেই কঠিন শিলায় তা এমন বদ্ধমূল।

স্বর্গোদ্ভবা এই রমণী সেইমত ছায়ার মধ্যে তুষারের মত পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, কারণ সে তো স্পন্দিত হয় না, যে মধুর কাল গিরিপর্বত তাতিয়ে শুভ্র থেকে সবুজ করে তোলে পুষ্পে গুল্মে সব কিছু আবৃত করবার জন্যে, তার দ্বারা শিলাখণ্ড যেমন হয়, তেমনি করে ছাড়া।

মাথায় যখন তার থাকে তৃণগুল্মের মালিকা, তখন আর সমস্ত নারীকে ছেড়ে আমাদের মন আকৃষ্ট হয় তার দিকে, কারণ তরঙ্গিত পীত হরিৎ এমন মনোহর ছাঁদে সে মেশায় যে আমাকে যা আবদ্ধ করেছে দুটি ছোট গিরির মধ্যে চুন পাথরকে যত কঠিনভাবে বাঁধে তার চেয়ে সবলে, সেই প্রেম এসে দাঁড়ায় তাদের ছায়ায়।

মণিরত্নের চেয়ে গুণগ্রাম তার রূপলাবণ্যে, যে ক্ষত সে দেয় কোনো ওষধিতে তা সারবার নয়। কারণ গিরিপ্রান্তর পার হয়ে আমি পালিয়েছি এমন নারীকে এড়াবার জন্যে, তবু মৃৎস্তূপ কি প্রাচীর কি হরিৎ পত্রকুঞ্জ তার বিকিরণ থেকে পারে না আমায় ছায়া দিতে।

আমি তাকে হরিৎ বাসে দেখেছি, এমন সে বেশবাস যে তার শুধু ছায়াটুকুর জন্যে আমি যা করি অনুভব সেই প্রেম পাথরের বুকেও তা জাগাতে পারত: তাই সবচেয়ে তুঙ্গ পাহাড় ঘেরা স্নিগ্ধ তৃণপ্রান্তরে আমি তাকে কল্পনা করেছি, নারীর মধ্যে যতখানি প্রেম সম্ভব তাইতে বিভোর।

কিন্তু, যাতে আমি চাইব আজীবন কঠিন শিলায় শুয়ে কাটাতে, আর কোথায় তার অঙ্গবাসের ছায়া পড়ে তারই সন্ধানে বিচরণ করতে তৃণাহারে, বরবর্ণিনীদের যেমন হয়, আমার জন্যে তেমনি এই নধর সবুজ তরুদেহে আগুন ধরবার আগে নদীরাই ফিরে যাবে পর্বতশিখরে।

যখনই পর্বতেরা গাঢ় গভীর কালো ছায়া ফেলে, এই তরুণী রমণী হারিয়ে যায় স্নিগ্ধ সবুজের মধ্যে মানুষ যেমন রত্ন লুকিয়ে রাখে ঘাসের মধ্যে তেমনি করে।

* আলিগিয়েরি দান্তে (১২৬৫ ১৩২১) মধ্য যুগের বিশ্ববন্দিত ইতালীয়ান কবি।

উইলিয়মস কার্লস উইলিয়ম*

পানসীগুলো

সেই সাগরে যোঝে
ডাঙায় খানিক ঘিরে যাকে
সেই প্রচণ্ড আঘাত থেকে বাঁচায়
শাসনবিহীন মহাসাগর খেয়াল মাফিক যে ঘা-য়
কারিগরীর সাধ্য সীমার
বিশালতম হালকে পীড়ন করে
ডোবায় দয়াহীন।

কুজ্‌ঝটিকায় 'মথ'-এর মত
মেঘ-বিমুক্ত দিনের তীক্ষ্ণ আলোয় ঝলমল
ফুলে ওঠা চওড়া পালে
পিছলে চলে তারা
ধারালো সব গলুই দিয়ে কেটে সবুজ জল।
মাঝি মাল্লা যত
নড়ে বেড়ায় পিঁপড়ে যেন
তদারকীর নানান দায়ে
বেঁধে খুলে এটা ওটা
মুখ ঘোরাতে পানসীগুলো যখন বিষম হেলে,
আবার পালে বাতাস পেয়ে লক্ষ্য ধরে ছোটে।

খোলাজলেব সুরক্ষিত খেলার ক্ষেত্রে যখন
মোসাহেবের মত যত পিছু পিছু বড় ছোট ধুমসো চপল না-এর
বহর নিয়ে

পানসীগুলো চলে,
যৌবনেরই মূর্তি মনে হয়
বিরল যেন আনন্দিত চোখের মধুর দ্যুতি,
মনের মধ্যে যা কিছু সব
নিষ্কলঙ্ক মুক্ত কাম্য পরম
তারই যেন জীবন্ত সৌষ্ঠব।

এবার সাগর ক্ষুব্ধ হয়ে আঘাত করে' প্রত্যঙ্গে মসৃণ
তুচ্ছতম খুঁত ধরতে চায়। হয়না সফল,
বাচের পাল্লা বন্ধ আজকে। আবার বাতাস ওঠে অত:পর।
পানসীগুলো দৌড় সুরুর মওকা নিতে এগোয়।
নিশান পড়ে। পানসীগুলো ছাড়ে।
ঢেউগুলো সব দিচ্ছে বাধা। পানসীগুলো যথেষ্ট মজবুত,
পাল খাটিয়েও আঘাত এড়িয়ে চলে।

উদ্যত সব লুব্ধ বাহু পানসীগুলো আঁকড়ে ধরতে চায়
সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়া দেহগুলো কেটে যেন দুখান হয়ে যায়।
চারিধারে যন্ত্রণা জর্জর হতাশ সুখের সাগর যেন
সমস্ত মন শিউরে তোলা এই পান্নার [illegible]শিকা বোঝায়।
সমুদ্র হয় হারিয়ে যাওয়া জলজ দেহের জটি [illegible]প
ধরে রাখতে পারে না যা তারই ব্যর্থ বাহক।
হার-মানা সব চূর্ণ হতাশ ঢেউ
মৃত্যু থেকে বাড়ায় বাহু রক্ষা পেতে কাতর আর্তনাদে,
বৃথাই বৃথাই।
তাদের বিলাপ তরঙ্গিত হয়ে বাজতে থাকে
নিপুণ যত পানসীগুলো ভেসে যাবার পরও।

উইলিয়মস কার্লস উইলিয়ম*

হাসি খুশি উইলিয়ম

হাসি খুশি উইলিয়ম
চুমড়ে নিয়ে নভেম্বরের গোঁফজোড়া
আধেক পোষাক পরা গায়ে
শোবার ঘরের জানলা থেকে
চেয়ে দেখল বসন্ত কাল বাইরে।

হে-ইয়া বলে জানিয়ে নিজের খুশি
বাইরে ঝুঁকে
এদিক ওদিক দেখল রাস্তাটাকে,
কিছু কিছু নীলচে ছায়ার পারে
কড়া রৌদ্র যেথায় পড়ে আছে।

আবার ঘরে সরিয়ে এনে মাথা
নিজের মনেই শান্ত ভাবে
হেসে উঠল সে
সবুজ সবুজ গোঁফজোড়া তার চুমড়ে।

আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি*

আসর

নেশায় যারা বুঁদ

*উইলিয়ম কার্লস উইলিয়ম (১৮৮৩-১৯৬৩) দিক্‌পাল মার্কিন কবি। নিজস্ব আধুনিক ধারার প্রবর্তক।

*এ যুগের তরুণ রুশ কবি।

সবাই তারা বসল। হঠাৎ ....
ওরা গেল কোথায়?
                    সেই দুজন?

উধাও
          ওখানে নেই!
হাওয়ায় কি নিয়ে গেল তাদের উড়িয়ে
জমায় স্ফূর্তির মাথায়, ফেলে রেখে
এক জোড়া শূন্য চেয়ার,
দুটো ছুরি যেখানে পড়ে?
এই ত তারা চুমুক দিচ্ছিল সুরায়।
ছিল এইখানেই। পলক না ফেলতে
হাওয়ায় মিলিয়ে হ'ল চোখের আড়াল
               সেই দুজন।

কাদাজল ভেঙে তারা গিয়েছে ছুটে—
পারো ত' তাদের ধরো!—
পারের ডিঙি তারা দিয়েছে পুড়িয়ে।
চুলোয় যাক সহবৎ আর বর্ষাতি!

এমনি করে মিলোয় পেয়ালার ঝংকার
আঙুলের বাজনা যখন থামে,
এমনি করে নদী ছোটে তার খাতে
কিংবা আকাশে মেঘ।

যৌবন এমনি করে হেলায় করে তুচ্ছ
জরা আর তার আঁচলের গেরো।
এমনি করে বসন্তে
নবাঙ্কুর আসে বেরিয়ে।

আসর জমেছে দারুণ,
কিন্তু এই দুজনের সাহস
আর খালি চেয়ারগুলোর পিঠ
বিস্ময়ে করে নির্বাক।

আসিপ ম্যাণ্ডেরস্ট্যাম*

চারটি কবিতা

এই যে দেহ,
আর মাটির কাছে যা কিছু আমার দেনা,

* আসিপ ম্যাণ্ডেরস্টাম—আধুনিক রুশ কবি। বন্দী অবস্থায় সাইবেরিয়ায় মারা যান

সব মাটিতেই ফিরে যাক্ আমি চাই না,
চাই না আমি ময়দা-সাদা একটা প্রজাপতি হ'তে।

কত ভাবনায় আঁচড়কাটা আর ঝলসানো
এই যে আমার দেহ
তা যেন রাস্তা হয়, হয় মাঠ—
মেরুদণ্ডের হাড় ছিল তার মধ্যে
নিজের সীমা তা জানত।

হাওয়ায় আর্ত রোল-তোলা
পাইনের গাঢ় সবুজ সব পত্রশলাকা
দেখাচ্ছে যেন জলে ভাসানো শেষকৃত্যের মালা
আমাদের জীবনের আনন্দ আর সাধনা
কেমন ধুইয়ে দিয়েছিল বার করে!
ক্রীতদাস মাল্লার মত যখন বসে থাকতাম
হাড়ভাঙা হয়রানির বেঞ্চিগুলোয়—
সবুজ পাইন-শাখার পশ্চাৎপটে
বিছানো সব দেহ,
বাচ্চাদের রঙীন অ আ ক খ-এর মত
লাল নিশান জড়ানো।

শেষ বাহিনীর বন্ধুরা ওই আগুয়ান,
কথা নেই মুখে,
কাঁধে তাদের শুধু বন্দুকের বিস্ময়-চিহ্ন।
ঊর্ধ্ব আকাশ থেকে হাজারো কামান
বাদামী চোখ, নীল চোখ, এলোমেলো পা ফেলা
—মানুষ, মানুষ মানুষ!

কে যাবে ওদের পরে?

২

তুমি আর আমি হেঁসেলে খানিক বসব।
গন্ধটা মিষ্টি সাদা কেরোসিনের।

ধারালো ছুরিটা, একটা পাঁউরুটি।
তেলের স্টোভটা পাম্প করো না কেন কষে?

কটা দড়ির টুকরো যোগাড় করে'
ভোরের আগেই চুবড়িটা নিতে পারো বেঁধে,

তারপর পালিয়ে যাব রেলস্টেশনে,
কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না।

৩

না, আমি লুকোব না এই আপদ থেকে
মস্‌কোর কোচোয়ানের পিঠের পেছনে;
আমি ঝুলছি ভয়ঙ্কর সময়ের গায়ে
—একটা চলন্ত 'বাস'।
কেন যে বাঁচি তা জানি না।

তুমি আর আমি যাব অ আ মার্কা সড়কে,
আর দেখব কে মরে আগে—
ওই মস্‌কো, সে ভয়ে কাতর চড়ুইএর মত
কোথাও থাকে কুঁকড়ে,
কোথাও আবার ফোলে
ফাঁপানো কেকের মত।

রাস্তার বাঁক ঘুরে
শাসাবার সময়টুকু শুধু তার আছে।
যা খুশি তোমার করো, আমি ডরাই না—
কার দস্তানার মধ্যে তাপ আছে
লাগাম ধরবার মত,
আর ঘুরে বেড়াবার মত
মস্‌কোর বীথিবর্ত্মের সব ফিতে ধরে?

৪

তোমার ওই ছোট্ট কাঁধের ওপরই সব ভার:
বিবেকের ওই অপাঙ্গ দৃষ্টি,
আমাদের বিপদ-ডাকা বন্য সরলতা—
ডুবে-যাওয়া নদীর মত ভাষা আমার স্তব্ধ।
ডানা চমকায়, লাল ফুল্‌কো নড়ে পাখার মত,
অবাক মুখগুলো নীরব কাতর আক্ষেপে বৃত্তান্বিত,
মাছের ডানা ইতস্ততঃ ছড়ানো।
নাও এসব, খাওয়াও তাদের
আধ সেঁকা রুটির মত তোমার শরীর।

কিন্তু আমরা ত' কাঁচের গোলকে সাঁতার-কাটা
সোনালী মাছ নই, যে
বুদ্বুদ ছাড়ব শৈবালের ধারে অভিসারে।
আমাদের শরীরে উষ্ণ রক্তের তাপ,
ইস্পাতের মত আমাদের পাঁজরার সব হাড়,
চোখের তারায় দৃপ্ত সজল ঝিলিক।

তোমার ভুরুর বিপদ-ভরা প্রান্তরে
আমি তুলে ফিরছি আফিমের ফুল,
মাছের ফুলকোর মত কাঁপানো
তোমার ছোট্ট দুটি ঠোঁট আমি ভালবাসি,
তুর্কী সেপাই যেমন বাসে তার ছোট্ট বাঁকা চাঁদের ফালি।

প্রাণের তুর্কী মেয়ে
রাগ করো না আমার ওপর,
আমাদের দুজনকে শক্ত ছালায় পুরে বেঁধে
কৃষ্ণসমুদ্রে দেওয়া হবে ফেলে।
আমি নিজেই তা করব,
তোমার কথা, সেই কথার কালো জলের ধারা
পান করতে করতে—

মরতেই যাদের হবে,
তাদের সান্ত্বনা দাও মারিয়া।
মৃত্যুকে তাড়াতে হবে ভয় দেখিয়ে,
পাড়াতে হবে ঘুম।
সমুদ্রের কিনারে খাড়া চূড়োয় আমি দাঁড়িয়ে।
সরো আমার কাছ থেকে
দূরে গিয়ে দাঁড়াও—আর এক মিনিট।

ইয়ে তিং*

বন্দীর গান

মানুষের দরজায় শক্ত তালা.
খোলা শুধু কুকুরের গর্ত।
হাঁক শুনছি,—
'বুকে হেঁটে বার হলে পাবে আজাদি!'
আজাদি আমি চাই,
কিন্তু এইটুকু শুধু জানি যে,
মানুষের কুকুরের মত হামা দিতে নেই।
আছি সেই দিনের আশায়,
পাতালের আগুন যেদিন
উঠবে মাটি ফাটিয়ে,
এই জ্যান্ত কফন-এর সঙ্গে আমায় পোড়াতে।
আমি জানি
সেই জ্বলন্ত শিখায়,
সেই ঝলসানো রক্তে-ই
আমি পৌঁছাব অমরতায়।

* ইয়ে তিং—১৯২৫-২৭ এর মহাবিপ্লবের অংশীদার আধুনিক চীনা কবি।

হরিণ চিতা চিল

মেলা

এখানে বসবে মেলা।
জঙ্গল ও পাহাড়ের আঁকাবাঁকা ওঠানামা পথে,
দূর দূর বসতির খুশি
ঝলমল রঙিন উৎসুক
জড়ো হবে ক'টি দিন এই শাল-পলাশের বনে।
মাদলে কাঁপবে রাত্রি
ধক্‌ধক্‌ উত্তেজনা পৃথিবীর গভীর বুকের।
মহুয়ার মাদকতা নিয়ে।
জ্বলবে মশালে রাঙা ঘোর-লাগা কামনার চোখ।
ঊর্ধ্বে আর
ধূলোয় মেঘেতে মেশা কোলাহল
শূন্য ছেয়ে থাকবে কিছুক্ষণ।

তারপর সব-কিছু ফুরোবার পর
সেই নির্জনতা।
পড়ে-থাকা চিহ্ন কিছু,
পোড়া কাঠ, উড়ো খড় ছাই,
এখানে-সেখানে ভাঙা কালিমাখা হাঁড়ি-কুঁড়ি সরা।
ছেঁড়া কাগজের টুকরো আর ঝরা পাতা
একসঙ্গে নেড়ে-চেড়ে হাওয়ার খেয়াল
বনের মাথায় ক'টা মগ্‌ডালে বার দুই নেচে
মেঘের কুচিটা দেখে হয়ত হঠাৎ
তার লোভে হবে দূর আকাশে উধাও।

এবার অনেক নীচে
থাকবে শুধু পাহাড়ী নদীর
একটানা মৃদু কুলুকুলু
থেকে-থেকে পাখিদের ডাক দিয়ে গাঁথা।

তখন সেখানে কেউ আসতেও পারে একদিন,
—শিকারী চিতার মত, নয় শুধু শাণিত ব্যগ্রতা,
ভীরু বিহ্বলতা নয় সচকিত শশকের মত।
হয়ত সে এখানেই
অকারণে বসে' ঘুরে-ফিরে
পেয়ে যাবে আশ্চর্য উত্তর,—

নির্জন স্তব্ধতা খুঁজে
বার বার দু'দিনের দুর্বার আহ্লাদে
না ক'রে হনন,
বেড়া-দেওয়া মাপা মাঠে
কেন পোষ মানে না বসতি।

ট্রেনের জানালা

উড়ো হরিয়াল-ঝাঁক বাবলা-বন সবুজ বিদ্যুতে
ছুঁয়ে গেল। দু'দিনের গলদঘর্ম ট্রেনের ধকল
উসুল হয় নি তাতে। তবু যেন দুরন্ত দুপুর
একটি চোরাই সুখে নীলপদ্মে করে টলমল।

সবই জানলার দেখা। তাই দিয়ে সব চাওয়া-পাওয়া,—
জীবিকা, জনন, জপ। জানলার ধারে দিন গোনা।
আরো যদি বাতায়ন থাকে, খোঁজা বুঝি পণ্ডশ্রম।
এক জানলারই মাপে গড়া চোখ কাণ ও চেতনা।

তবু বেগ দিয়ে যদি হতে পারি কখনো বিরাগী,
অচলেরা চমকায়। বহুদূর চক্রবালে স্থির
ধ্রুব পাহাড়েরা নড়ে। ট্রেনের কামরায় চোখোচোখি,—
মানে নেই, নেই পরিণাম, তবু মুহূর্ত মদির।

পাথুরে প্রান্তরে, নয় ফসলের ক্ষেত আগলানো,
কিম্বা কারখানার সাক্ষী, যার যার নিজের স্টেশন।
চেনা রাস্তা, চেনা বাড়ি, ঘড়ি ঠিক, কিছু ভুল চুক।
কখনো ঝলকে শুধু আচমকা অন্য অন্বেষণ।

ছক

যা আছে ছড়িয়ে, যত্নে কুড়োই
মেলাতে উভয় প্রান্ত।
গাঁথব মোটা কি মিহি যে সুতোয়
তাই খোঁজা বিয়োগান্ত।

প্রাণ শুধু বুঝি ছোঁয়াচে রোগের ব্যাপ্তি।
জড়ে জ্বরভাব, ফের জড়ত্ব প্রাপ্তি!

ছাঁচ প্রায় এক, যতই কেন না তাপ দি।
কারিকুরি করে' আখেরে কিস্তিমাত।
তাপটুকু শুধু অযাচিত উৎপাত।

ছকপাতা খেলা চলেছি খেলতে খেলতে।
হুকুম কোথায় চালের বাইরে হেলতে!
ইতিহাসও সেই একই মুখস্থ
সুরে আওড়ানো নামতা।
রাজার, প্রজার, নিজের গরজে
যে যেমন দেয়, নাম তা।

একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানিতে আসে সুপ্তি,
হাত-পা এলিয়ে সময়ের স্রোতে ডুব দি।
মাঝে মাঝে তবু স্খলিত উচ্চারণ।
আর্য প্রয়োগে লঙ্ঘিত ব্যাকরণ!
অর্থ ছাড়ায় সনাতন সব ভাষ্য,
জীবন মানে না জৈব নীতির দাস্য।
ভুলে জ্বলে-ওঠা দৈব দীপ্তি, ঊর্মিল উল্লাস,
ভাঙে ভাঙে বুঝি প্রাণ-শৃঙ্খলে অন্ধ অনুপ্রাস।

সে মহাপ্রমাদ শশব্যস্ত মহাকাল শোধরায়
প্রলয়-প্লাবনে মনু নোয়া-দের নায়।

আবার ছাপানো ছক

শিকার

একটি পাখির জন্যে
কত দূর ঘুরলে শিকারী,
সবুজ আঁধারে কত!
দীর্ঘ ঘাসে উলঙ্গ অসির
সশস্ত্র প্রান্তরে যেন
পেলে অকস্মাৎ।

রক্তাক্ত সে পাখি যেন প্রথম প্রণয়।
কোমল স্পন্দন তার
ধরেও ধর নি হয় মনে।
সে যন্ত্রণা আতঙ্ক-বিহ্বল
তোমারই ত স্নায়ু-ছেঁড়া উল্লাসের স্বাদ।

আয়ু শুধু মেঘ-শোভা নয়,
নয় শুভ্র সন্তোষের ভাসা।

এখানে দাহ ও ক্ষত
দিয়ে নিয়ে তবে কোনোদিন
সত্তার নির্যাস মেলে
শল্যবিদ্ধ শোকের শিখায়।
তাই ত শিকারী, ফেরো
নিজেরই হৃদয় খুঁজে খুঁজে
আরণ্য তিমিরে আর দৃষ্টিনাশা তুষার-প্রান্তরে।
কিণাংক কঠিন হাতে করো জ্যা রোপণ,
তারপর প্রাণান্ত টংকারে
যে শরসন্ধান কর,
একদিন স্থির লক্ষ্যভেদে
বধ্য আর ব্যাধ হয়ে
তাইতেই হত ও অমৃত।

দাম

যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
নাগরিকা যক্ষ ও যক্ষিণী,
কঠিন শিলার গায়
স্তব্ধ লিপি বিলুপ্ত ভাষার,
সেখানে অনেক পলি জমে আছে
গাঢ় বিস্মৃতির।
বহু শতাব্দীর বৃষ্টি রোদ
ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছে নশ্বর উল্লাস।

শ্রান্তপদ কোনো পর্যটক
দূর গ্রামে আতিথ্য-প্রত্যাশী
হয়ত ওখানে এসে
দৈবাৎ পেতেও পারে
ভাঙা এক টুকরো শিলালিপি,
শিলীভূত কামনার মত
উরসের অংশ কোনো মূর্ত অপ্সরার।

হয়ত প্রলুব্ধ হয়ে
মৃত্তিকার পরতে পরতে
এক-একটি ভাঁজ খুলে তন্ময় উৎসাহে
নিমজ্জিত হতে চাবে একান্ত উৎসুক
প্রাণস্রোতে লুপ্ত শতাব্দীর।

অকস্মাৎ চোখ তুলে চায় যদি তবু,
শস্যের তরঙ্গে ঘেরা দূর গ্রাম
পড়বে নাকি চোখে?
সরোবরে ঘট নিয়ে চলেছে যে জনপদবধূ
আকাশ মুখর করে' উড়ে যায় যে কটা শালিখ,
সে-মুহূর্তে আদিগন্ত প্রসারিত জীবনের মেলা—
সমস্ত অতীত তার ভগ্নাংশেরও দিতে পারে দাম?

ঘুম-পাহাড় জুড়নদ্বীপ

কোথায় যাবে? ঘুম-পাহাড়?
জুড়ন-দ্বীপ?
তুহিন-শিখর তুষার-কণা মেখে ঘুমায়!
ভাবছ, আছে নীল সাগরের নন্দিনী
ঢেউগুলি যার সামনে ফণা
আপনি নামায়!

ঘুম-পাহাড়ে একটি চুড়ো খুঁজতে চাও?
মেঘেরা যার দেখায় না মুখ
ঢেকেই রয়!
স্মৃতির যত কালিমা সব মুছিয়ে দিয়ে
কুয়াশা নয়,
শুভ্র বুঝি বাতাসই বয়!

ঘুম-পাহাড়ে কী পেতে চাও,
বিস্মরণ?
পৌঁছবে না, ভাবছ ধুলো-ধোঁয়ার লেশ!
শুধু নিথর নীলের ধ্যানে নিমগ্ন
তুলবে দুটি মুগ্ধ আঁখি
নির্নিমেষ!

কিংবা বুঝি চূর্ণ সোনা
বালির গায়

এলিয়ে হৃদয় ঢেউয়ের ধবনি শুনতে চাও ?
—সাগর-পাখি যেমন ডানা ছড়িয়ে ভাসে,
ফেনার ছিটের সঙেগ মেলায়
শূন্যতাও।

কোথায় পাবে ঘুম-পাহাড়,
জুড়ন-দ্বীপ ?
ক্লান্ত মনে মরীচিকার কারসাজি।
সে-ই তালি দেয় ছেঁড়া কাঁথার কল্পনায়
কাঁথার মায়া ছাড়তে যেজন
নয় রাজী।

আছেই তবু আছে কোথাও ঘুম-পাহাড়।
জুড়ন-দ্বীপও নয়'ক অলীক স্বপ্নসার।
এই শহরের রাস্তা সারাও,
বাড়াও ত।
পায়ে পায়ে-ই জুড়ন-দ্বীপ আর ঘুম-পাহাড়।

ঈশারা

যেখানে তোমার ছায়া
খরস্রোত জলে কাঁপতে গিয়ে
হার মেনে আচমকা
ডাক ছেড়ে উড়ে যায়
তীরবেগে ফুলঝুরি পাখির মতন,
নিঃশব্দ জঙগল এসে পা টিপে পা টিপে
পেছনে ওত পেতে থাকে
একবার পিছলে পড় যদি,
সেখানে অতল থেকে
ঝকঝকে জলের বিদ্যুৎ
মাঝে মাঝে দেয় যদি রুপোলী ঝিলিক
জেনো সে ত মাছ নয়,
যে সব কল্পনা
কলমের ফাঁদে ধরতে গিয়ে
ফস্কে গেছে কৌতুকে পালিয়ে,
তারাই ঈশারা করে কটাক্ষে বিলোল,
নেমে এসো
গাঢ় স্রোতে নেমেই দেখ না।

অঙক

একটি কঠিন অঙক
চিরকাল স্লেটে লেখা আছে,
তবু তা পড়ে না চোখে,
এত বড় প্রকান্ড সে স্লেট!
আকাশটা বড় হয়ে
ছড়াতে ছড়াতে
কিছুতেই তাকে আর ছাড়াতে পারে না।

সে অঙক না কষো যদি,
ক্ষতি নেই।

মাটি, জল, গাছ শুধু চেনো,
বেদনার মূল্য দিয়ে
কিছু আশা
এ সংসারে কেনো।

তাই নিয়ে নাড়ো চাড়ো।
সেই স্লেট ছোট হয়ে
জানালার ফাঁকটুকু হবে হয়ত বা।
শূন্যই উত্তর হয়ে
অঙক হবে দিগন্তের শোভা!

অনাবিষ্কৃত

এমনি দূরেই থাক্
বৃষ্টি হোক অন্য দিগন্তের।
আমি শুধু বাতাসের
স্পর্শে পাই আর্দ্র কোমলতা।

নাই হল আবিষ্কার।
কোন এক গুপ্ত পাণ্ডুলিপি
লুকিয়ে রাখুক তার
অপরূপ মধুক্ষরা শ্লোক,
আধ-অপঠিত।

পৃথিবী'ত দুরাশার চেয়ে ঢের বড়
তবুও নির্মম নয় বুঝি।

বলাকার বিচ্ছিন্ন পাখিও
আকাশের কান্না হয়ে গলে'
তাই কোন তীরে ঝরে পড়ে।

হয়ত তাকেই খুঁজে
এ জীবনে হারাতে হারাতে
অন্য কোন দ্বীপে গেছি ঠেকে।

ক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত হৃদয়
ভাঙা ডানা নিয়ে তবু
সব সীমা অনায়াসে সয়।

গল্প জানি লেখা ছিল ঠিক।
নিয়তি নড়েছে এক চুল,
প্রাণের প্রচ্ছদপটে
তাই শুধু এ ছাপার ভুল।

কাগজের নৌকো

কাগজের নৌকো যদি না-ই পায় পণ্যের বন্দর,
ঠেকতেও পারে কেশবতী কন্যার স্নানের ঘাটে।
কেশবতী সেখানে কি এখনো চুলের রাশ নিয়ে
কাঁচস্বচ্ছ জলে শুধু দেখে বসে আপনার ছায়া!

কেশবতী কেউ নেই, নেই কোন কাকচক্ষু নদী,
জলে যার সারাক্ষণ শুধু এক স্থির ছায়া কাঁপে।
কবে পাহাড়ের ঢল সব নদী করে' গেছে ঘোলা,
মেঘের মতন চুল কবে সাদা শণ হয়ে গেছে!

তবু কাগজের নৌকো আজও ভাসে নালায় ডোবায়,
নর্দমাতে ডুবি হয়ে ঝাঁঝরিতে বাড়ায় জঞ্জাল।
শুধু তার দুঃসাহস কিছুতেই মানবে না'ক হার।
সে জানে এ বর্তমানই দুঃস্বপ্নের মিথ্যা রূপকথা।

কালিদাস

এ নয় সে উজ্জয়িনী,
শিপ্রার সলিলে যার সৌধচূড়া-ছায়া
একদিন বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত-চকিত

হরিণ চিতা চিল

লোলাপাঙ্গ-আঁখি পৌরাঙ্গনা
মালবিকা মঞ্জুলিকা চিত্রলেখাদের
কঙ্কণ-নিক্কণ-ছন্দে জলকেলিভরে
সুখাবেশে হয়েছে কম্পিত;
নগরীর স্বপ্নসম পারাবতগুলি
যার নীলাকাশ নিত্য করেছে স্পন্দিত,
দূরে দূরান্তরে
মহাকাল মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি যার
অভয় মধুর বার্তা নিয়ে গেছে বয়ে।

ইতিহাসে আমাদের আরেক প্রহর
মেলেছে আরেক পট।
ঊর্ধ্বশ্বাস এ নগর
সুবিস্তৃত রাজপথে, সঙ্কীর্ণ গলিতে
কি যে খোঁজে বুঝি না'ক সব।
শুধু ভয় হয়,
অতিকায় উদ্যোগের ঘর্ঘরিত রথচক্রতলে
হৃদয়ের মূল্যটুকু হেলায় বা যাই বুঝি দলে!

তাইত তোমারে স্মরি,
মহাকবি, সময়ের স্বভাব সম্রাট!
কালের সীমার ঊর্ধ্বে চিরমুক্ত হৃদয় তোমার
আমাদের বিব্রত এ বিশীর্ণ জীবনে
সঞ্চারিত করে যাক চিরন্তন সুষমা সৌরভ।
ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ আমাদের দিশাহীন মন
খদ্যোতের মত জ্বলে
থেকে থেকে ক্ষীণ নিরুত্তাপ,
প্রত্যহের প্রয়োজনে সঙ্কীর্ণ সীমিত।
সহসা সাক্ষাৎ যেই পাই
কালাতীত তোমার সত্তার,
সীমার শাসন ভেঙে খুলে যায় আশ্চর্য দুয়ার হৃদয়ের।
রূপৈশ্বর্যশোভাময়ী এ ধরার গূঢ় অর্থ
খুঁজে পাই ফের।

ইতিহাস-মুগ্ধ-করা উজ্জয়িনী রূপসী নগরী!
জানিনাক কোথা কোন কুটীর-অঙ্গনে তার বসে'
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
দেখেছিলে নীলোৎপলপত্রকান্তি
প্রথম সে প্রাবৃটের মেঘ।

দৌত্য দিয়ে তারে
কোথায় পাঠায়েছিলে
কল্পনার কোন অলকায়!
কিংবা মনে হয়,
যক্ষের বিরহ বুঝি শুধু তব ছল।
মেঘমুগ্ধ আপনি বিহ্বল
শিখরিদশনা কোন তন্বী শ্যামা বরাঙ্গনা লাগি
বাষ্পাকুল হৃদয়ের সব ব্যাকুলতা
মন্দাক্রান্তা ছন্দে গেঁথে দিয়েছ ভাসায়ে
নভোচর মেঘের ভেলায়।

সে আশ্চর্য মেঘদূত
পার হয়ে কালের আকাশ
উড়ে চলে যুগে যুগান্তরে
অনাগত দিন রাত্রি মাধুর্যের ধারা স্নিগ্ধ করে'।

বিলুপ্ত সে উজ্জয়িনী,
কালকুক্ষিগত,
—বলে ওরা।
জীবনের চলমান স্রোত
কোথায় পশ্চাতে তারে ফেলে এল চলে।

ধ্বংসস্তূপ সেদিনের
স্মৃতির কঙ্কাল নিয়ে পড়ে থাকে, থাক।
অন্য এক উজ্জয়িনী
রেখে গেছ গড়ে'
শাশ্বত কালের চিত্তে,
আনন্দ-স্পন্দিত আত্মা দ্বীপময় মহাভারতের
যার মাঝে মাধুর্যে বিম্বিত।

তোমার সে উজ্জয়িনী, অক্ষয় অম্লান
ছন্দিত অমরাবতী।
যুগে যুগে চলে যাত্রিদল
সে মহাতীর্থের পানে,
যাবে চিরদিন, সৌন্দর্যপিপাসী যারা।

ভারতের প্রাণ-উৎস হ'তে উৎসারিত
সুন্দরের পরম প্রকাশ,
শুধু ভারতের নয়,
সর্বকালে সকলের

হরিণ চিতা চিল

মহাকবি তুমি কালিদাস।

পর্দা

হাওয়ায় পর্দা দুলবে
কেবলই দুলবে!
দেখা যাবে, কিছু যাবে না।
জানা-অজানায় মনে যত কেউ
তুলবে,
অর্থ সবার পাবে না।

চকিতে দেখিয়ে আধখানা মুখ
রহস্যে ফের ঢাকবে।
শুধু বিদ্যুৎ-কটাক্ষে কোথা ডাকবে।
না গিয়ে শান্তি পাবে না।
যতই এগিয়ে যাও না সামনে,
সংশয় তবু যাবে না।

যদি দিশাহারা পান্থ,
হয়ে থাকো উদ্‌ভ্রান্ত,
জেনো এ মধুর বিভ্রমটুকু
দিয়েই বানানো প্রাণ ত!

হিসাব

তাদেরও দেখেছি
হাত পা এলিয়ে পোলের কানায় শোয়া,
রাতের কুচিৎ ছুটে চলে যাওয়া
গাড়ির চাকার ধ্বনি
বৃথাই যাদের মড়ার মতন বেহুঁশ ঘুম কাঁপায়।

নীচে কালো নদী সুদূর পাড়ের
সোনালী আলোয় কষা
দাগগুলো ভাঙে ছলছল স্রোতে
আছড়ে পাথুরে থামে।
ওপরে সাহসী দু-একটি তারা
উঁকি দেয় নগরের

রুগ্ন ধোঁয়াটে ঘন নিশ্বাস
ক্লান্ত হাওয়ায় নেড়ে।

কী রূপক মন টানতেও পারে
তেশূন্যে এই অঘোর নিদ্রা থেকে,
কী গভীর কথা আদি ও অন্ত-ছোঁয়া!
তবু কেন শুধু গোপন ক্ষতের
না-বোঝা জ্বালায় জ্বলি?
কার কাছে চাই কড়া ও ক্রান্তি
হিসাব ক্ষমাবিহীন,
—জীবন, না কি সে শুধুই নগরপাল?

দ্বিজ

কিংখাবে জরির কাজ
মিহি বুটি রেশমী মসৃণ,
সূক্ষ্ম আঙুলের স্পর্শে অনুভব করে' জানি বটে,
পাব না প্রাণের জাদু,
তবু নই জীবন-বিমুখ
যখন রাত্রের বাতি নক্ষত্র-সভাকে দূরে ঠেলে,
জ্বলে স্থির
বিনিদ্র আমার যন্ত্রণায়,
জড়ে ফের নবজন্ম নিতে।

শুধুই কি প্রাণ আমি,
অন্ধ স্রোত জননে হননে?

দ্বিজ হব তপস্যায়
এই মোর গূঢ় অঙ্গীকার।

তোমাকেও তাই শুধু খুঁজি না'ক নগ্ন বাসনায়।
সুনিপুণ দৃঢ় হাতে তীক্ষ্ণ পল তুলি
সুকঠিন কামনার গায়।
হৃদয়ের তন্তু বুনি
সূর্যাস্ত-পরাস্ত-করা রঙে।

পুষ্প নয়, পূতিরে, ফেরাই
স্বপ্নাতীত সুরভিতে।

লুব্ধ আমি তোমার শরীরে,
মনও চাই।
তবুও অতৃপ্ত থাকি,
যতক্ষণ এ উন্মত্ত মোহ
মথিত জারকে জীর্ণ না হয় মদিরা গাঢ়রতি।

এই রচনায়
তারপর তোমাকেও কখন ছাড়িয়ে
দ্বিজ হই তপোবনে
অন্তহীন রহস্য–সত্তায়।

সেইখানেই

সমুদ্র থেকে জলা জঙ্গল
ঘাস আর চাষ
সবই আছে রক্তে।
মাটি পোড়ানো থেকে বাজি ছোড়ায় পৌঁছে'
বুকটা যখন দশ হাত,
এই যে চড়ায় পড়লাম আছড়ে,—
কোন্‌টা ঊর্ধ্ব কোন্‌টা অধঃ
হঠাৎ গেল গুলিয়ে।

নিজের সঙ্গে কি আমার কড়ার?
মনে করতে পারি না।
কী যেন ছিল ঠিকানা
জরুরী চিঠি পৌঁছে দেবার,
বারুদমাখা হাতে কখন গেছে মুছে।

খুঁজব তবু খুঁজব।
নিভৃতির সায়রে
শুধু নিজের মনের ছায়ায় নয়;

অগুনতি পায়ে মাড়ানো
ধু–ধু পথ
ধাঁধায় যেখানে জড়ানো
সেইখানেও,—
সেইখানেই।

তেরো নদী

আজও তারা বয়,
সেই তেরো নদী
অজানা তেপান্তরে।
রাখাল বটের ছায়ায় ঘুমায়
শ্যামলী ধবলী চরে।

মেঘেরাও বুঝি আকাশের ধেনু
দিগন্তে থাকে আঁকা,
নড়ে না হাওয়ায়।
সেখানে যা কিছু
অজর আরকে রাখা।

ভুল, সব ভুল!
সে নদীতে কবে
শুকিয়ে পড়েছে চড়া।
বালিতে হারানো ধারা তার আর
বয় না কলস্বরা।
ঘুম ভেঙে উঠে রাখাল-ছেলেরা
এই নগরেই হাঁটে।
সূর্য তাদের দূর দিগন্ত
রাঙিয়ে বসে না পাটে।

তাদের সকাল
দেয়ালে আড়াল
কখন আসে যে যায়,
টের পেতে পেতে
ঘোলাটে বাতির ধোঁয়াটে রাত ঘনায়।

তবু তেরো নদী
চাই না খুঁজতে
কোথাও তেপান্তরে।
শুধু থাক্ তার মায়ার কাজল
নয়নে ও অন্তরে।

পায়ে পায়ে এই জড়ানো শহর
ভয়ে ভয়ে চোখ-তোলা,
খুঁজে পেতে পারে হয়ত দুয়ার
আরেক আকাশে খোলা।

চিত্ত-সহচর

মাঝে মাঝে পাখি নামে
বুঝি বা আকাশে পথ ভুলে,
যেখানে শুকনো নদী
হারানো জলের ক্ষতে আঁকা।
সেখানে কী যেন খোঁজে
সকাতরে এদিক ওদিক,
তারপর কার ডাকে
উড়ে যায়, ফিরে চায় না'ক।

ক্ষীণ পদচিহ্ন বুঝি
বালুচরে জাগে কিছুক্ষণ,
যতক্ষণ হাওয়া এসে
উদাসীন বালিতে না ঢাকে।

উদয়াস্ত শুধু এক
ধূসরতা নিত্য ধ্যান করে'
সে পাখি এসেছে কি না
হৃদয় যখন ভুলে যায়,

তখন হঠাৎ বুঝি
কোনদিন দেখে চমকাই,
একটি নিঃসঙ্গ ফুল
শূন্যতার শোনে নি নিষেধ।

পাখিরা যাক না উড়ে
আদিগন্ত হোক না ধূসর,
একটি সাহসী ফুল
থাক্ শুধু চিত্ত-সহচর।

নিরর্থক

দরজা জানলা ভেজাও যত না
আকাশই তোমায় খুঁজবে!
পাল্লা, সার্সি, ফাটলে, ফুটোয়,
কত কাঁথা কানি গুঁজবে!
উঁকি দেবে, দেবে, দেবেই,

যতই ভাবো না কিছু নেই,
একদিন ঠিক শিরায় শোণিতে
ছটফটে ছোঁয়া বুঝবে!

যেখানেই কেন রওনা হও না,
ঘরেই নিজের ফিরবে!
তেপান্তরেও হারাতে চাইলে
সেই দেয়ালেই ঘিরবে!
ছাদে ঢাকা দেবে, দেবেই,
যতই ভাবো না কিছু নেই,
হেঁসেলে, গোয়ালে, আসরে, বাসরে,
মামুলী ছক কে ছিঁড়বে?

নিরুদ্দেশের পাল তুলে তবু
নিজেরই সীমায় দুলবে,
যেখানেই কেন উধাও হও না,
প্রাণ তার বেড়া তুলবে!
বেড়া দেবে, দেবে, দেবেই,
যতই ভাবো না কিছু নেই,
ছাড়া পেতে ছোটো যেখানে, খুঁটির
বাঁধন কি করে খুলবে?

যে-ঘাটেই কেন নোঙর ফেল না,
সাগর তবুও ডাকবে!
তরী ছেড়ে যদি তরু হও তবু
ঝোড়ো হাওয়া ডালে লাগবে!
নাড়া দেবে, দেবে, দেবেই
যতই ভাবো না কিছু নেই,
ফসলের জল ঢালে যে, সে-মেঘই
মোহ-মুদ্গর হাঁকবে!

অধ্যাহার

ছড়িয়ে পাশার দান,
দ্যূতক্রীড়া রাজ্য আর নির্বাসন সব
হলে আস্বাদিত,
সেই এক বিমূঢ় জলায়
পঞ্চপাণ্ডবের মত
সবাই দাঁড়াই একদিন।

হরিণ চিতা চিল

প্রস্থান-সায়াহ্নে নয়।
নির্দিষ্ট অজ্ঞাতবাস তখনো সুদূর,
কুরুক্ষেত্র অনিশ্চিত।
এ জলায় তারও আগে
পৌছতেই হয়।

আমরা পাণ্ডব নই।
জীবনের ব্যাস আজ প্রসারিত ভিন্ন বৃত্ত ছুঁয়ে।

আমরা নগর গড়ি শঙ্কিত সান্নিধ্যে।
রাজপথ দিয়ে তার সাবধানী ভীরুতাকে কেটে
মেটাই দিগন্ত-তৃষ্ণা।
হাটের নিনাদ-ক্ষুব্ধ
হৃদয়ের মর্মর-প্রার্থনা
তুলি শূন্যে স্তব্ধতার সবিস্ময় ধ্যানে।

ক্ষুধা ও স্বপ্নের বীজ বুনি ক্লান্তিহীন
জীবনের কর্ষিত বিস্তারে।

তবু এই স্থাবর বিন্যাস
ছাড়িয়েও আরেক তোরণ
খোলে একদিন।
দেখা দেয় সেই জলা দিক্‌চিহ্নহীন।

স্নেহ প্রেম ক্ষুধা আর স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার
যে সব রঙিন সূত্রে জীবনকে গেঁথে
ধরে রাখি স্বধর্মগোচর,
এ জলার কটু আর্দ্রশ্বাসে
সব ছিঁড়ে যায়।
অন্তহীন গাঢ় কুয়াশায়
সে কোন্ অন্বয় ধর্ম
মেলে রাখে ধূমায়িত প্রশ্ন শুধু দুই,
— অস্ফুট এ চেতনায় অস্থির সময়
কতটুকু, কেমই বা ছুঁই?

নবজন্ম নিয়েও যে অধ্যাহার করে নি পাণ্ডব,
তারই দায় নিয়ে চলে
অর্ধমুক্ত আমাদের এ সত্তা জান্তব।

লক্ষ্মণ

হৃদয় রঙিন মেঘ
আবেগের বাষ্প দিয়ে গড়া,
জানে না স্থিতি কী রূপ।
জীবনের অস্থির ব্যজনে
বেগে কিম্বা কখনো মন্থর
ইতস্তত বিতাড়িত নিরাকার শুধু আন্দোলন!

শপথের তীব্র তাপে সে হৃদয়
করে শুষ্ক শিলা,
অবিচল ধর্মে তার সব বেগ করেছ দমন।
দুর্বলতা প্রাণ যার
সে-চিত্তের স্থপতি লক্ষ্মণ।

মানুষ কত কী চায়!
—স্নেহ, প্রেম, সৌভাগ্য, প্রতাপ।
ব্যথায় কাতর হয়, আনন্দে অধীর,
মেনে নেয় হার জিত, প্রমাদে ও পরীক্ষায়
আকাঙক্ষার উদ্দাম সংগ্রামে,
কখনো অনন্ত হতাশায়
স্বেচ্ছায় নেভায় দীপ আত্মঘাতী তিমির-বিলাসে।

তুমি বুঝি সর্বাতীত।
পরেছ অভেদ্য বর্ম,
জীবনের সব স্পর্শ তীক্ষ্ণ কি কোমল
যাতে ঠেকে ব্যর্থ হয়ে যায়।

তবু ভাবি কোনদিন দীর্ঘ বনবাসে
অরণ্য-কাঁপানো কোনো হাওয়া
অকস্মাৎ তোলে নি কি বুকে
বিচ্ছেদ-কাতরা কারো অর্ধস্ফূট সম্ভাষ-মর্মর!
হৃদয় কি একবারও হয় নি উতলা,
ভোরের শিশির তার অশ্রুকণা বলে ভুল করে?

অলীক কল্পনা জানি।
জীবন-তরঙ্গে এক বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প-শিখর
ব্যঙ্গ করে চিরদিন
আমাদের হৃদয়কে কোমল ভঙ্গুর।

বিস্ময়-প্রশস্তি সব পেয়েও সে তাই
দুর্নিরীক্ষ্য শূন্যতায় দূর।

সীমান্ত

সকাল না হতে ঘরটার পাশে
পাখিদের মেলা বসে,
অজানা ঝাঁকড়া লতাটি যেখানে
বারান্দা ছেয়ে আছে।

আধ-তন্দ্রার আঁধারে সে যেন
শব্দের ঝিকিমিকি,
যেন রাত্রের জোনাকির ঝাঁক
মুখর মূর্চ্ছনাতে।

যবনিকা ওঠে কেঁপে,
আঁধারে আলোয় স্বপ্নে সত্যে
গুলিয়ে দুলিয়ে যায়।

জাগাও হয় না, সুপ্তির ঢেউ
সফেন কেবলই ফেরে,
ঘুমনোও নয়, বিলুপ্তি থেকে
ওঠে যেন বুদ্বুদ।

এ আচ্ছন্ন গোধূলি-চেতনা
অলীক বিলাস বুঝি।
গাঢ় রাত নয় গহন মৌন,
নয় খর দিবালোক।

শুধু হৃদয়ের সীমাহীন তটে
নিরাকার কুহেলিকা
হতে চেয়ে কিছু-না-হওয়ার থাকে
নেশায় মগ্ন হয়ে।

তবু যেন এই চিৎ-সীমান্তে
লুপ্ত কি এক নদী
মৃদু মর্মরে তোলে মাঝে মাঝে
অস্ফুট আলোড়ন।

হয়েছে, যা হবে, পারেনিক' হতে

সব মিলে একাকার;
অতল অর্থ-সঙ্কেত নিয়ে
আসা-যাওয়া-থাকা ভাসে।

বন্দিনী

হে উতলা নদী
নাইবা সাগর পেলে।
সাধ করে বেঁধে আপনারে থাকো
এখানেই হেসে খেলে।

এখানেই এই ঘাটে-আঘাটায়
উৎসুক আশা পার করো নায়।
উচ্ছল হোয়ো শুধু দু'বেলায়
চপল খুশির ঘায়।

অতৃপ্ত নদী,
জানি যে মেটে নি ক্ষুধা।
যে বন্যা-বেগ সিন্ধুরে খোঁজে
সে আজ স্নেহে বসুধা।

তবু যদি পার এই সীমানায়
ভরে রেখো বুক কানায় কানায়
সূর্যের শাপ যেন হার মানে
শীতল ভর্ৎসনায়।

সবুজে ও পীতে একটু রঙিন
তূলির লিখনে কেটে যাক দিন,
সাগরের ডাক ক্ষীণ হয়ে হোক
স্নিগ্ধ মাটিতে লীন।

হে মুখরা নদী
মৌন হতেও শেখো।
কোন এক গাঢ় গভীর ধ্যানের
নীল ছায়া ধরে রেখো।

হরিণ চিতা চিল

পালাতে পালাতে কতদূর ?

ওদিকেও সেই পিচের রাস্তা অজগর-গ্রাসে খুঁজছে !
বনের সবুজ গাঢ় মন্থরতা
লাঙলে কুড়ুলে ভ্রষ্টা।

হরিণ, আমার হরিণ,
তোমার জন্যে জাদুঘর দেব বানিয়ে।
সেখানে তোমার অবোধ চাউনি বরফে থাকবে জমানো।

চিতা, ও তীব্র চিতা।
আঁধারে দু'চোখ কার লালসায় জ্বালবে ?
যে-হিংসা যায় দুঃসহ তাপে
ভালবাসাকেও ছাড়িয়ে,
তার উল্লাস লাল বিদ্যুতে
মৃত্যুকে মানে দেবে না
আর ত দেবে না।

ও চিতা, তোমায় পুষব,
ঠান্ডা গরম কমানো বাড়ানো
যেখানে স্বেচ্ছাধীন।
শুধু তুমি চিল
একলা আকাশে ঘুরবে,
দেখবে বাধ্য নদীরা বইছে
স্বচ্ছলতার পণ্য।
জরিপ চলেছে মানচিত্রের ফাঁকগুলো সব ভরতে।
আকাশের মেঘ হুকুম-মাফিক গরজায়।

তবুও কখনো নামতেই হবে তোমাকেও।
নীড় কি তখন খুঁজে পাবে আর
কোনো দুর্গম শিখরে ?
ছোঁ মেরে যা নেবে
তাও বুঝি শুধু স্বস্তির উচ্ছিষ্ট।

শূন্যের চোখ নিষ্পলক
ও চিল, চিল!
প্রত্ন-পলির সাত-পুরু ভাঁজ ফুঁড়ে
শুধু জীবাশ্ম পাও কি!

অগ্নিগর্ভ গহ্বর সব বোজানো ?

শঙ্কাশুদ্ধি

শুধু ছায়া ছম্ ছম্
হাওয়া ফিস্ ফিস্।
সহস্রাক্ষ অমারাত্রি নিঃশব্দে কখন
সন্তর্পণে লঘুপায়ে চিতার মতন
বিছানার প্রান্তে এসে নিয়ে যাবে ঘ্রাণ,
প্রাণের অতলে সেই গূঢ় গুহাশ্রিত গাঢ় জলে
আতঙ্কের ঢেউ তুলে উল্লাস প্রমাণ।

সারাদিন চোখ মেলে যত কিছু দেখি
সে শুধু আলোর দেখা।
বিপরীত আরেক বীক্ষণ
তিমির মন্থন করে' এ সত্তার লুপ্ত ভাষ্য চায়।
তাই একা স্পন্দিত হৃদয়ে
শ্বাপদ-রাত্রির ক্ষীণ
স্বপ্নলঘু পদধ্বনি শুনি রুদ্ধশ্বাস।

জীবনের ভিত্তিমূলে আদিম যে ভয়,
ধাপে ধাপে যন্ত্রণার
বিরঞ্জন, পরম পাতনে
হবে শেষে নির্মল বিস্ময়।

ভস্মলোচন

কোন্ মুলুকে চরে জানো
ভস্মলোচন হায়না ?
মড়া চিবোয়, আধমরাদের;
জ্যান্ত ভয়ে খায় না।

জ্যান্ত এবং মরায় যেথায়
তফাৎ নাই
হায়না হাসে সেই শ্মশানে
শুনতে পাই।

ও মড়া তুই জাগবি নে ?

থাকবি পড়ে ভাস্টবিনে!
নিজের খুলি খুলে ধরে
পরম কারণ চাখবি নে?

ভস্মলোচন হায়না
সব মুলুকেই স্যায়না।
লকলকে জিভ বুলিয়ে বেড়ায়,
যেথায় তাকায় সবই পোড়ায়
নিজের মুখে চায় না।

ও মড়া তুই জ্যান্ত হ,
আন্ দেখি সেই আয়না।
নিজের চোখেই নিপাত ডাকুক
ভস্মলোচন হায়না।

শব–জাগানো মন্ত্র দেবে
কোন্ কাপালিক ভৈরবী?
অরণ্যে সার করুণ রোদন,
ছড়া কেটেই যায় কবি।

ফোঁড়া

একটি দানাও নেই হাঁড়িতে
উনুন তবু জ্বলবে।
কাঁকর পাথর যাই না চাপাও
সে আগুনে গলবে।

বৃষ্টি বানে যতই ভাসাও,
একটি আছে ফুলকি,
—ভিজে ছাইয়ের গাদায় গোঁজা
বোবা মাটির হুল কি?

সেই হুলে শেষ বিঁধে আকাশ
রাঙা হয়ে পাকবে।
অন্ধকারের মলম দিয়ে
কত সে ঘা ঢাকবে!

রক্তমুখো উঠবে রবি
ঢালবে আগুন ঢালবে।

পোড়া চেলাকাঠের চোঁচ্‌ই
বিষফোঁড়াটা গালবে।

চীনা তর্জমা

দুঃখী নগর

দুঃখী নগর কি চাও, শুধাই যদি,
বলবে হয়ত, একটি ছোট্ট নদী,
—তপ্ত হৃদয় যে চোখের জলে ধোবে,
রাতের তারারা যাতে এসে কাছে শোবে,
যার গায়ে কেঁপে কঠিন অচল ছায়া
অসম্ভবের হবে ক্ষণিকের জায়া।
দুঃখী নগর ভুলে গেছে কবে তার
নদী ছিল এক। আজ সে সখী নালাব।

দুঃখী নগর, যদি বলি কিছু চাও,
বলবে হয়ত, দু-একটি মেঘ দাও,
—মলিন আকাশ যে মেঘ আধেক ঢেকে
এ রূঢ় রৌদ্র করুণায় দেবে মেখে,
ভীরু যত সাধ চিলের ডানায় উড়ে
যে মেঘের স্নেহ মাখবে ক্ষণিক ঘুরে।
দুঃখী নগর ভুলে গেছে কবে তার
মেঘ সব নেমে পথে পাঁকে একাকার।

ভেলকি

এক ফোঁটা জল দাও যদি এই
ধুলোও দেখাবে ভেলকি,
কোথা থেকে ঠিক প্রাণের সবুজ আনবে।
একটু সদয় হলে সে, হৃদয়
হবে নাক' উদ্বেল কি ?
অসম্ভবের সীমানা তখন মানবে।

অনাবৃষ্টির আকাশে তাকিয়ে তাকিয়ে
চোখ জ্বলে গেল। মেঘ না আসুক জাঁকিয়ে,

হরিণ চিতা চিল

দুটো ছিটেফোঁটা ঝরাবার মত করুণা
চায় শৈবাল। সে কিছু বিশাল তরু না।

সাগর থাকুক লোনো তরঙ্গে
পৃথিবীর বুক দুলিয়ে,
আকাশ থাকুক চন্দ্র সূর্য ঘোরাতে।
সজল নয়ন দুটি যদি থাকে
তারি জাদু-ছোঁয়া বুলিয়ে
পারি এই ধুলো সবুজ স্বপ্নে ভরাতে।

খুঁত

ঘরটা একটু অগোছাল থাক
উঠোনে একটু ধুলো।
পাকা দেওয়ালের কঠোর জ্যামিতি ভাঙতে
বন্য লতাটা তুলো।

অন্তরে কিছু সংশয় থাক
ভাষায় একটু দ্বিধা,
কিছু ভুল কিছু কাটাকাটি নিয়ে
জীবনের মুসাবিদা।

নিরেট সত্য নিখুঁত মাধুরী
ছাপানো-ই পাবে কিনতে।
শুধু নির্যাস চায় না'হৃদয়
পুষ্পতরুর বৃন্তে।

কিছুটা ভেজাল কিছু খাদ দিয়ে
সব মধুরের খেলা।
মর্ত্যের মাটি ময়লা বলেই
এখানে প্রাণের মেলা।

মেলাবে

সূর্যাস্তেও চাপাবে উপরি রঙ'
শিশুর মুখের সরলতা এঁকে বাড়াবে?
পাগড়ির পাক মাথায় মিথ্যে জড়িয়ে
প্রাণের জ্বালা কি সাবাবে'

আর না হৃদয়, আর না।
      সদর রাস্তা ছাড়ো।
এখনো একটা মাঠ
      খুঁজলে পেতেও পারো।

সেখানে কিছুই হয় না, কিছুই হয় না।
মেঘ করে, আর হাওয়া দেয়, ঝরে বৃষ্টি।
ঘাসের ডগায় পতঙ্গ এসে বসে;
উড়ে চলে গেলে কাঁপে কিছুখন শিষটি।

কে জানে, হয়ত কে জানে
      সেখানে মেলাবে ছন্দ,
তীর আর স্রোতে, থামায় চলায়,
মেরু ও মরুর দ্বন্দ্ব।

নতুন কবিতা

শ্যামা

প্রথম উন্মীলিত চেতনার
সেই প্রাগুষা থেকে
আর্ত প্রাণের আকুল প্রার্থনা
আকাশে ধ্বনিত,—
"যত্তে দক্ষিণমুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।"
সর্ব ভয় থেকে পরিত্রাণের জন্যে
সেই একই কাতর মিনতি,—
"মা মা হিংসি।"

কিন্তু ভয়কে কেমন করে এড়াবে?
জীবনেব বনেদে
কামনা-মূলের মধ্যেই তা গাঁথা।
তাই,
পরিত্রাণ নয়, চাও উত্তরণ।
চরম ভয়ালতাকেই দাও পরমারাধ্যার মহিমা।
নগ্ন করো তাকে
মহাতমিস্রার রহস্য-ঘনিমায়,
"মহা মেঘ প্রভাং শ্যামাং
তথা চৈব দিগম্বরীম্,"
ছিন্নমুণ্ডের উন্মত্ত নৃশংসতায়
তাকে করো অলংকৃত,
"ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং
পীনোন্নত পয়োধরাম্,"
সৃষ্টির সমস্ত বিভীষিকা
মথিত জারিত করে তোলো
প্রলয়-ছন্দের নৃত্য-লীলার উন্মাদনায়,
"শবানাং করসংঘাতৈঃ
কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারা
বিস্ফুরিতাননাম্"।

সমস্ত বীভৎসতা থেকে শোধিত হয়ে
জীবন-মূলের আতঙ্ক তখনই হয়ত পৌঁছোবে
নিষ্কম্প উল্লাসের নির্মলতায়।

প্রভৃতি

কেউ কেউ শুধু বুঝি
মূর্তি হতে চায়,
—মূর্তি আর কীর্তিস্তম্ভ
ধাতুতে ঢালাই কিংবা পাথরে খোদাই,
দীর্ঘ ছায়া ফেলতে চায়
অনাগত কালের দিগন্তে।

পাদপ্রদীপের আলো জ্বেলে সারাক্ষণ
সে এক প্রকাশ্য বাঁচা,
—শিরোনামা-অস্তিত্বের ঘটা।
ইতিহাস শুধু বুঝি
এই সব নিনাদিত নাম দিয়ে গাঁথা।

প্রাণের গভীরে তবু জানি,
অকাতরে নিজেদের মুছে রাখে, তাই
দুটি নাম অবিস্মরণীয়,—
প্রভৃতি, ইত্যাদি!

বই নয়

সাজানো অক্ষরে বন্দী
বই নয়
এ সৃষ্টি পৃথিবী,
—তন্ন তন্ন পড়ে ফেলবে সব!
জীবনটা অবিকল
ছাপানো পাবেনা
দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে।

মানচিত্র আঁকি যত
নিখুঁত নির্ভুল
অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার
চুল-চেরা হিসাবের ছকে,
এ পৃথিবী কোনোদিন
সে মাপে মেলে কি?

সাগরে পাহাড়ে আর
নিরুদ্দেশ দিগন্তেই নয়,
সামান্য পাথুরে ঢিবি
কিংবা তারই ফাটলের ফাঁকে

এক গুচ্ছি দুঃসাহসী ঘাসে
পৃথিবী কৌতুকে রঙ্গে
ভূগোলের সব-ছক-ছেঁড়া হাসি হাসে।

পার্থিব

অলজ্জ আমার পার্থিবতা!
তারও পিপাসা বুনে রেখে যাই।
নদী হয়ে যদি না বয়,
আকাশ না ঢাকে সজল মেঘের আশ্বাসে।
ক্ষমাহীন ক্ষোভ হয়ে
কাঁটা গুল্মেই থাকবে জেগে।
এই পিপাসাই ছড়িয়ে যাই
সময়ের পাথারে।
স্বচ্ছ হাওয়া আর স্বাদু জল,
পবিত্র মাটি
আর অমল আকাশের
মুগ্ধ মিনার তোলা
জনপদ যদি না পারে পাততে,
কোটি কণ্ঠের ধিক্কারে হবে ধ্বনিত।
জ্বলন্ত নিশান হবে
উৎক্ষিপ্ত অগণন বাহুতে।

আর একটি পিপাসাও
আকাশে যাই ভাসিয়ে,
একটি শপথ-শুভ্র পাখিকে
সব সশস্ত্র সীমান্ত
মুছে ফেলতে পাঠাবার।

কেউনা

বাস থামলেই
হাঁক শুনবে—চৌরঙ্গী!
নামতে পারো,
বদল যদি করতে চাও, তাও।
চার তরফেই রাস্তা খোলা,
সাগর পাহাড় অরণ্যে উৎসুক।

পারবে না, তা।
ঘুরতে হবে হুকুম মেনে

হলদে, সবুজ, লাল,
অনেক জনের মাঝে কেউ-না হয়ে।

'অন্য কোথাও পালিয়ে যাবো।'
সবাই ভাবে,
দার্জিলিঙ কি দীঘা পুরী,
প্রয়াগ হরিদ্বার,
কিংবা আরো সুদূর কোনো
শুদ্ধ নির্জনতায়
ডালহাউসি কুলু কি আলমোড়া।

যেখানে যাও,
পেট্রোল আর ডিজেল ধোঁয়াব
খুনে গন্ধ
পাপের মত টানে,
সঙ্গে ফেরে বিষেব মত
চৌরঙ্গী।

যেখানে রোজ
কেউ-না হবার ঢালাও নিমন্ত্রণ,
আমি-তুমি ব শূন্য খোলস
ভরাট করে রাখা
ঝলমলানো নিয়ন বিজ্ঞাপন।

অন্ধকার

ওরা অন্ধকার বেচে।
বিক্রী হয় অন্ধকার
প্রকাশ্য ও গোপন বাজারে
নানান মোড়কে মোড়া রঙীন লোভন,
কত না লেবেল-এ!
এ নয় সে তমস্বিনী, আদিম অশেষ,
কোটি কোটি নীহারিকা গর্ভে ধরা
সৃষ্টির জননী;
কিংবা নয় আমাদের খদ্যোত-আয়ুর
ক্লান্ত স্পিন্ন চেতনার
নিরাময় পবিত্র গাহন,
ছিটোনো মহানিশা।
আর এক অন্ধকার,
পৈশাচিক মস্তিষ্ক ও মেশিনে প্রস্তুত

তাল তাল, ফেরি করে সুচতুর বণিকের চর।
আমাদের চিন্তায় ও ধ্যানে,
স্বপ্নে জাগরণে
তিল তিল করে তাই
মিশিয়ে দেয় সংক্রামক জীবাণুর মত।
বিস্ফোরিত প্রজননে সেই বিষ-বীজ
শিরায় শিরায় প্রবাহিত,
আমাদের চৈতন্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শনি হয়ে থেকে
সব আলো একে একে শোষে।
শতাব্দীর চতুর্থ প্রহরে,
আঁধারের বণিকেরা এখনো অবাধে
হাটে হাটে সওদা নিয়ে ফেরে!
কই, কোথা সংশপ্তক সেনা?

মানুষ

সবিস্ময়ে মুখ তোলো,
মেলে ধরো বিহবল হৃদয়,
সর্বোত্তম মহিমায় মানুষকে দেখো!

কেমন সে আশ্চর্য মানুষ?
শক্তিমত্ত দম্ভস্ফীত অনন্য একক
নয় সে'ত আপনার স্বাতন্ত্র্যে সুদূর হিমগিরি,
বাড়বাগ্নি অথবা দুর্বার।
তোমার আমার পথে
সেও সব জনতার ধূলিম্লান সাথী।

তবু সেই সামান্য মানুষ
যেখানেই হেঁটে চলে যায়,
কল্লোলিত ইতিহাস পায়ে পায়ে জাগে।
অন্ধ মন আলো পায়,
স্পর্শে তার ছিঁড়ে যায় সত্য ও অলীক
দলিতের সমস্ত শৃঙ্খল।
শতাব্দীর নাদিরেরা ক্রূর গর্বোদ্ধত
তারই শান্ত দৃষ্টিপাতে স্তিমিত নতফণা।
সে শুধু বাড়ায় যেই হাত,
শুভ্র এক ভাবীকাল অমল প্রীতির
সময়ের স্রোত ঠেলে
মেলে যেন প্রসন্ন প্রভাত।

স্টেশন

হয়ত হবে না যাওয়া।
ক'বার-ই বা হয়;
যেতেও চাই কি ঠিক?
যাওয়া নয়, তারই ছলনায়
ঘড়ি ধরে তৈরি হয়ে
শশব্যস্ত বেরিয়ে-পড়া শুধু
তারপর হয়ত দৈবাৎ
প্রতীক্ষার অনিশ্চিত স্টেশনে পৌঁছানো।

সেখানে সর্বদা রাত্রি।
জমানো গতিতে গাঁথা
আর এক উৎকণ্ঠ বিস্তৃতি।
একান্ত তৃষিত চোখে
শুধু দূর আঁধার খেয়ায়।

প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে তারপর
সত্যিকার ট্রেন এলে
চট্‌কা ভেঙে যায়।
চেনা ও অচেনা মুখ
ভিড় করে সম্পর্কের সূত্র সব টানে।
স্টেশনে হাজিরা যেন
রওনা হওয়া
কিংবা কাউকে
সমাদরে নিয়ে যেতে আসা।

দূর অন্ধকারে সেই দুর্লভ উদ্ভাস
শুধুই সিগ্‌ন্যাল হয়,
যান্ত্রিক সংকেত
চলার থামার রঙে
সবুজ কি লাল।

দিন

এক একটা দিন
ঠিক লাইনে থাকে না।
সম্বৎসরের সার বাঁধা মিছিল থেকে
ছিটকে বেরিয়ে আসে
দল ছাড়া দামালের মত।

সে সব দিনের ঘণ্টাগুলোও
ঘড়ির আইন মানে না।
আপন খুশিতে ছড়াতে ছড়াতে
কেমন যেন অশেষ হয়ে যায়
সূর্যের সাম্রাজ্যের
সমস্ত আকাশটাকেও ছাড়িয়ে!

সে দিনগুলো
গুনতিতে কেউ যেন না ধরে।
তাদের প্রামাণ্য পঞ্জিকায়,
সরকারী ইতিহাস থেকেও
দিনগুলো যেন দেয় বাদ।

সে সব দিন শুধু
নিজের কাছেই হারিয়ে যাবার,
শুধু নিজেরই এলাকার
এক স্বাধীন পতাকা ওড়াবার।

কেমন সে দিন, যায় কি বোঝানো?
হয়ত সদ্যজাগা এক শিশুর হাসিতেই
তার সূর্যোদয়,

আর দিনান্ত,
আলো-নেভানো ঘরের
স্মৃতিমুখর নীরবতায়।

দেখেছি

এক স্বৈরিণী নদীকে
আমি সাধ্বী হতে দেখেছি,
সাধ্বী আর স্নেহাতুরা।
সব বেড়িকে বলয়ের মতো প'রে
জনপদবধূদের সঙ্গে
সখিত্বে সে বেঁধেছে নিজেকে।

একটি রুগ্ন মলিন পাখিকে
তার ভীত কম্পিত কুলায় থেকে
শ্বেত সাহসী কপোত হয়ে
আমি বেরিয়ে আসতে দেখেছি।
দেখেছি সারা আকাশ
ঝলকিত, স্পন্দিত হতে

তারই মতো অগণন
শুভ্র ডানার সঞ্চালনে।
একটি ভেঙে-পড়া ভীরু ক্ষীণ মানুষকে
তার দীনতার নোংরা কোটর থেকে
জড়তার জীর্ণ কাঁথা ফেলে
আমি উঠে দাঁড়াতে দেখেছি।
দেখেছি তাকে দৃঢ় সবল পায়ে
দুর্বার মিছিলে গিয়ে মিলতে।
আমি জানি,
হার মানবার খেলা এখন শেষ।

রামমোহন

মেঘ ছোঁয়া না হলে, দূরের দেখায়
সব গিরি-পর্বতই যায়
দিগন্ত পারে হারিয়ে।
কিন্তু দুই শতাব্দীর ব্যবধানেও
অক্ষুণ্ণ গরিমায় দেখেছি
অভ্রংলিহ এ কোন নাগাধিরাজকে
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
অতীত থেকে ভবিষ্যতে
মহৎ চিত্তের বলিষ্ঠ বিশালতায়
যিনি প্রসারিত ?

দূরত্ব তাঁকে অস্তমিত করেনি।
খণ্ড সময়ের কুজ্‌ঝটিকার ঊর্ধ্বে
তাঁর হিরণ্ময় সত্তার দ্যুতি
দিগ্বিদিকে আজো বিকীর্ণ।

বিন্ধ্যগিরির বিভাজিকা
উত্তর আর দক্ষিণের প্রহরায়
নদীদের দেয় না মিলতে
অটল তার নিষেধে
নর্মদার খবর পায়না যমুনা জাহ্নবী।

ভারতের অষ্টাদশ শতকের
সময়-সীমার
বিভাজিকার মতই দাঁড়িয়ে আছেন
মেঘলোক-ছাড়ানো মহাকায়
যে যুগপুরুষ

তিনি কিন্তু প্রাকার হয়ে পৃথক করেন নি
সেতু হয়েই মিলিয়েছেন বিপরীত
দূর আর নিকটকে,
মিলিয়েছেন গত আর অনাগত
পবিত্র ধূসর স্মৃতি আর দীপ্ত সাহসী সংকল্প
সুষুপ্ত অতীত আর ভ্রূণ ভবিষ্যৎ।
একদিকে ছিল তাঁর
বিলীয়মান দূর গৌরবে মোহান্ধ
স্বপ্নাতুর প্রাচী,
অন্যদিকে নবজাগরণের মত্ততায়
উদ্দাম অশান্ত প্রতীচী
এই দুই এব আশ্চর্য সমন্বয় তাঁর মধ্যেই সাধিত।

শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়
মোহাচ্ছন্নতায়
বহুযুগ পুঞ্জিত গ্লানি ও অবসাদে
দেবভূমিব মন্দাকিনী ধারাও
রুদ্ধ মন্থর হয়ে আসে
জড়ত্বের শৈবালে ?
তখনই বুঝি অনন্ত শয়নে
সচকিত যন্ত্রণায়
জেগে ওঠেন ভারতের প্রাণপুরুষ,
আর এমনি মহিমান্বিত আবিভাবে
সময়ের স্রোত আবার হয়
মুক্ত ও মুখর
ছিন্ন হয়ে তখন উড়ে যায়
ইতিহাসের জীর্ণ পুরাতন পাতা
নূতন অধ্যায় লেখা শুরু হয়
মানবতার জয়যাত্রার।

শুধু যুগপুরুষ নয়, যিনি যুগাতীত
তিনি শুধু প্রজ্ঞাতেই অনন্য নন,
গভীর মানব-মমতায় হৃদয় তাঁর আর্দ্র
অসীম অপার করুণা তাঁর নয়নে।
তিমির রাত্রির মৃত্যু-জড়তা থেকে উদয়ের পথে
তিনি ভারতের প্রথম পদক্ষেপ
তিনি নতুন, তিনিই সনাতন
তিনি অটল ঐকান্তিক নিষ্ঠা
তিনিই আবার যুগান্তের নির্ভীক।

সমস্ত দীনতা হীনতা ভীরুতার ঊর্ধ্বে

মহৎ উদার তেজঃপুঞ্জ শাশ্বত ভারত
যাঁর মাঝে মূর্ত
সকৃতজ্ঞ বর্তমান ও সমস্ত ভাবীকালের প্রণাম
আজ সেই মহামানবের উদ্দেশে নিবেদিত।

লেনিন

কুহেলি-বিলীন দিগন্ত থেকে
সময় সরণীর দুধারে
আমাদের প্রণম্যেরা আছেন দাঁড়িয়ে
কত না স্থাপত্যে আলেখ্যে আর ভাস্কর্যে অমর হয়ে।

ইতিহাসের স্রোত যাঁরা ঘুরিয়েছেন,
পথ কেটেছেন
অজানা গহন দুর্গমতাকে জয় করবার,
আলো জ্বেলেছেন,
আর যা দিয়েছেন
অন্তর বাহিরের সমস্ত শৃঙ্খলে,
জীবনকে যাঁরা উদ্বুদ্ধ করেছেন
এক থেকে আরেক উজ্জ্বল মহিমার তপস্যায়,
তাঁদের আমরা ভুলতে চাই না।
তুমি তাঁদেরই একজন
তবু তুমি ভিন্ন।
তোমার দেহাধার যেখানে শায়িত
চিরকালের সমস্ত মানুষের তা তীর্থভূমি।
তবু তুমি শুধু স্মৃতি নও, শোক নও
নও শুধু পূজনীয় পবিত্র প্রাচীনতা
অচলতার পাষাণ-বেদীতে গাঁথা।

তুমি সেই আশ্চর্য অম্লান উপস্থিতি
বর্তমান ও ভাবীকাল
যার বিদ্যুৎস্পর্শে স্পন্দমান।
তুমি শুধু ছিলে, নয়, তুমি আছো,
আছো, জীবন্ত বেগ হয়ে
আমার মত অগণনের উৎসুক লেখনীর মুখে
অকপট প্রীতিতে পরিশুদ্ধ
অবিভাজ্য এক ভাবী মহাসমাজ যারা গড়ছে
আছো, তাদের সকলের হলে ও হালে
সংগ্রাম ও সাধনার সমস্ত হাতিয়ারে।
কল্পনার আকাশে স্বপ্নের ইসারা হয়ে নয়,

নতুন কবিতা

এই কঠিন পৃথিবীর মাটিতে তুমি আছো
আমাদের শাশ্বত সাথী আর অভ্রান্ত দিশারী হয়ে।

মহানায়ক

প্রণাম করবার মানুষ যাঁরা আছেন
তারা প্রণাম নিক।
কুর্ণিশ করবার মানুষকেও জানাই
দরবারী সেলাম
তোমার জন্যে এসব কিছু নয়,
প্রণামের দূরত্বে তুমি নেই।
কুর্ণিশের কৃত্রিমতায় তোমার নাগাল পাবার নয়।
তুমি সেই আশ্চর্য সৈনিক
তপোদীপ্ত এক সন্ন্যাসী যার মধ্যে আছে জেগে,
সার্থক ভবিষ্যতের কল্পনা।
তুমি সেই স্বপ্নবিলাসী
বিফল বর্তমানের বাস্তবতা
যে অস্খলিত পদে
পার হয়ে যায়
সকলের মুক্তি সংগ্রামের মহানায়করূপে
তুমি নাও আমাদের দৃপ্ত অভিবাদন
অপরাজেয় অভয় যৌবনের প্রতীকরূপে নাও
সমস্ত দেশের মুগ্ধ হৃদয়ের উষ্ণ উৎসার।

স্বাদেশিক

খুঁজতে যাব না দূর প্রাগুষার তিমিরে
অস্থি কি করোটির সাক্ষ্য।
কি-ই বা বলবে শিখালেখ কি তাম্রলিপি?
প্রত্নবিদের খনিত্র
সময়ের সমাধিই শুধু খোঁড়ে।

ভূতত্ত্ব জানে
অর্বাচীন এক পাললিক সঞ্চয়ের বৃত্তান্ত
ক্ষয়িত গৈরিকের ধ্রুপদাঙ্কে
স্বৈরিণী নদীরা যেখানে নৃত্যপরা;
আর পুরাণ নিয়ে যেতে পারে
স্মরণ-সীমার সেই আলো-আঁধারিতে

আর্য দম্ভের কানে
প্রাক-কণ্ঠ যখন পক্ষীরব,
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী
দ্বিতীয় কোন পুণ্ড্র-বাসুদেবের স্পর্ধা
উন্নাসিক কুরু পঞ্চালে উপহসিত।

ইতিহাস অবশ্য শোনাবে
অর্ধবিশ্বজয়ী অপ্রতিরোধ্য এক বাহিনীর
সশঙ্ক সচকিত হৃদ্‌কম্পন।
সে দুর্বার প্রলয়তরঙ্গ
সহসা যাতে হয়েছিল নিশ্চল
অজানার আতঙ্ক-জাগানো
সে এক কিংবদন্তী-ঝঙ্কৃত নাম,
—যাবনিক জিহ্বায় বিকৃত,—গঙ্গাহৃদি!
শুধু সে নাম কেন,
এ মাটিতে কান পাতলে
বিস্মৃতি বিলীন কত যুগান্ত
আবার হবে সরব।
শোনা যাবে মাৎস্যন্যায়ের মন্থনান্তে
কোটি কণ্ঠে কল্লোলিত
একটি নামের জয়ধ্বনি,
গোপালদেব! গোপালদেব!
তেমনি আবার আকাশ-কাঁপানো উল্লাসে
বিপ্লব নায়ক দিব্বোক।
ইতিহাসের অবিরাম ঘূর্ণাবর্তে
উত্তাল কত না মুহূর্ত!
কী দুরন্ত নাট্যপ্রবাহ পতন অভ্যুদয়ের!

তবু সেখানেও খুঁজব না তার রহস্য
আমার অস্থি-মজ্জার যা স্মৃতি ও স্বপ্ন,
সঙ্কল্প হয়ে, ধ্বনিত আমার হৃদ্‌স্পন্দনে,
আমার দৃষ্টিতে যা দীপ্ত,
আর নিজেকেই চেনবার
চিরন্তন অভিজ্ঞান চেতনার গহনে।

এ দেশ-চেতনার হদিস
পুরাণ ইতিহাসের অতীত!
তাত্ত্বিকদের পরকলা ঢাকা চোখ
তার খোঁজ রাখে না।
পাললিক ইতিবৃত্তে তা নেই
নেই কোনো পুরাবিদের পুঁথিপত্রে।

ক্ষণে ক্ষণে রং পাল্টানো
বারে বারে ছেঁড়া আর
খেয়ালের তালিমারা
রাজনীতির মানচিত্রে
তা মেলে না।

আমার স্বদেশ
ভৌগোলিক এক মৃন্ময়
বিবর্তন-বিধাতার বুঝি
কিমাশ্চর্য কিমিতি,
সমতল দিগন্তের দেশে
মানুষকেই যা করে অভ্রভেদী,
পলিমাটির পেলবতা যাতে হয় বজ্রকঠিন।

বাঁচতে আকুল, মরতে অভীক
বিষামৃতের অবাক দেশ
প্রণতি নাও।
শান্তি নয়,
জীবন দাও মৃত্যুফেনিল।

শতাব্দী

যেখানেই ডেরা বাঁধো
গিরি মরু ডিঙাতেই হবে;
সব মেঘ-চুম্বী চূড়া
জয় করতে না চাইলে নিষ্ফল উৎসাহে
সমতল ক্ষেতে সেচ
শুকিয়ে যায় কালের নিশ্বাসে।

পৃথিবীতে যত নদী
সব আজও রক্তে বহমান।
অজগর বন সব
ভূগোলে বিরল হয়ে-আসা
নিষ্কুণ্ঠার কুমারীত্বে
লুকিয়ে রাখে হৃদয়ের দূর দুর্গমতা।
পাণ্ডুর প্রত্যহ যত
যন্ত্রাবর্তে ঘোরালেও তাই,
প্রাণের পুরাণে জানি
আর্তি এক প্রাগৈতিহাসিক

অন্ধ গুহা থেকে নিত্য।
পাড়ি দেয় অতল অসীমে।

সব চূড়া জয় করে'
মহাশূন্যে অগস্ত্য-প্রয়াণে
সে আর্তি না নিরুদ্দেশ
যেতে চায় যদি
সময়ের জাদুঘরে
মৃত ও বিকৃত
এ শাতশ্রী হবে শুধু
প্রহেলিকা প্রত্ন-জিজ্ঞাসার।

কলম

ভোঁতা করতেই চাই কলমটা,
ভোঁতা আর পরুষ-কঠিন,
অতিসূক্ষ্ম দার্শনিকতার দম্ভে
মাটিতে পাছে পা না ফেলে,
না যায় যাতে বাহবা কুড়োতে
নতুন কালের দিগ্‌গজদের দরবারে
ব্যাসকূটের বহবাস্ফোট নিয়ে,
ধর্মের কুঁড়োজালিতেও না যেন গিয়ে ঢোকে
নামজপের নামতার নেশায়।

অনেক কাজ বাকি।
সখের সুখের সময় তার কোথায়?
কোথায় অবসর
আয়না ধরে নিজের ভাবনে মশগুল হবার?

ভোঁতাই থাক তাই কলমটা।
লাঙলের ফলা থেকে কিছু,
কিছু হাতুড়ির মাথা থেকে;
কিছু কোদালের, কিছু কুড়ুলের
ঋণ থাক এই কলমে।
ডগাটা হোক শক্ত
আর ডাঁটিটা সরল সোজা,
কারণ,
বিস্ফোরণের আগুন
প্যাঁচালো নলে ছোটে না।

হাতিয়ার নয়
হাতের কলম-ই শুধু,
কিন্তু তারই ভেতর
সমস্ত আগামী কালের বীজ
মূর্ছিত শব্দে আছে জমাট হয়ে
সুপ্ত বারুদের মত।
ধোঁয়াটে ধাঁধার ফুলঝুরিতে
তা কি ফুরিয়ে দেবার?

হয়তো

হয়তো আকাঙ্ক্ষা ছিল
ডুব দিয়ে জলের হৃদয়ে
    কোমল লিপ্ততা তার
    গভীর গাহনে নিয়ে ওঠা
    পবিত্র নির্মল উজ্জীবিত!
সব আলিঙ্গন এক
নদীর, নারীর।
একই বুঝি এ সত্তার গহন যাচনা—
    অভেদ আশ্লেষে
    নিঃসর্তে নিজেকে ঢেলে,
    চেতনায় তবু ধরে রাখা,
    স্বতন্ত্রের সশঙ্ক শিহর।
দগ্ধ দেহ মগ্ন হবে,
    কোথা সেই লুপ্তি স্বচ্ছতোয়া?
স্বৈরিণী সমুদ্র নয়,
    —আমাদের দম্ভে যার স্পর্দ্ধের আহবান—
সুশীতল স্নিগ্ধ গাঢ় জল
    তবু খরস্রোতা
    নিরাময় অবগাহনের
    খোঁজা কি বৃথাই?

আমাদের শশব্যস্ত সাবধানী লোভে
সব নদী চাটুশুল্কা দাসী হয়ে গেল।
সব তট নিরাপদ বাঁধানো বিলাস?

স্মৃতি

নিচে রাজপথে ক্লীবত্বের কাদা
আর রুগ্ন ঔদাস্যের আবর্জনা।
ওপরের আকাশও তেমনি নোংরা
মাইক আর লাউড-স্পীকারের নিঃস্রাবে,
নিঃসাড় না নির্বিকার আমার নগর ?

বর্ষা এল তারপর
—পৃথিবী ভাসাবার,
সূর্য মুছে দেবার বর্ষা।
অবিরাম উন্মাদ ঝর্ঝর
যেন, চেতনার ধ্বনিময় কারাগার।

সেই নিরুপায় নিভৃতিতেই
আমার নগর বুঝি
তার অগভীর ইতিহাস-মূলের তলায়
একটি হারানো স্মৃতির কণা খুঁজে পায়
—লবণাক্ত সমুদ্রের উগ্র আদিম স্বাদ
যে স্মৃতিতে এখনো জড়ানো,
আর অবাধ আরণ্য অলজ্জতায়
যার হিংস্রতাও পবিত্র।

প্রলয়-বিধাতা

কোথায় দেখছ মহাপ্রলয়ের সঙ্কেত ?
শুধু কি বায়ুকোণের পুঞ্জিত রক্ত মেঘে ?
প্রলয়-প্লাবনের উত্তাল তরঙ্গ-চূড়া দেখতে
কোথায় আছ তাকিয়ে ?
মহাসিন্ধুর দিক্‌চক্রবালে কি শুধু ?
সব মিথ্যা আর জীর্ণতা
যা পুড়িয়ে ছাই করে দেবে
সেই দাবানলের সূচনা কি খুঁজছ
ঐ অরণ্যানীর গভীরে ?

যুগযুগান্তের সমস্ত পুঞ্জিত পাপের পাষাণভার
আকাশ-ছোঁয়া অভ্রংলিহ যা চূর্ণ বিদীর্ণ করবে
সে মহা-আলোড়নের রুদ্ধ গর্জনধ্বনির আশায়
কান পেতে আছ কি পৃথিবীর বুকে ?
ওখানে নয়! ওখানে নয়!

নতুন কবিতা

প্রলয়ের আগমনী জানতে,
মানুষের চোখের দিকে তাকাও,
তোমার পাশে যারা আছে তাদের
নিত্য দুবেলা যাদের দেখছ, তাদেরও।

আকাশ সমুদ্র কি পৃথিবীর বুকে নয়,
কখনো গোচরে কখনো অগোচরে—
কালান্তরের ভয়ঙ্কর ভূমিকা
রচিত হচ্ছে মানুষেরই মনের গহনে।
প্রলয়-বিধাতা
তুমি আর আমি-ই।

গলদ

হিংস্র এক শকট তোমার ট্যাংক হে সেনানী
অরণ্য করে ধ্বংস
আর শতজনকে করতে পারে দলিত।
কিন্তু একটিই তার ত্রুটি,
চালাবার কেউ তার চাই।

মহাবল তোমার বোমারু বিমান হে সেনানী।
ঝড়ের চেয়ে বেগে পারে উড়তে
বইতে পারে হাতীর চেয়ে বেশী বোঝা।
কিন্তু একটি শুধু তাঁর খুঁত,
মিস্ত্রী একজন তার দরকার।

মানুষ বড় কাজের জীব, হে সেনানী!
উড়তে পারে, হত্যাও পারে করতে।
এই শুধু তার গলদ
সে ভাবতে পারে।

মেঘলা দিনটা

মেঘলা একটা দিন
মোড়া রইল মনে
চোখের পাতা একটু ভেজানো
অশ্রুজলে ঝাপসা হয়ে
কি এক স্মৃতির কাঁটায় গাঁথা।

কিছুরই ছিল না ত্রুটি।
যে আসবার সে এসেছিল।
যা বলবার আর শোনবার
সবই বলেছি আর শুনেছি।
তবু কিছুই যেন
সুরে ঠিক পৌঁছোয়নি।
কথাগুলো সব যেন মুখস্থ,
চেয়ে থাকা
আর ছোঁয়া লাগাটাও তাই।
মেঘলা দিনটার ভিজে ছোঁয়ায়
সবকিছুই কেমন নেতিয়ে গেছে।

আবার জানি রোদ উঠবে
ঝলমলিয়ে
আকাশ থেকে
ঠিকরে পড়বে আলো।
শুকনো শীতের হাওয়ায় থাকবে
শিহর-তোলা ধার,
অনেক বড় বড় শোক
আর বেদনার ক্ষত
তাতে হয়তো শুকিয়ে যাবে মিলিয়ে।
কিন্তু এই একটা ভিজে মেঘলা দিন
মনের গভীরে
জড়ানোই থাকবে কোথাও।
তার যে স্মৃতি
তা সুখ যেমন নয়,
তেমনি না দুঃখ না ব্যথা।
শুধু উদাস একটা বিষাদ
যেন কান্না হতে গিয়ে
হঠাৎ বোবা হয়ে গিয়েছে।
মেঘলা একটা দিনের
বোবা কান্নার এই প্রহরগুলো
জীবনের আখেরী হিসেবটাই
কখনো পাকা হতে দেবে না।

প্রলয়ের পর

প্রলয়-প্লাবনের পর
নোয়া-র কপোত নাকি উড়েছিল

অকূল পাথারে একটু শুকনো ডাঙা খুঁজতে।
এই সেদিনের সেই বিশ্বজোড়া
হিংসার তান্ডবের পর,
আমাদেরও উৎসুক একটি স্বপ্ন
শুভ্র ডানা মেলেছে নীল শূন্যতায়
দুদন্ড নেমে দাঁড়াবার
একটু অকপট আতিথ্যের সন্ধানে
বিনিময় করতে
যথার্থ একটু হৃদয়ের উত্তাপ।

নেই বুঝি, নেই।
কোথাও তা বুঝি পাবার নয়।
বিশ্বব্যাপী খান্ডবদাহের অগ্নিপরীক্ষাতেও
শুদ্ধ হয়নি মানুষ।
হিংসা বিষে জর্জর পৃথিবীতে
নিষেধের তীক্ষ্ন শলাকা কন্টকিত প্রাচীর
দিনে দিনে দেশে দেশে
আরো উঁচু করে হচ্ছে গাঁথা,
বিভেদের পরিখা
আরো গভীর আর দুর্লঙ্ঘ্য।
মানুষের অখন্ড মানবতা দিচ্ছে মুছে
তার ভৌগোলিক ঠিকানা আর ভাষা ভেদ।
জাতির সঙ্গে জাতির সম্পর্ক
শুধু সশস্ত্র ঘৃণা আর অবিশ্বাসের।

হতাশ তবু হই না।
আর কোথাও না থাক,
আমাদের জন্যে
একটি উষ্ণ অভ্যর্থনা পাতা আছে জানি
কৃষ্ণ সাগর থেকে উত্তর মেরু বলয় পর্যন্ত
পশ্চিমের বলটিক থেকে পূবের প্রশান্ত মহাসাগরে।
শোষণ পীড়নমুক্ত
এক নব মানব সমাজের সখ্যের হাত
আমাদের জন্যে সাগ্রহে প্রসারিত
এই আমাদের আনন্দ, এই আমাদের গর্ব।
সাক্ষী থাক মহাকাল
মানুষের রক্তমাখা অতীত মুছে দিয়ে
ভাবীকালের ইতিহাস আমরা নতুন করে লিখব।

বহতা

সেলোফেনে মুড়ে রাখলে
হিমাংকের নিচে
হৃদয়ের কোনো স্মৃতি জারিত হয়না।
অ্যালবামে সযত্নে আঁটা
অতীতের মুখ
চিরদিন নিভাঁজ মসৃণ।
জানি সব,
তবু হায় আমি নিষ্ঠাহীন।
সময়ের স্রোত রুখতে
কোনদিন কড়ে একটা আঙ্গুল নাড়িনা।
পুরানো ছবির তাড়া
খুঁজতে গিয়ে তাই,
দেখি শুধু কীটে কাটা জঞ্জালের পুঁজি।
জীবন কখন খাত বদলে বয়ে গেছে,
প্রত্নশীলা রাখলেও খোদিত,
—সেখানে হারানো কোন ক্ষণ
অপেক্ষায় নেই কম্পমান।
যে মিছিল অফুরন্ত
আদি অন্তহীন,
তাতেই বিলীন সব পল ও বিপল।

যে মুহূর্ত চমকায়
অবিরাম বুকের স্পন্দনে,
তাই সময়ের সত্য।
তারই মাঝে দ্রবীভূত জীবন উত্তাপে
একাকার অনাগত, অধুনা, অতীত।
তাই জানি চিরন্তন
চির ধাবমান, অনিত্য অস্থির
বিধাতা বহতা।

অহৈতুক

না, কোনো উত্তর নেই।
পাবে না কখনো।
শুধু এক প্রহেলিকা
চিরদিন অভেদ্য জেনেই
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের

বৃত্ত ঘুণে যেতে হবে
অনির্ণিতকাল।

কে তুমি? চেও না জানতে
কেন? তাও।

চেতনার বিন্দু হয়ে
একবার শুধু একবার
অস্বচ্ছ বিম্বিত করো
বিশ্ব এক
একান্ত তোমার আপনার।
মুহূর্তের বুদ্বুদের মত
সে বিশ্বও চিরতরে
লুপ্ত হবে, জানি।
হোক তাই।

ক্ষণিকের খদ্যোত-দ্যুতিতে
অহৈতুক একটি সৃষ্টি
ফুটে ঝরে যাক!

জবাব

সূর্যকে ভজনা করলে
রাত্রিকে কেমন করে দেবে বাদ।
স্রোত হতে চাইলে
তটের অচলতাকে কখনো যায় না ছাড়ানো।
ধ্বনি মানেই স্তব্ধতা।
উজ্জ্বল এই প্রাণের পাত্রে,
মৃত্যু আর জীবন
উৎকণ্ঠা আর উল্লাসই
নানান মাপে মেশানো।
প্রাণাধিকা পরমা
করালী থেকে হলাদিনী।

বামাচারীকে তাই ডাকি,
হাঁ আর না-এর এই মন্থ
নিষিদ্ধ চোলাই-এ নেশার চূড়ায় তুলে',
নিজেকেই আসন করে বসতে।
নিজেরই গহন অনাদি কামাবর্তে
মেলবার যদি হয়ত মিলবে

সব জ্বালা আর নেভার
জবাব!

ফুলকি

নিরবধি কাল আর অন্তহীন দেশ
তার মাঝে অতি ক্ষণিকের
একটি দাগ
বলতেও পারো তাকে
জিজ্ঞাসার একটি ফুলকি

কেন আর কি
জিজ্ঞাসাটুকু কবতে না করতেই
যা নিশ্চিহ্ন
অশেষ অন্ধকারে
চিরকালের মত।
এই ফুলকিটুকুই ত
তুমি আর আমি
নিরুত্তর শূন্যে
একটা অস্ফুট অবোধ আবেদন
হোক্ না তাই—
জানি এক পারে
চেতনার ঊষালগ্নের আগে
চিররাত্রির অন্তহীন স্তব্ধতা
আর অন্য পারে
বিলুপ্তির অশেষ চিরন্তন অন্ধকার

তবু অতি ক্ষণিকের
এই নিষ্ফল স্ফুলিঙ্গটুকুই হোক
হতাশ জিজ্ঞাসার
প্রচন্ড এক তীক্ষ্ণতা
নিশ্ছিদ্র অন্ধকার
যা হয়ত কখনো
বিদীর্ণও করতে পারে

উদ্ভাবন

না, কোনো উত্তর নেই।
তাই আর জিজ্ঞাসাও নয়।

নির্বিকার অন্ধকার
আপনার নির্মম ঔদাস্যে
থাক চারিদিক ঘিরে
চিরমৌনতায়
তার মাঝে
নিরর্থক চেতনার এ ক্ষণ-উদ্ভাস
হোক বুদ্বুদের মত।
তবু কোনো ক্ষোভ যেন
হৃদয়কে আতুর না করে।

পৃথ্বী-গর্ভ হ'তে
ক্ষুব্ধ
অবারণ উগ্র অগ্নি উদ্গারের মত
জানি বারবার এক
'কেন'
জেগে উঠতে পারে
মথিত সত্তার
তীব্র আর্তনাদ হয়ে।
কিছুতেই তাকে যেন
দিওনা প্রশ্রয়।

জেনো এ অনন্ত সৃষ্টি
তোমারই এ চেতনার
ক্ষণিক বিম্বিত ছায়া শুধু।
ন্যায়, সত্য, প্রেম, মানবতা
এ শুধু তোমারই আপন উদ্ভাবন,
নির্বিকার শূন্যতাকে
বার বার দৃপ্ত তেজে যা দেয় ধিক্কার।
হলেই বা নিরর্থক নশ্বর বুদ্বুদ,
আপনারই উদ্ভাবনে
ক্ষণিকের নব সৃষ্টি গড়ো,
আর তারই মরীচিকা-দ্যুতি
বিচ্ছুরিত করে যাও
অচির উদ্ভাসে।

উদ্ভাসন

সূর্য খুঁজি কোথায়?
আকাশে নয়

অনেক টোলে ঘুরেছিলাম,
অনেক পুঁথি ঘেঁটেছিলাম,
নাড়া বেঁধে অনেক গুণী মুনির
অনেক অনিদ প্রহব ধবে
অনেক কৃচ্ছ সেধেছিলাম।
আর সাধি না।
আঁকড়ে কিছু তাও ধবি না।
মুহূর্ত সব জ্বলেই নিভুক।
ভেসেই ডুবুক অপার শূন্যে।
মানে যদি থাকে কোথাও
সব কিছুতে আপনা থেকে
রং ধবাবে।
আলোব ছটাব থাকলে উৎস
তাও ছড়াবে।
শুধু কেবল মেলে বাখা,
শুধু কেবল মেলতে শেখা,
পাহাড় ঘেবা বিজন সাযব
কেমন দিবানিশি
তবল মুকুব হয়ে শুধু
সব চে॰না পেতে বাখে।

বড়দিন

শীতেব আড়ষ্ট এই ছোট দিনগুলি,
ছোট ভয়ে,
লজ্জা, লোভ নীচতায় ছোট।

প্রাণের কার্পণ্যে আব দুর্বল সংশযে
এই ছোট দিনগুলি কবে
হায়, বড হবে?
যুগে যুগে কতবাব
কত ক্রুশ হলো রক্তে লাল।

মানুষেব লাগি
দেবতাব আর্ত প্রশ্ন
শূন্যে হলো হারা।

তবু আজও কোথা বড়দিন?
কই সেই আশ্চর্য সকাল?

নিয়তি

শিশিরে ভেজানো আর
সোনালী রোদের মায়া ছোঁয়া
দু-এক সকাল যদি
বেছে বেছে গেঁথে রাখতে পারি
স্মৃতির মালায়,
একটা অন্ধ অমারাত
হয়ত হতে পারে কিছু
জ্যোৎস্নায় মদির।

কিছু কিছু অন্ধকার
নিরাশ্বাস বেদনার শূন্যতা থেকেও
মাখিয়ে রাখলে দুটি চোখে
গাঢ় কালো কাজলের মত,
জীবনে কোনো কোনো জ্বলন্ত দুপুর
হয়ত হতেও পারে
অতর্কিত মেঘোদয়ে মৃদু।।

কিন্তু, কেন এই দীন কারুকলা
অমোঘের অঙ্ক একটু দোলবার দুরাশা ?

প্রাণের যা ঋতুচক্র,
তা'ত ঘোরে আপনার
অস্খলিত ছন্দে নির্বিকার
জীবনের মানচিত্র
মরু মেরু অরণ্য কি নদী ও সাগর
সমতল দুর্লঙ্ঘ্য গিরির
বিপরীত স্বাতন্ত্র্যে স্বাধীন।
তা যদি না হয়,
সমস্ত স্বৈরিণী নদী সাধ্বী হয় যদি
শান্ত ও শাসিত
বাঁধ আর সেতুর বন্ধনে,
দুর্লঙ্ঘ্য গিরিরা সব
অগস্ত্য বিক্রমে নতশির,
নিস্তরঙ্গ নিরাপদ সে পরমায়ুর
কে চায় নিয়তি ?

ছাপা না

তন্ন তন্ন অনায়াসে পড়ে ফেলবে সব,
সাজানো অক্ষরে বন্দী
তেমন বই ত নয়
এ সৃষ্টি পৃথিবী।
জীবনটা অবিকল
ছাপানো ত' পাবেনা কোথাও
দর্শন বিজ্ঞান আর
ইতিহাস যত ঘেঁটে মরো।

মানচিত্র আঁকো যত
নিখুঁত নির্ভুল
অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার
চুল-চেরা হিসাবের ছকে
এ পৃথিবী কোনোদিন
সে ছকে মেলে কি ?

সাগরে পাহাড়ে আর
নিরুদ্দেশ দিগন্তেই নয়,
সামান্য পাথুরে ঢিবি
কিংবা তারই ফাটলের ফাঁকে
এক গুচ্ছ দুঃসাহসী ঘাসে
পৃথিবী কৌতুকে রঙ্গে
ভূগোলের সব ছক-ছেঁড়া হাসি হাসে।

দিশারী

অন্ধকারে সারারাত
একটি তারা প্রিয় করো যদি
ধ্রুব না-ই হোক
সেও ত দিশারী হয়ে
প্রভাতের বার্তা দিতে পারে
যত দূর হোক দিবালোক।

কেন ?

একটা 'কেন' ছিল
প্রথম চোখ মেলবার বিস্ময়েও
গোপন কাঁটার মত।
সে-ই 'কেন'-ই রেখে যেতে হয়
পাতাব পর পাতায় পরমায়ুর
শুধু হতাশার কালিমাতেই লেপে নয়,
অহেতুক উল্লাসের বাসন্তীতেও ছোপানো।

উত্তর না-পাওয়ার নিয়তির জন্যেই
শেষ অবধি
থাকব বুঝি কৃতজ্ঞ।

দিন রাত্রি

এক এক বাত্রে
ঘবে ই আর ফিরতে নেই,
সূর্যাস্তের-ই পেছনে
আশাহীন অনুধাবনে ;
সূর্য ডুবলেও
তার শেষ আলোর ধিক্কার
বুকেব মধ্যে
রক্তাক্ত হয়ে-ই যাতে জ্বলে।

এক এক দিন
জানলা দরজা বন্ধই রাখতে হয়
ভোর থেকে,
বাত্রের অন্ধকারটা
ধরে রাখবার জন্যে সারাদিন
—রাত্রের মথিত স্পন্দিত
সেই অন্ধকার
সমস্ত চেতনাকে
অণোরণীয়ান তড়িৎ-কণায়
যা বিচূর্ণ বিচ্ছুরিত করে দেয়
সত্তার নাভি-চক্রের আবর্তে
তখনই বিদীর্ণ হ'তে পারে
সৃষ্টি-গর্ভ সে আদি নীহারিকা
অনাগত ভবিষ্যের শীৎকার-শিহরণে।

এক যে ছিল

এক যে ছিল আরশোলা, সে
কেন ছিল, কে-ই বা জানে।
পন্ডিতেরা ভেবে সারা
কি তার মূল্য কি তার মানে!

আরশোলা সেও থেকে থেকে
শুঁড় দুটি তার নাড়িয়ে ভাবে,
জীবনভরা ফড়ফড়ানির
হদিস পাবে কোন কেতাবে?

পাঠ্য এবং অপাঠ্য সব
যা পায় সেত দেখে চেটে,
এই ধাঁধাটার জবাব কিন্তু
পায়নি বইএর পাহাড় ঘেঁটে।

বয়স নাকি এত যে তার
নেইক জুড়ি গাছ পাথরে
কোন সুখে সে আজও শুধু
ফড়র ফড়র উড়েই মরে।

শুধু কি তার ঘুপচি পেলেই
আদায় গাদায় কাটাই লক্ষ্য
অবশেষে ডি-ডি-টি-তে
ঠ্যাং ছুঁড়ে চিৎ হওয়াই মোক্ষ?

মনের ধন্দ ঘোচাতে সে
      খুঁজে বেড়ায় প্রাজ্ঞ প্রবীণ
ফড়ফড়িয়ে উড়তে গিয়ে
      তাঁরই দেখা পেল সেদিন।

লেপটে আছেন মৌনী ধ্যানী
ঘরের খাড়া দেয়াল সেঁটে।
নেইক কোন নড়ন চড়ন
তৈরী যেন পাথর কেটে।

আরশোলা তাঁর সামনে পড়ে
বললে,—প্রভু নিলাম শরণ
কৃপা করে দিন বুঝিয়ে
কিসের জন্য জীবন মরণ।

কি যে আমি, কেই বা আমি
আমিই যে কেউ, কোথায় প্রমাণ!

আমার মত ফালতু পোকার
বাঁচা মরা নয় কি সমান ?

ঠিক ! ঠিক ! ঠিক ! বলেন ধ্যানী
সুরুৎ করে জিভ বাড়িয়ে।
বরাত জোরে আরশোলা তাঁর
নোলার নাগাল যায় ছাড়িয়ে

ফড়াৎ ফড়াৎ কানার মত
আরশোলা ধায় এধার ওধার।
মৌনী ধ্যানীর কৃপা থেকে
শেষ অবধি পাবে কি পার ?

মানুষের মাপ

মানুষের কত মাপ
কতজন কষে রেখে গেছে,—
দেহের নিরিখে কেউ,
কেউ হৃদয়ের
চেতনার মেধা ও মতির।

হিসাব মেলাতে শেষে
সব মাপ তবু যেন
হয় উপহাস,
জীবনকে স্বপ্নময়
কুয়াশায় আদ্যন্ত ঢেকেও
সূচতুর শৃঙ্খলের
ঝনৎকার লুকোনো যায় না।

উদ্ধার শুনেছি ঢের—
ভাগবত পরম করুণা
পাপী তাপী পতিতেরে
ত্রাণ করে নির্বিচার প্রেমে
সে স্বর্গীয় সমাধান
হেসে ঠেলে রেখে।

ঘুম ভাঙলেই

ঘুম ভাঙলেই আমি যেন উঠে দেখবো
বৃষ্টি আর নেই,

ধোয়ানো ধবধবে ক'টা
মেঘ শুধু আকাশে টাঙানো
বাতাসে হিংসার গন্ধ
একেবারে মুছেই গিয়েছে,
রোদের ঝলক ঠিক
পৃথিবীর হাসির মতন।

শহরটা হাত পা মেলে
আরো দূর ছড়িয়ে যেতে পারে,
কিংবা গুটিয়ে ঘন হয়ে
গাঢ় এক অন্তরঙ্গতায়,
গলিগুলো রাজপথে
ঘৃণা ঈর্ষা উগরে দেয় নাকো,
নগর-শিখর যেন
ঢেউ-তোলা আশায় উত্তাল।

ঘুমটা তবু ভাঙাই শক্ত।
বোবায় ধরা দুঃস্বপনের মুঠি,
মিথ্যে ভয়ের মুখোশ এঁটে
চেপেই আছে চলতি কালের টুঁটি।
স্বপন-পণ্য ভরা তরী
ফিরলে কোথায় ফিরি করি
কোন্ ঘাটেতে নাও ভিড়ালে
ঘাটের বাটের নেই নিশানা।
এবারে তো বান নেমেছে
মাথা তুলে জাগছে ডাঙা
আঁধার রাতের অবসানে
উঠছে ভোরে সূর্য রাঙা।
সকাল বেলার সোনা নিয়ে
রাতের জ্যোছনা তায় মিলিয়ে
কল্পলোকের স্বপন রচো
দুঃস্বপনের চটকা ভাঙা।

শতাব্দী

যেখানেই ডেরা বাঁধো
গিরি মরু ডিঙোতেই হবে।
সব মেঘ-চুম্বী চূড়া
জয় করতে না চাইলে নিষ্ফল উৎসাহে

সমতল ক্ষেতে সেচ
শুকিয়ে যায় কালের নিশ্বাসে।

পৃথিবীতে যত নদী
সব আজও রক্তে বয়ে চলে।
অজগর বন সব
ভূগোলে বিরল-হয়ে-আসা
নিষ্কুণ্ঠার কুমারীত্বে
লুকিয়ে রাখে হৃদয়ের দূর দুর্গমতা।

পাণ্ডুর প্রত্যহ যত
তুচ্ছতায় জড়ালেও তাই
প্রাণের পুরাণে জানি
আর্তি এক প্রাগৈতিহাসিক
অন্ধ গুহা থেকে নিত্য
পাড়ি দেয় অতল অসীমে।

সব চূড়া জয় করে
মহাশূন্যে অগস্ত্যপ্রয়াণে
সে আর্তি না নিরুদ্দেশ
নিয়ে যায় যদি
সময়ের যাদুঘরে
মৃত ও বিকৃত
এ শতাব্দী হবে শুধু
প্রহেলিকা প্রত্নজিজ্ঞাসার হবে

উচ্চৈঃশ্রবা

প্রাণের দৈন্যে ভীরু আর কৃপণ কি ?
কে জানে
হঠাৎ কখন জানলা খুলে
সেও হয়ত দেখতে পাবে
মহাপ্লাবনের ফেনার চূড়ার মত
শাদা সেই ঘোড়াটা,
ঘাড়ের কেশর ফুলিয়ে,
নিশ্বাসে আগুনের হল্কা ছড়িয়ে,
ইহকাল কাঁপানো হ্রেষায়
যে, স্খলিত মুহূর্তের
স্ফুলিঙ্গ ঠিকরিয়ে ছুটছে
সময়ের দিগন্তে।

সে দেখাটা বুঝি ভ্রান্তি,
—বিমূঢ় মনের অলীক কুহক,
জন্মায়, পীড়িত রক্তিম
আমাদেব আচ্ছন্ন চৈতন্যের বিকারে !
কিন্তু ওই উচ্চৈঃশ্রবা ই ত ছিল
মহাসমুদ্র মন্থনের
সর্বোত্তম আহরণ
আমাদেব উল্লাস ও আতঙ্ক
ইতিহাস ও নিয়তি !
কোথায় তাকে হারালাম ?
আমাদের ঘিরে আজ বাঁধানো রাস্তা
আব সাজানো শহর গড়বার
কি ব্যর্থ করুণ আকুতি !
উদ্ভাসিত সত্তাব সেই বিদ্যুন্ময় দ্রুতি
কবে কোথায় বেচে দিয়ে এসেছি
দু মুঠো শান্তি আর স্বস্তির দামে ।

সাতদিন

সাতটাত মাত্র দিন ।
একটি বাদে তার সব কটি-ই
ছেড়ে দিতে রাজী ।
একটি দিন শুধু আমার জন্যে থাক,
বিফল বাতিল একটি দিন
কোনো কাজেই যা লাগে না,
হিসেবের পাকা খাতায়, জমার ঘরে
কিছুই যা পারে না তুলতে,
ফাঁকা দিন, ফাঁকিপড়া দিন
প্রহরগুলো যার নিঃসম্বল শূন্যতায়
এলোমেলো ছড়াতে পারে দমকা হাওয়ায় ।

এই লোকসানের দিনটাই শুধু আমার থাক
আমি সেটা খেয়াল খুশিতেই ওড়াবো,
ওড়াবো ঘুড়ির মত
ঘন ঘটার আকাশেও
ভেজে ভিজুক, ছেঁড়ে ছিঁড়ুক
উপড়ে যায়ত যাক
এই বেপরোয়া বাতুলতায় ।

দুনিয়ায় সবই ত ছক বাঁধা
ছক বাঁধা আর কলের চাকায় জোড়া
অনায়াসে গড়িয়ে যেতে
কোথাও যাতে না বাধে।
একটা দল ছাড়া দিনই শুধু থাক আমার
দেউলে হবার দুঃসাহসেরও যা দেওয়ানা।

কয়েকটি সকাল

শিশিরে ভেজানো আর
সোনালী রোদের মায়া মাখা
কয়েকটা সকাল যদি
বেছে বেছে জমিয়ে রাখতে পারি
স্মৃতির গভীরে,
একটা অন্ধ অমারাত
হয়ত হতে পারে কিছু
জ্যোৎস্নায় মদির।
কিছু কিছু অন্ধকার
নিরাশ্বাস বেদনার শূন্যতা থেকেও
মাখিয়ে রাখলে চোখের পাতায়
কাজলের মত।

জীবনের কোনো কোনো জ্বলন্ত দুপুর
হয়ত হতেও পারে
অতর্কিত মেঘোদয়ে মৃদু।

কিন্তু, কেন এই দীন যোগ বিয়োগ
অমোঘের অঙ্ক একটু দোলবার দুরাশা।
জীবনের ঋতুচক্র
ঘুরে যায় আপনারই
অস্খলিত ছন্দে নির্বিকার
জীবনের মানচিত্রে
মরু মেরু দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত
অরণ্য কি সমতল প্রান্তর-বিস্তার
দুরন্ত নদী বা সিন্ধু
উত্তাল দুস্তর,
যে যার আপন ধর্মে
একেশ্বর, বিপরীত স্বাতন্ত্র্য বিলাসী।
তা যদি না থাকে,

সমস্ত কুলটা নদী সাধ্বী হয় যদি
শান্ত ও শাসিত
বাঁধ আর সেতুর বন্ধনে
দুর্লঙ্ঘ্য গিরিরা সব নতশির
অগস্ত্য বিক্রমে
নিরাপদ নিস্তরঙ্গ সে পবমায়ুর
যে চায় নিয়তি ?

আদিম

চোখের ওপর তোমায় আমি
খোলস ছাড়তে দেখছি বন্ধু
তুমি কি জানো তা ?
তোমার হাত আর পায়ের পাতাগুলো
থাবা হয়ে যাচ্ছে।
হিংস্র বাঁকা সব নখ বাড়ছে
সে থাবায়
নির্মম লুব্ধতাব মত।
দীর্ঘ সর্পিল হয়ে উঠছে ক্রমশঃ
তোমার শরীর
সর্পিল আব পিচ্ছিল শীতল
বিবরবিহারীদের মত।

অরণ্য তুমি পেছনে ফেলে এলে
অনেক দূরে ধূসর স্মৃতির অতীতে,
কিন্তু অবণ্য নিঃশব্দে এসেছে
তোমার পিছু পিছু।
তোমাব দুর্গ ঘেরা
সমস্ত পরিখা ডিঙিয়ে
তোমার সমস্ত সাঁজোয়া পাহারা
ভেদ করে,
লালসা হয়ে তা তোমার
দিনের প্রহরগুলোর মুখে
লালা ঝরায়,
আতঙ্ক হয়ে আর্তনাদে বিদীর্ণ করে
তোমার রাতের
দুঃস্বপ্ন মথিত অন্ধকার
তোমার ভেতরকার শ্বাপদটা
ক্রমশঃ তোমাকে চতুষ্পদ করে তুলছে

তা কি টের পাচ্ছ বন্ধু ?
তোমার ঘাড়ের পেশী ক্রমশঃ কঠিন হচ্ছে
মুখটা মাটিতে নামিয়ে রাখতেই
তোমার স্বাচ্ছন্দ্য
শুধু চোখ দুটো এখনো তুমি
তুলতে পারো আকাশে।
তাই এখনো তোলো বন্ধু
আকাশের নীল বিস্ময়
এখনো তোমার দুচোখ দিয়ে নেমে
অরণ্য গ্রাস থেকে
তোমায় উদ্ধার করতে পারে।

সূত্রধার

অজানা মঞ্চ,
দৃশ্যও তাই
অমোঘ কোন এক বিধানে
তাতেই দাঁড়াতে হয়েছে
সূত্রধার হয়ে
এমন এক নাটকে
যা লেখাই হয়নি এখনও

অঙ্কে অঙ্কে দৃশ্যে দৃশ্যে
যবনিকা নামছে আর উঠছে
তার আলো পড়ছে
তীব্র উজ্জ্বলতায়
আমার ওপর।

বলো সূত্রধর বলো—
চারিদিকের প্রেক্ষামন্ডপে যারা উপস্থিত
তাদের নিঃশব্দ প্রার্থনা
—বলো আমাদের সেই গোপন কথাটি
এই রহস্য নাটিকা
যা গেঁথে রেখেছে একটি সূত্রে।

কি আমি বলব ?
আমায় ঘিরে
সমস্ত মঞ্চময় আলোর বন্যা,
কিন্তু আমার চোখে
শুধু অতল অন্ধকার।

কোন অঙ্কে পৌঁছেছি
তা ঠিক জানি না
কিন্তু নাটকের—
অনেক অঙ্ক আছে বাকি
অনেক দৃশ্যও আছে
গাঢ় গভীব কুয়াশার মধ্যে অকল্পিত।

কি বলব আমি
সূত্রধার হয়ে দাঁড়িয়ে
অসমাপ্ত নাটকেব
কোথায় ফেলব শেষ যবনিকা ?
কোনও সূত্রধাব তা কি পাবে
সে নিজেই যদি হয়
সে নাটকের নায়ক ?

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

ভীরুদের ভিক্ষা নয়
সর্ব ভয় থেকে পরিত্রাণেব
শুধু ত্রাহিত্রাহি আর্তনাদ,
লুব্ধেব প্রার্থনা নয়
শুধু অশেষ অক্ষয় ধনমান পরমায়ুর
কল্পিত পদাশ্রয় শরণ নয়
দুর্বল দীনের
সত্যেব নিরাবরণ মুখ
দেখতে না চাওয়ার কাপুরুষতায়।
তোমার সন্ধান
এ সব করুণ ক্লৈব্যের অতীত
অনেক গভীরে।

জন্ম মৃত্যু জরার
অশেষ এ ঘূর্ণাবর্তই
তুমি দিতে চেয়েছ ঘুচিয়ে।
দিয়েছও তাই
এই যাতনা-যন্ত্রের,
নাভিমূল বাসনাই উপড়ে দিয়ে।

নিরর্থক জিজ্ঞাসার
নিরন্তর যন্ত্রণা তোমার নয়

তোমার শুধু শেষ উত্তরের
তুহিন প্রশান্তি।

নিজেদেরই অচ্ছেদ্য জাতক বৃত্তে বন্দী
শূন্যধ্বনির ক্রীড়াচক্র
কি হবে মিছে ঘুরিয়ে,
যদি না,
তোমার অর্হৎ সিদ্ধির
মর্মসন্ধানের সাহস
সার্থক করে
আমাদের ঐকান্তিক উচ্চারণ—
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা

ভাবনা

এই যে ভাবনা, এ শুধু আমার একার নয়,
নয় আমার নিজস্ব;
সর্বকালের সর্বদেশের মানুষ যা ভেবেছে এ হ'ল তাই।

এ ভাবনা আমার যেমন
তোমার যদি তেমন না হয়
তাহলে এসবের কোন দাম নেই বল্‌লেই পারি।
সেই অসীম ধাঁধা আর তার মীমাংসা-যদি এ না হয়
তাহলে সব নিরর্থক,
কাছেও যেমন দূরেও তেমনি এসব ভাবনা যদি না হয়
কোনো মানে তাহলে তাদের নেই।

এসব হ'লো সেই ঘাস
যেখানে মাটি যেখানে জল
সেখানেই যা জন্মায়।
এ হ'লো সেই বাতাস
সমস্ত পৃথিবী যাতে মগ্ন।

সত্য

সব সত্য আছে সব কিছুর মধ্যে লুকিয়ে,
প্রকাশের তাড়াও তাদের নেই,
বাধাও তারা দেয় না।
অস্ত্রোপচার লাগে না তাদের ভূমিষ্ঠ হতে।
তুচ্ছ আমার কাছে কিছু নেই
(স্পর্শই তো সব। কমও নয়, বেশীও নয়।)
যুক্তি আর শাস্ত্রের বচনে মন ভরে না কখনো।
রাত্রের এই আর্দ্রতা অন্তরের অনেক গভীরে আমার পৌঁছায়।
(প্রতিটি নর-নারীর কাছে যা প্রমাণিত তাই শুধু সত্য,
সত্য তা-ই, কারুর কাছে যা অস্বীকৃত নয়।)
একটি মুহূর্ত আর আমার সত্ত্বার এক বিন্দুতে
আমার মস্তিষ্কের সিদ্ধান্ত নিহিত।

আজ যা কাদার ডেলা, তাই হবে
প্রেমিক আর প্রদীপ আমি জানি।

আত্মীয়তা

হিমের রাত্রি পার হয়ে উড়ে চলেছে,
হংস বলাকা।
যে কলহংস পথ দেখিয়ে তাদের নিয়ে যাচ্ছে,
তার কলধ্বনি আমার কাছে এসে পৌঁছোচ্ছে
নিমন্ত্রণের মত।

অতি বুদ্ধিমানের কাছে হয়তো সে ডাকের
কোনো মানে নেই,
কিন্তু মন দিয়ে শুনে
ঊর্ধ্বে শীতের আকাশে
সে ডাকের মানে আমি খুঁজে পাই।
উত্তরের তুষার-প্রান্তরে যে মৃগরাজের
তীক্ষ্ণ ক্ষুরের দাগ
আলিসায় যে বেড়ালটা আছে বসে,
গাছের পাখী আর মাঠের প্রাণী
সবার মধ্যে আমি সেই এক প্রাচীন নিয়মই দেখি
যা দেখি আমাব মধ্যে।

মাটির উপর প্রতি পদ পাতে
শতেক স্নেহের ধারা ওঠে উথলে
আমার ভাষা, হার মানে তার বর্ণনায়।

ঘরের বাইরে আমার আকর্ষণ
গোধন চরায় যারা উদার মাঠে,
আর মনে যাদের সমুদ্র কি আরণ্যের স্বাদ,
জাহাজ যারা গড়ে আর চালায়
কুঠারে কাটে কাঠ আর ঘোড়া ছুটায়
তাদের আমি প্রেমিক।
দিনের পর দিন তাদের সঙ্গে খাওয়া শোয়ায়
আমায় বিরাগ নেই।।

নমুনা

মনে হয় পশু হয়ে তাদের সঙ্গে পারি থাকতে
এমনি তারা প্রশান্ত, এত আত্মস্থ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তাদের দেখি, আর দেখি।
তারা মাথাও ঘামায় না, কাঁদুনিও গায় না।
তাদের ভাগ্য নিয়ে।
বিনিদ্র রাত তারা কাটায় না পাপের অনুশোচনায়
ঈশ্বর আর কর্তব্য নিয়ে কচকচিতে ধরিয়ে দেয়না মাথা,
অতৃপ্তি তাদের নেই, নেই 'আমার' 'আমার' করা র
ক্ষ্যাপামি।

মাথা তারা কেউ নোয়ায় না কারুর পায়
মান্ধাতার যুগের কারুর কাছেও নয়।
ভব্য তারা কেউ নয়, কেউ নয় অসুখী সারা দুনিয়ায়।
তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আমি স্বীকার করি।
আমার আমিত্বের নমুনা আমি তাদের মধ্যে পাই।
কোথায় পেল তারা সে নমুনা
অনেক অনেক কাল আগে তাদের পথেই যেতে
হেলায় কি আমি এসেছি তা ফেলে।

পথিক

দেশ আর কালের সায় আমার মধ্যে,
আমার মাপ কখনো হয়নি
হবেনা কখনো।
অনন্ত পর্যটনের আমি পথিক
বর্ষাতি, আর মজবুত জুতো আর কাঁধে একটি লাঠি
এই আমার নিশানা।

আমার ঘরের আসনে আমার কোন বন্ধু বসেনা আরাম করে।
বসবার আসনই নেই,
নেই দেবায়তন কি দর্পন।
ভোজসভায় কাউকে আমি ডাকি না,
পাঠাগারে কি টাকার বাজাবে।

পুরুষ ও নারী, তোমাদের প্রত্যেককে
বাহু পাশে জড়িয়ে আমি নিয়ে যাই এক টিলায়
দেখাই মহাদেশের দূরাভাস আর প্রশস্ত রাজপথ।

তোমাদের হয়ে আমি পারবনা সে পথ পর্যটন করতে
পারবে না আর কেউ
তোমাদের নিজেদের হবে যে পথে চলতে।

প্রতীক্ষা

চিতি চিলটা ছোঁ মেরে উড়ে যায়
 আমার দোষ ধরে'।
আমি বচনবাগীশ আর ঘুরে বেড়াই খেয়াল মত
 এই বুঝি তার নালিশ।

আমিও পোষ মানা নই মোটে
অনুবাদে আমার ধরা যায় না।
পৃথিবীর শিখরে শিখরে
আমার উদ্দাম বর্বর হাঁক আমি দিয়ে যাই।

দিনের শেষে ঝোঁড়ো মেঘ
 আমার জন্যে থাকে থমকে
ছায়াচ্ছন্ন অরণ্য-প্রান্তরে দেয় আমার স্বরূপ
 ছড়িয়ে ছুড়ে' আর সবার মত।

কুয়াসা আর সন্ধ্যার অন্ধকারে
 আমাকে নেয় ভুলিয়ে!
বাতাস হয়ে আমি বিদায় নিই
পলাতক সূর্যের পানে নাড়ি আমার শুভ্র কেশের গুচ্ছ।
ঘূর্ণাবর্তে দেহ আমার উচ্ছ্বসিত,
 ভাসমান রুক্ষ স্রোতের জালে।

ধূলায় নিজেকে আমি ঢালি
ভালবাসি যে ঘাস, তাই থেকে আবার জাগতে,
আমায় যদি চাও আবার
খুঁজো তোমাদের জুতোর তলায়।
কে-ই বা আমি কি-ই বা চাই বলতে,
জানবে না হয়ত' কিছুই;
তবু তোমাদের ভালোই যাব করে',
তোমাদের শোণিত-শোধন আর সমৃদ্ধি।

প্রথমে যদি না পাও হাল ছেড়ো না।
এখানে না পেলে খুঁজো আর কোথাও,
কোথাও আমি থাকবই
তোমাদের প্রতীক্ষায়।

নিজের গান গাই

আমার নিজের গান গাই
 সাধারণ স্বতন্ত্র এক সত্ত্বার।

তবু আমার কণ্ঠে গণতান্ত্রিক এই শব্দ উচ্চারিত,
উচ্চারিত জনগণের নাম।
আপাদমস্তক 'শরীর তত্ত্বের' গান আমি গাই
শুধু মুখ নয় মস্তিষ্কও নয় কবিতার যো[illegible] বিষয়
যোগ্যতর বিষয় এই দেহ তার সম্পূর্ণতায়।

যেমন পুরুষের তেমনি নারী-দেহের গানও গাই।
আবেগে স্পন্দনে শক্তিতে বিপুল যে জীবন,
আনন্দময় যে জীবন ঐশ্বরিক নিয়মের শাসনে সৃষ্ট,
সেই আধুনিক মানুষের গান আমি গাই।

ভাবী কালের কবি

ভাবী কালের কবি!
অনাগত বক্তা, গায়ক, সাংগীতিক।
আমায় সমর্থন করবার দিন আজ নয়
দিন নয় আমার হয়ে জবাবদিহি দেবার।

কিন্তু তোমরা নবযুগের সন্তান সব,
দেশজ, বলিষ্ঠ, অসঙ্কীর্ণ
অতীতের তুলনায় মহত্তর,
তোমরা জাগো!
কারণ আমাকে
সার্থক করতে হবে তোমাদেরই।
আমি রেখে গেলাম আমার লেখায়
দু' একটি শব্দে ভাবীকালের ইঙ্গিত।
এগিয়ে গেলাম শুধু বুঝি একটি মুহূর্ত
আবার পাক খেয়ে অন্ধকারে ফিরে মিশতে।

আমি সেই মানুষ,
অলস মন্থর পর্যটনেব না থেমে যে
তোমাদের দিকে বারেক চেয়েই
মুখ নেয় ফিরিয়ে।
তোমাদেরই ওপর রেখে দেয় ভার
সেই চাহনি বোঝাবার আর প্রমাণ করবার,

তোমাদের কাছেই সারাৎসার যে আশা করে।

নিখুঁত

ঘাসের ডগাও যা
নক্ষত্রদের চলাও তাই, আমি জানি
কালির একটি কণা, আর পিঁপড়ে, আর
বাবুই পাখীর ডিম সবই সমান নিখুঁত।

তোমাকে

অচেনা পথিক, পথে যেতে আমায় দেখে
দু'টো কথা যদি কইতে চাও,
কেনই বা কইবে না?
আর আমিই বা কেন সম্ভাষণ করব না তোমাকে?

হে পাঠক

হে পাঠক, আমার মতই প্রাণের বেগে ও প্রেমে
তুমি স্পন্দমান,
তাই তোমার জন্যই রইল এসব দান।

পোমানক থেকে যাত্রা

বিগত দিনের
কবি, দার্শনিক, পুরোহিত,
শহীদ, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক,
অতীতের সব রাষ্ট্র আর সমুদ্র পারের নানা দেশের
ভাষা যারা পড়েছে,
দোর্দণ্ড প্রতাপ যে সব জাতি উদ্ধত
অথবা নিষ্প্রভ সংকুচিত ম্রিয়মান
তোমাদের সবাইকে জানাই আমার শ্রদ্ধা।

তোমরা যা দিয়ে গেছ, তা এসেছে আমার
কাছে ভেসে,
আমি নিয়েছি সে দান।
স্বীকার করেছি তার মূল্য,
তার পর অসংকোচে ফেলে এসেছি চলে।
আমার নিজের দেশ আর কাল নিয়েই আমার স্থিতি।
এখানে নারী ও পুরুষ দেশ

এখানে বিশ্বের উত্তরাধিকার
এখানে বস্তুর অন্তরের সেই শিখা
সেই অধ্যাত্ম অনুবাদিকা
প্রত্যক্ষের চরম স্বরূপ যে দেখায়।

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর পরম পরিতৃপ্তি যার হাতে,
আসছে আমার সেই অভিসারিকা আত্মা।

ব্যাপ্তি

চেয়ে দেখো,
আমার কবিতার ভিতরে দিয়ে ষ্টীমারগুলো চলেছে—
জল মন্থন করে',

আসছে বিদেশের মানুষ
এই তীরেই নামছে।

দেখো আদিম সেই পাতার কুঁড়ে,
বন কেটে বেরুনো সেই পথ
সেই শিকারীর ডেরা, সেই চেপ্টা নৌকা,
সেই ভুট্টার শীষ, দখল করা জমি,
আর বেড়া, আর সেই জংলী গ্রাম।

দেখো, একদিকে পশ্চিমের সাগর আর একদিকে পূর্বের,
ঢেউ দিয়ে আসছে যাচ্ছে আমার কবিতায়।
প্রান্তর আর অরণ্য দেখতে পাবে আমাব কবিতায়,
বন্য ও পালিত পশু
দেখবে বুনো মহিষের পাল
চরছে কোঁকড়ান ছোট-ঘাসের প্রান্তরে।
পাথর বাঁধান রাস্তায় বড় বড় ইট কাঠ লোহার
অট্টালিকা সমেত বিশাল জমকাল শহর
আমার কবিতায় দেখতে পাবে,
দেখতে পাবে বাণিজ্যের ব্যস্ততা
আর অগণন অবিরাম
যান-বাহনের গতি।
দেখো বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্রের জটিলতা, দেখো
বিদ্যুৎ-বাহী তার সমস্ত দেশময় গেছে ছড়িয়ে।
দেখবে সমুদ্রগর্ভ দিয়ে আমেরিকার ধমনী
ইউরোপে গিয়ে স্পন্দিত
সেই স্পন্দন আবার ইউরোপ
থেকে আসছে ফিরে।

দেখো, বলিষ্ঠ বেগমান রেলের ইঞ্জিন ছুটছে
হাঁপাতে হাঁপাতে বাষ্প আর ধোঁয়া ছেড়ে।

দেখো, চাষীরা চষছে জমি, খনির মজুরেরা মাটি
খুঁড়ছে পৃথিবীর গহবরে,
দেখো অসংখ্য কারখানা থেকে
উঠছে কাজের গুঞ্জন।

এই আমেরিকার মাঠে ঘাটে দোকানে বাজারে সর্বত্র
আমি ঘুরে বেড়াই দিন-রাত্রির গাঢ় বেষ্টনে
সকলের ভালবাসা নিয়ে।
সেইখানেই পাবে আমার গানের উচ্চ প্রতিধ্বনি,
পড়বে আগামী কালের সার্থক ইঙ্গিত।

মায়া

ভয়ঙ্কর সেই সন্দেহ,
যা দেখেছি তা যদি হয় ভুল!
হয়তো সবই আমাদের বিভ্রম,
এই অনিশ্চয়তা,
বিশ্বাস আর আশা হয়তো সবই আমাদের জল্পনা।
মৃত্যুর পারেও কিছু যে থাকে তা হয়তো মধুর কল্পনা মাত্র।

হয়তো যা কিছু দেখি গাছ পালা প্রাণী মানুষ
পাহাড় আর নদীর স্রোত,
দিন রাত্রির আকাশ, রং, রূপ আর তাদের বারতা
হয়ত সবই মায়া মাত্র,
যা সত্য তা এখনও অজানিত।
আমাকে বিমূঢ় করে বিদ্রূপ করতে
কতবার চকিতে তারা আভাস দেয়।
কতবার মনে হয় আমিও কিছুই জানি না।
জানেনা কেউ কোথাও তাদের স্বরূপ।

খেয়াপার

নীচে জোয়ারের স্রোত।
মুখোমুখি দেখছি আমি সব।
পশ্চিমের আকাশে মেঘ
সকালের সূর্য—সব আমি দেখছি মুখোমুখি।
সেই প্রতিদিনের সাধারণ পোষাকে সাধারণ মানুষের ভীড়।

কিন্তু আমার কাছে কি অপূর্ব তারা সবাই—
খেয়ানৌকোয় যারা পারাপার করছে—শত শত মানুষ
আমার কাছে তাদের বিস্ময় যেন ফুরোয় না।
অনেক কাল পরে এক তীর থেকে যে যাবে আর এক তীরে
আমার ধ্যানে আমার কল্পনায় কতখানি তার জায়গা
সে নিজেও হয়ত জানে না।

স্থান কাল সব নিরর্থক, মিথ্যা যত দূরত্ব—
একালের তোমাদের সবাইকার আমি সংগী।
সংগী সুদূরকালের সবাইকার।

এই নদী আর আকাশ যে দোলা তোমাদের মনে দিয়েছে
আমাকেও দিয়েছে তাই।
তোমাদের মত আমিও ছিলাম জনতার মধ্যে জনৈক।
এই নদীর উজ্জ্বলধারায় তোমাদের মতই আমিও
শুচিস্নাত হয়েছি আনন্দে,
রেলিঙে ভর দিয়ে তোমাদের মতই
স্রোতের জলে গিয়েছি ভেসে।
তোমাদের মত দেখেছি সব জাহাজের পাল আকাশে তোলা
ষ্টীমারের মোটা মোটা নল জলের মধ্যে নামানো।
বয়ে যাক্ দুরন্ত নদী আমার।
বয়ে যাক্ জোয়ার আর ভাঁটায়
খেলা করুক ফেনার ঝুঁটি পরা ঝিনুক-পাড়-ঢেউ-এ ঢেউ এ!
সূর্যাস্তের মেঘ সমারোহ রঙের ধরায় আমায় দিক সিক্ত করে
দিক তাদের সকলকে যারা আসছে আমার পরে
ভাবীকালের নরনারী।
অগণন যাত্রীরা পার হোক কূল থেকে কূলে
মানহাটান এর সুদীর্ঘ সব পাল উঠুক আকাশে
ব্রুকলিনের সুন্দর সব পাহাড় থাক দাঁড়িয়ে।
দিশাহারা তবু উৎসুক এ মন হোক স্পন্দিত।
বিচ্ছুরিত হোক প্রশ্ন আর উত্তর।
এখানে আর সর্বত্র থাকুক ভেসে সমাধানের চিরন্তন ভেলা।
তৃষিত ব্যাকুল দৃষ্টি পড়ুক বাড়ী থেকে রাস্তায়, পড়ুক জনসভায়।
তরুণদের কণ্ঠ উঠুক মুখর হয়ে
ডাকুক মধুর উচ্চৈঃস্বরে, আমায়,
অন্তরংগ আমার গানে।
হে পুরাতন প্রাণ জাগো,
নামো সেই ভূমিকায় যা নট নটীদের
পানে ফিরে চায়।
সেই পুরানো ভূমিকায় আবার করো অভিনয়,—

যা বড় কি ছোট হওয়া

সবই নিজের চেষ্টাধীন।
আমার এ লেখা যারা পড়ছে, তারা বারেক শুধু যেন ভাবে
তাদের অজান্তে হয়ত তাদের আমি দেখেছি।

সাগর-পাখীরা উড়ে যাক্
যাক পাশ কাটিয়ে সরে,
কিম্বা ঘুরুক চক্রাকারে ঊর্ধ্ব আকাশে।
হে নদীজল! নিদাঘের আকাশকে একান্তভাবে
ধরে রাখো তোমার বুকে
নতদৃষ্টি আমাদের চোখ যতক্ষণ না তার সমস্ত মাধুর্য
নিঃশেষে তোমার কাছ থেকে তুলে নিতে পারে।
আমার কিম্বা আর কারুর মাথায় লেগে
সূর্যদীপ্ত-জলে বিচ্ছুরিত হোক সূক্ষ্ম সব কিরণ-রেখা।

নদীর মোহনায় উপসাগর থেকে
জাহাজ সব আসুক ভেসে
সাদা পাল তোলা 'স্কুনার' আর সুলুপ আর ছোট স্টীমলঞ্চ।
দেশ-দেশান্তরের পতাকা উড়ুক আকাশে
সূর্যাস্তে তাদের নামাও।
জ্বলুক কারখানার চুল্লি। পড়ুক দীর্ঘ ছায়া।
রাত্রে বাড়ীগুলোর মাথায় লাগুক হল্‌দে-লাল আভা।
আজ কিম্বা আগামী কাল
দৃশ্যরূপে যেন থাকে বাস্তবতার ইঙ্গিত।
আত্মায় থাক অপরিহার্য সূক্ষ্ম আবরণ,
আমাদের স্বর্গীয় সুরভী থাক আমাকে ও তোমাকে ছায়ার
মত ঘিরে;
সমৃদ্ধি হোক নগরের
বিশাল নদীরা আনুক তাদের পণ্য আর পোত বয়ে।
সেই সত্তা হোক বিস্তৃত
যার চেয়ে আধ্যাত্মিক কিছু বুঝি আর নেই।
স্থাবর হোক সেই সব বস্তু
যার চেয়ে স্থায়ী কিছু নেই।

অপেক্ষা করেছ তোমরা, ধৈর্য-ই তোমাদের ধর্ম।
হে মৌন সুন্দর যাজক-দল
তোমাদের গ্রহণ করলাম মুক্তমনে এতদিনে।
আশ আর আমাদের মিট্‌বে না।
আর কোথায় যাবে এড়িয়ে।
কেমন করে থাক্‌বে দূরে!

তোমাদের আমরা দিলাম দূরে না ফেলে'
চিরকালের মত, নিজেদের মধ্যে নিলাম মিশিয়ে
তোমাদের মানতে আমরা চাইনা।
—ভালবাসি শুধু—
কারণ তোমরাও সম্পূর্ণ।
অনন্তের পথে তোমাদেরও আছে দান
স্বল্প কি প্রচুর। তোমরাও জোগাও
আত্মার উপকরণ।

ত্রিকাল

অতীতের যত সম্বন্ধ
পিতৃকুল আর মাতৃকুল, যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত যত সম্পদ্,
যা না থাক্‌লে আমি আজ এমন হ'তাম না
মিশর ভারতবর্ষ ফিনিসিয়া, গ্রীস ও রোমের সঙ্গে সম্বন্ধ,
সম্বন্ধ তাদের সকলের সঙ্গে,—
কেল্ট, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান, অ্যাল্‌ব্ ও স্যাক্সন
প্রাচীন-কালের সাগর-পাড়ি,
ব্যবহার-নীতি, কারুশিল্প, সংগ্রাম ও অভিযান
কবি ও তার গাথা, পুরাণ ও দৈববাণী
ক্রীতদাস ও ভবঘুরে গাইয়ে—
জেহাদের সৈনিক ও মঠের ভিক্ষু
প্রাচীন সেই মহাদেশ যা থেকে আমরা এলাম
অস্তগামী সেই সব রাজ্য ও নৃপতি
বিলীয়মান ধর্ম ও পুরোহিত
বর্তমানের বিস্তৃত তীর থেকে দেখা
অনাদিকালের সেই প্রবাহ
যা এই বর্তমানে এসে উপস্থিত
উপস্থিত তুমি ও আমি
উপস্থিত আমেরিকা
এই চলতি বছরে—
অনন্ত ভাবীকালে নিজেকে পাঠিয়ে।
কাল ত কিছু নয়
আসল হলাম আমরা—আমি ও তুমি
সব ন্যায়-নীতি আমাদেরই নিয়ে
আমাদেরই মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক বিধৃত।
আমরাই চারণ দৈববাণী ক্ষপনক্ ও ক্ষত্রিয়
আমরা এই সব এবং তার চেয়ে আরো বেশী কিছু।

অনাদি অনন্তকাল ও শুভাশুভের মধ্যে
আমরা দাঁড়িয়ে
সব কিছু আবর্তিত আমাদের ঘিরে
আলো এবং অন্ধকার।
গ্রহদের নিয়ে সূর্য এবং আরও সব সূর্য
আমাদের করছে প্রদক্ষিণ।

আর আমি (এই দুরন্ত যুগের ছিন্নভিন্ন ঝটিকাবেগ)
সব কিছুর ধারণা আমার মধ্যে নিহিত।
আমিই সবকিছু সবকিছুতে আমার মনের সায়।
জড়বাদ ও আধ্যাত্মিকতা
সবই আমি সত্য বলে জানি,
কিছুই আমি বাদ দিই না।

(আমার কোন ভূমিকা কি আমি ভুলেছি ?
অতীতের কোন কিছু ?
আসুক যে কেউ বা যা কিছু আমার কাছে
স্বীকৃতি তা পাবেই।)

অ্যাসিরিয়া চীন টিউটোনিয়া কি হিব্রুরা
সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা—
সব মত আমি গ্রহণ করি, সব পুরাণ, দেবতা
ও অপদেবতা
সব কাহিনী, বাইবেল্, কুলজি
সত্য বলে আমি জানি।

যা হওয়া উচিত ছিল
সমস্ত অতীত ঠিক তাই,—এই আমার ঘোষণা।
সম্ভব ছিল না আরো ভাল কিছু তার হবার।
যা উচিত, বর্তমান ঠিক তাই হয়েছে,
ঠিক তাই হ'য়েছে আমেরিকা,
এর চেয়ে কিছু হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব।
অতীত ছিল মহান, আমি জানি
জানি ভবিষ্যৎ হবে গৌরবোজ্জ্বল।
বর্তমানের মধ্যে অদ্ভুত তাদের মিলন
(আমি তারই জন্যে প্রতীক গড়ি সেই সাধারণ
জন্যে।)
[তু]মি আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে
সমস্ত কাল ও সর্ব জাতির তাই হ'লো কেন্দ্র
অতীত ও আগামীকালের মানুষের ধারায়
গভীর অর্থ আমাদের মধ্যে নিহিত।

জনাকীর্ণ নগরে

জনবহুল এক শহর পার হতে হতে
ভবিষ্যতের জন্য আমার স্মৃতিতে নিয়েছি ছেপে তাব স্থাপত্য
রীতি নীতি, ঐতিহ্য, আর প্রদর্শনী
কিন্তু এখন কেবল মাত্র একটি মেয়ের কথাই মনে আছে ঐ শহরের
হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হওয়াব পর সে আমায়
তাব ভালবাসা দিয়ে বেঁধে বেখেছিল।
দিনের পর দিন বাতের পব বাত আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি,
এছাড়া আর সব আমি ভুলে গেছি।
কেবল তাকেই মনে আছে আমার
অন্ধ আবেগে যে আমায় আঁকড়ে ধরেছিল—
আমরা ঘুবে বেড়িয়েছি, ভালবেসেছি, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি
আবার ;
আবাব সে আমার হাত ধরেছে যাতে আমি চলে না যাই ;
আমি তাকে দেখেছি ঘনিষ্ঠ ভাবে আমাব পাশে ;
তাব নীরব ঠোঁট দুটি করুণ আর কম্পমান।

কাঠুরে

সুঠাম অস্ত্র, নগ্ন ও পাণ্ডুর।
ধরিত্রীর গর্ভ থেকে টেনে আনা তার মাথা
কাঠ যেন দেহ আর অস্থি হোল ধাতুর তৈরী ;
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মোটে একটি, অধরও তাই।
রক্তিম উত্তাপ থেকে জ্বলেছে ধুসর-নীল পাতা,
আর বাঁটটা তৈরী হয়েছে ক্ষুদ্র বীজ থেকে।
ঘাসের মধ্যে রাখা,
নামাতে আর ভর দিতে!
জোরাল গড়ন আর তার উপযুক্ত গুণরাশি।
পেশা, দৃশ্য আর শব্দ, যা কিছু পুরুষোচিত তার প্রতীক।
বহুবিচিত্র রূপ সঙ্গীতেব সূক্ষ্ম শব্দ ;
অর্গান বাজিয়ের আঙুল, বিরাট অর্গানের চাবিতে
লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ম সুর তুলে।

(২)

পৃথিবীর সমস্ত মৃত্তিকা স্বাগতম্
প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে— ;
স্বাগতম্ পাইন আর ওক গাছের দেশ,
স্বাগতম্ ডুমুর আর লেবুগাছের জন্মস্থান,

সোনার দেশ স্বাগতম্,
স্বাগতম্ গম আর ভূট্টার দেশ,
স্বাগতম্ আঙ্গুরের জন্মভূমি,
স্বাগতম্ ধান আর ইক্ষু।
স্বাগতম্ তুলার দেশ,
স্বাগতম্ শাদা-আলু আর রাঙ্গা আলুর দেশ।
স্বাগতম্ পর্বতেরা, স্বাগতম্ সমতল অরণ্য প্রহরী ;
স্বাগতম্ রত্নপ্রসূ নদী-তীর, মালভূমি, খাঁড়ি ;
স্বাগতম্ অন্তহীন চারণ ভূমি,
শণ আর পুষ্প-কুঞ্জের মৃত্তিকা
স্বাগতম্ আরো কঠিনতর মাটি,
ফলের, গমের, ধানের বা সোনার মতই মূল্যবান তারা
খনির মাটি, পুরুষালি অচিক্কণ ধাতব মাটি,
কয়লার মাটি, তামার মাটি
সীসের মাটি, টিন, দস্তার মাটি
লোহার মাটি সেই মাটি যা থেকে কুঠার হয়।

(৩)

কাঠের গুঁড়ির গাদায় হেলান রয়েছে কুঠারটা
কুঁড়েঘর......দরজার মাথায় দ্রাক্ষালতা......
পরিস্কার করা জমি বাগানের জন্য—।
ঝড় থামার পর পাতার ওপর থেকে থেকে বৃষ্টি পাত
থেকে থেকে আর্তনাদ আর গুমরানি,
সমুদ্রের চিন্তা—
ঝড়ে-পড়া জাহাজ যার মাস্তুল কেটে ফেলেছে,
প্রাচীন সব অট্টালিকার কড়ি আর গুদাম ঘরের বিশাল
কাঠগুলো
স্মরণীয় ছাপ কিম্বা কাহিনী—জিনিষপত্র, পরিবার,
আর মানুষের অভিযান ;—
তীর ছেড়ে নতুন শহর খুঁজে পাওয়া ;
তাদের যাত্রার কাহিনী যারা নতুন ইংল্যান্ড
খুঁজে পেতে চেয়েছিল এবং খুঁজে পেয়েছিল—।
আরাকানসাস্ কলরেডো অটোয়া, উইলামেটের উপনিবেশ
আস্তে আস্তে এগিয়ে চলা, কুঠার, বন্দুক, পোটলা পুঁটলি
সমস্ত অভিযাত্রিক আর মানুষের সৌন্দর্য
বন-বালক আর অরণ্যচারীদের—সৌন্দর্য আর
সরল অসংস্কৃত মুখ,—
স্বাধীনতা, আত্ম-নির্ভরতার সৌন্দর্য ;

অনুষ্ঠান আব পদমর্যাদার প্রতি আমেরিকান-সুলভ ঘৃণা ;
আর বন্ধনের বিরুদ্ধে অসীম অধৈর্য ... ।
কসাইখানার কসাই স্কুনার আর সুলুপের
খালাসী—ভেলা যারা ভাসায় আর অগ্রণীর দল ;
শীতের অরণ্যাবাসে কাঠুরেরা, গাছের অংগ প্রত্যংগে
তুষার-প্রলেপ
নিজের আনন্দোজ্জ্বল পরিষ্কার কণ্ঠস্বর খুসীভরা গান ;
বনের স্বাভাবিক জীবন, দিনের কঠিন কাজ... ।
বাত্রির গন্‌গনে, আগুন, আহারের মধুর স্বাদ,
সেই আলাপ, হেমলক শাখা, ভাল্লুকের চামড়াব বিছানা,
গৃহ নির্মাণকারী—নগরে বা কোথাও কাজে ব্যস্ত ;
জোড়া লাগান, কাটা, সমান করা, ঠিক জায়গায় বসান
হাতুড়ীর আর যন্ত্রের প্রহার
প্লেটের ওপর বাঁকানো বাহু আর অন্য হাতে চলেছে কুঠার
মেঝে তৈরী করছে যে সে পেরেক
মারবার জন্য তক্তাগুলো এগিয়ে দিচ্ছে।
খালি বাড়ীটার মধ্যে বেজে উঠেছে প্রতিধ্বনি .
বিশাল গুদামটা প্রায় তৈরী হয়ে এলো শহবে. .
ছ'জন বাহক, দু'জনে সামনে, দু'জনে মধ্যে আর দু'জনে
পিছনে
সতর্কতাব সংগে বয়ে নিয়ে আসছে ভারী কড়িকাঠটা।
রাজমিস্ত্রিব দল; দু'শো ফিট লম্বা
পাঁচিল একধারে তুলতে ব্যস্ত;
তাদের দেহের নমনীয় ওঠানামা;
বিরামহীন কর্নিকের আওয়াজ;
চুন, সুরকীর পলেস্তারার কাজ;
মাস্তুলের জন্য কুঠার চালিয়ে কাঠ দু'চালা করা,
ইস্পাতের বাঁকা হয়ে পাইনের বুকে ঢোকার
তাজা সংক্ষিপ্ত ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ—
মাখন রঙের টুকরো গুলো রূপালী হয়ে হাওয়ায় ওড়া,
বাদামী রঙের তরুণ বাহুগুলি স্বচ্ছন্দ গতি;
মাল তোলা আর নামানোর দৃঢ় পাটাতন;
সেতু, স্তম্ভ, বয়া যারা সমুদ্রের বিরুদ্ধে আশ্রয়,
—তাদের নির্মাণ—
শহুরে দমকলের কর্মী; সেই আগুন যা সহসা জ্বলে ওঠে
ঘন সন্নিবিষ্ট বসতির মধ্যে;—
আগন্তুক ইঞ্জিন রুক্ষ আওয়াজ, নিপুণ পদক্ষেপ
আর দুঃসাহস—।
ভেরীর—মধ্যে দিয়ে জোরাল আওয়াজ;

সারি বেঁধে দাঁড়ান—।
জল দেবার জন্য বাহুগুলোর ওঠা আর নামা।
সূক্ষ্ম নীল আর শাদা রঙের যন্ত্র,
আংঠা আর দড়িগুলোকে কাজে লাগান,
আগুনের আভা-লাগা মুখে জনতা নিরীক্ষণ করছে;
আলোর ঔজ্জ্বল্য আর ঘন ছায়া ...।
কাঠের কাঠামো কেটে ফেলা;
দেখা.... মেঝের তলায় আগুন আছে কিনা;
আগুনে লোহা গলায় যে সে,
আব তার পেছনে যে লোহা ব্যবহার করে,
ছোট বড়, মাঝারি কুঠার গড়ার কামার,
বাছাইকারী ঠান্ডা ইস্পাতে নিশ্বাস—
ফেলছে আর পরীক্ষা করছে ধার
বুড়ো আঙুল দিয়ে।
অতীতের ব্যবহারকারীদের প্রতিচ্ছবির ছায়া
মিছিল;—
আদিম ধৈর্যশীল যান্ত্রিক কারিগর আর
শিল্পবিদ;...
সুদূর অতীতের আসীরিয়া আর মিজরা
অট্টালিকা—
দন্ড ও কুঠারধারী রোমান অধিনায়কের
অগ্রবর্তী নকীবরা...
অতীতের কুঠারধারী য়ুরোপীয় যোদ্ধা
ঊর্ধ্বায়িত বাহু—
শিরস্ত্রাণ সমন্বিত মস্তকে প্রহার-ঝঞ্ঝনা;
মৃত্যু-চীৎকার টলটলায়মান দেহ;
বন্ধু আর শত্রুর ছুটাছুটি;—
মুক্তিব্রতী দাসেদের বিদ্রোহ;
আত্মসমর্পণের নির্দেশ,—
দুর্গ-দ্বারে আঘাত;—
সন্ধি আর বিরোধীপক্ষের প্রতিনিধিদের
দর কষাকষি;
তখনকার দিনের এক পুরানো শহরের লুন্ঠন,.
ভাড়াটে সৈন্য আর ভবঘুরেদের
বিশৃঙ্খল অভিযান;
চীৎকার, আগুন, রক্ত, মত্ততা পাগলামী;
ঘর মন্দির থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসা
ডাকাতদের হাতে রমণীদের কাৎরানি;
অনুচরনের চুরি আর চালাকী!

পলায়নপর মানুষ;—
প্রাচীনদের অপসারণ, —
যুদ্ধের নরক; অনুশাসনের নিষ্ঠুরতা;
ন্যায় কিংবা অন্যায় যাই হোক না কেন
পালনীয় কর্ম আর কথার তালিকা,
ন্যায় বা অন্যায় যাই হোক না কেন
ব্যক্তিত্বের শক্তি।

(৪)

শক্তি আব সাহস চিরজয়ী।
যা জীবনকে জয়ী ক'ে তাই করে মরণকে;
মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলে জীবন।
অতীত বর্তমানের চেয়ে অনিশ্চিত নয়,
মানুষেব আব পৃথিবীব রুক্ষতা তাদেব কোমলতার
মতই ঘিবে রেখেছে পৃথিবীকে—
ব্যক্তিগত গুণ ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই টিঁকে না।

তোমার মনে হয় কি বেঁচে থাকে?
তুমি কি ভাব বিশাল শহর টিঁকে থাকবে?
কিংবা অগণন শিল্প-সমৃদ্ধ রাজ্য,
অথবা সুগঠিত শাসনতন্ত্র?
কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ
বাষ্পীয় জলযান সমূহ,
হায় এরা নিজেদের জন্য নয়,
এরা কালের ক্রীড়ানক;
যেমন নর্তকেরা নাচে, বাজিয়েরা বাজনা বাজায়,
তারপর খেলা শেষ হয়—
সব ভালই চলে যতক্ষণ না ঝলসে ওঠে
বিদ্রোহের বিদ্যুৎবহ্নি;—
বড় শহর হোল তাই যেখানে মহান নরনারীরা বাস করে,-
এটা যদি কতকগুলো
ভাংগাচোরা কুঁড়ের সমষ্টি হয়,
তাহলেও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শহর তাই।

(৫)

বিরাট নগর, লম্বা জেটী, পোতাশ্রয়;
শিল্পোদ্যম আর সঞ্চয়ের ওপর
গড়ে উঠে না।
নবাগত আর চলিষ্ণু যাত্রীদের নোঙ্গর
তোলার অবিরত নমস্কারের মধ্যেও নয়;
পৃথিবীর সবচেয়ে মহার্ঘ্য বা
উঁচু অট্টালিকা বা দামী জিনিষের
দোকানের জন্যও নয়—
যেখানে শ্রেষ্ঠতম পাঠাগার, বিদ্যায়তন রয়েছে;
কিংবা যেখানে অর্থ অপর্যাপ্ত;
সে সব যায়গাতেও নয়,
যেখানে জনসংখ্যা অগণন সেখানেও নয়।

যেখানে তাজা বক্তা আর কবিরা রয়েছে,
যে শহর তাদের ভালবাসায় ধন্য,
এবং যে শহরে তাদের রয়েছে স্বীকৃতি আর সম্মান;
যেখানে শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ রচিত হয়েছে
সাধারণ কথায় আর কাজে
যেখানে মিতব্যয়িতা আর ধূর্ততা যথাযথ ভাবে রয়েছে,
যেখানে নর-নারীরা হাল্কাভাবে আইন
সম্পর্কে চিন্তা করে
যেখানে ক্রীতদাস নেই, নেই ক্রীতদাসের মালিক;
যেখানে জন-সাধারণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের
অশেষ স্পর্দ্ধার বিরুদ্ধে এক লহমায় উঠে দাঁড়ায়,
যেখানে ভয়াল নরনারী এগিয়ে আসে,
যেখানে এগিয়ে আসে মৃত্যুর নির্দেশ,
সমুদ্রের ভাসিয়ে নেওয়া উত্তাল তরঙ্গ রাশি,
যেখানে বাহিরের কর্তৃপক্ষের চেয়ে অভ্যন্তরীন কর্তৃপক্ষের
সর্বদাই প্রাধান্য।
যেখানে নাগরিকরাই কর্তা আর আদর্শ;
রাষ্ট্রপতি, পৌরাধিনায়ক, রাজ্যপাল আর
হোমরাও সিং চোমরাও আলীরা
পয়সা দেওয়া-নেওয়া দালাল মাত্র,
যেখানে শিশুদের নিজেদের আইন করে চলাফেরার
শিক্ষা দেওয়া হয়,
শিক্ষাদেওয়া হয় নিজেদের ওপর নির্ভর করার;
যেখানে ন্যায়াচরণ কাজে রূপায়িত;

যেখানে আত্মার গবেষণাকে বাহাদুরী দেওয়া হয়
যেখানে নারীরা পুরুষের মতই রাস্তায়
শোভাযাত্রা করে বেরোয়,
এবং পুরুষের তুল্য অধিকার পায়।
সব থেকে বিশ্বাসী বন্ধুরা যেখানে থাকে,
সব থেকে নির্মল যেখানে যৌন আচার।
যেখানে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান জনকরা থাকে,
যেখানে সবচেয়ে সুঠাম শরীরের জননী;
সেখানেই রয়েছে মহান আর সব চেয়ে
সেরা শহর।

(৬)

দুরন্ত কাজের কাছে কি দীনহীন দেখায়
যুক্তি তর্ক!—
নরনারীর দৃষ্টির সম্মুখে কি সাংঘাতিক ভাবে
বিবর্ণ হয়ে কুঁকড়ে যায় রঙবেরঙের
শহুরে বস্তুনিচয়।
সকলে অপেক্ষা করে বা বলে যায় যতক্ষণ না
আবির্ভাব ঘটে এক বলিষ্ঠ পুরুষের,
বলিষ্ঠ ব্যক্তিই হোল জাতি এবং পৃথিবীর
কর্মক্ষমতার প্রমাণ।
যখন তাদের আবির্ভাব ঘটে তখন সব কিছুতে,
থাকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম মেশানো।
আত্মা নিয়ে ঝগড়া তখন থামে,
পুরান আচার আর কথা মুখোমুখী দাঁড়িয়ে—
হয় পশ্চাদপসরণ করে নয় পথ ছেড়ে দেয়।
তোমার অর্থ-লালসা এখন কোথায়?
কি করতে পার তা'দিয়ে এখন?
তোমার তত্ত্ববিদ্যা, শিক্ষা, সমাজ, ঐতিহ্য,
শাসনবিধি এখন কোথায়?
তোমার বেঁচে থাকার তামাসাটা কোথায় এখন?

(৭)

এক বন্ধ্যা ভূচিত্র ঢেকে দিয়েছে ধাতব মাটিকে;
সকলের দেখা থেকে ঢেকে রাখাই

সকলের চেয়ে ভাল।
খনি আর মজুবরা রয়েছে;—
ফার্ণেস তৈরী—ধাতু গলিত;
কামার তার হাতুড়ি আর চিমটে নিয়ে প্রস্তুত;
যা সব সময়ে সেবা করবে আর কবে এসেছে—
হাতের কাছে প্রস্তুত।
কিছু বা কেউ এর থেকে বেশী সেবা করেনি,
এ সবাইকে সেবা করেছে;
বাক্‌পটু আর সূক্ষ্ম-বোধ-সম্পন্ন গ্রীকদের;
আব তারও আগে সেই স্থাপত্য-নির্মাণে যা দীর্ঘস্থায়ী।
হিব্রু, পারশী এবং বহুপ্রাচীন হিন্দুস্থানের অধিবাসী,
—তাদের সেবা করেছে।
মিসিসিপির মৃৎ স্তূপ যারা তুলেছে, আর যাদেব
স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে মধ্য আমেরিকায়,
অরণ্য বা সমতলের অছেদিত স্তম্ভ সমন্বিত
আল্‌বিক মন্দিরের সকলের সেবা কবেছে এ;
সেবা কবেছে ড্রুইডদের
স্কান্ডিনেভিয়ার তুষারাচ্ছাদিত নিস্তব্ধ
সু উচ্চ বিশাল পর্বতরাজি ও ধরণীর
কৃত্রিম বিভাগ;
সব কিছুরই এ সেবা করেছে। যারা আদিম অতীতে
গ্রানাইট পাথরের গায়ে সূর্য, চন্দ্র, তারা
জাহাজ, সমুদ্র তরঙ্গ এঁকেছে।

যে পথে গথ্ জাতির বিস্ফোরণ ঘটেছে,
যাযাবর আর পশুপালকেরা করেছে বিচরণ
তাদের সকলের সেবা করেছে সেই পথে।
সেবা করেছে কেল্ট জাতির আর দুর্ধর্ষ বাল্টিকের
জলদস্যুদের—
নিরীহ সম্ভ্রান্ত হাবসীদের সেবা করেছে
সকলের আগে।
বিলাস-বিহার আর সংগ্রামের উদ্দেশ্যে নির্মিত
নৌবহর নির্মাণে সাহায্য করেছে,
জলে, স্থলে সমস্ত মহান ব্যাপারই সেবা করেছে;
মধ্যযুগে, মধ্যযুগের আগেও
জীবিতদের শুধু নয়, এখনকার মত
মৃত ও জীবিত উভয়েরই সেবা করেছে।

(৮)

আমি ইয়োরোপের ঘাতককে দেখেছি;
মুখোস-পরা রক্ত বরণ, দীর্ঘ চরণ,
নগ্ন আর বলিষ্ঠ বাহু;
কুঠারের ওপর ঝুঁকে চিন্তা করছে।
কাকে তুমি হত্যা করলে য়ুরোপীয় জল্লাদ?
তোমার অঙ্গ এখনো রুধিরাক্ত।
আমি শহীদদের সূর্যাস্ত পরিষ্কার দেখেছি।
আমি দেখেছি ফাঁসির মঞ্চ থেকে নেমে আসা প্রেতদের।
আমি দেখেছি, তাদের যারা যে কোন দেশে
কোন মহৎ আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়েছে;

বীজ রইল। কোন না কোন দিন ফসল ফলবেই।
হে বিদেশী রাজন্যবর্গ, হে পুরোহিতবৃন্দ, মনে রেখ একদিন
ফসল ফলবেই।
আমি দেখেছি কুঠার থেকে রক্ত
একেবারে ধোয়া মোছা হয়ে গেছে,
বাঁট আর ফলা দুই ই পরিষ্কার।
য়ুরোপীয় অভিজাত বা রানীদের শোণিতে
তা আর রঞ্জিত নয়।
আমি দেখেছি ফাঁসির মঞ্চ জনহীন আর শান্ত,
তার ওপর আর কোন কুঠার নেই।
আমি দেখেছি আমার নবীনতম জাতির
বলিষ্ঠ সৌহার্দ্যের স্মারক-চিহ্ন।

(৯)

আমেরিকা আমি তোমার প্রেমের গর্ব করি না
যা আছে তাইতেই আমি সুখী।
কুঠার আন্দোলিত---
কঠিন অরণ্য তরল ধ্বনিময়।
তারা পড়ছে আর খাড়া হয়ে তৈরী করছে
কুঁড়ে ঘর, তাঁবু, অবতরণক্ষেত্র, লাঙল,
গাঁইতি, রেল, ছাদ, বিদ্যায়তন, অর্গান,
প্রদর্শনীর বাড়ী, পাঠাগার বারান্দা, জানালা,
পেন্সিল, গাড়ী, লাঠি, করাত, সিন্দুক,
নৌকা, কি নয়!

ম্যানহাট্টার ষ্টীমবোট আর সমস্ত
সমুদ্রগামী জাহাজ।

জাগছে আকৃতি দিকে দিকে !
—কুঠার-চালনার রূপ।
যারা কুঠার চালায় তাদের চেহারা,
যারা ব্যবহার করে, আর তাদের পরিবেশ;
কাঠ যারা কাটে আর নিয়ে যায়—
পেনবস্কট বা কেনেবেক অঞ্চলে।
ক্যালিফোর্ণিয়ার পর্বত, ছোট হ্রদ
কিংবা কলম্বিয়ার কেবিনের বাসিন্দা,
রাইও গ্রান্ডি বা গিলার তীরে যারা অধিবাসী।
প্রীতিতে যারা সমবেত সেই বিচিত্র চরিত্রগুলো, আর
তাদের স্ফূর্তি;

সেন্ট লরেন্সের ঘরে বসবাসকারী,
কিংবা উত্তর কানাডার,—
কিংবা ইয়োলোষ্টনের
তীর থেকে তীরে যারা ফেরে,
সীলমাছ শিকারী, তিমি শিকারী
মেরু সমুদ্রের নাবিক, বরফ কেটে
পথ তৈরী করেছে যে অভিযাত্রী।

জাগছে আকৃতি
কারখানা অস্ত্রাগার, বাজার, কামারশাল
দ্বিধা বিভক্ত রেলপথ;
সাঁকোর প্লীপার, বিশাল কাঠাম, খিলান
নৌবহর হ্রদ আর নদীগামী জাহাজ,
পোতাশ্রয়, শুষ্ক পোতাশ্রয় পূব আর
পশ্চিমের সাগরে;
আর জীবন্ত ওক গাছের পাটা, পাইনের তক্তা,
জাহাজের নিজস্ব গতিপথে—
কর্মীরা বাইরে আর ভেতরে কর্মব্যস্ত,
যন্ত্রপাতি চারিদিকে ছড়ান,
স্কোয়ার, গজ, লাইন প্রভৃতি।

(১০)

চেহারাগুলো দেখা যাচ্ছে—!
মাপা, রূপায়িত জোড়া লাগান,

মৃতদের জন্য কফিন
নব বিবাহিতার বিছানার উপযুক্ত খাট।
শিশুর দোলনা, মেঝের তক্তা,
নর্তকের পায়ের তলার মঞ্চ।
গৃহস্থ-বাড়ীর মেঝে,
মাতা পিতা ও সন্তানদের কলরব মুখরিত,
নব দম্পতির ঘরের ছাদ্।
সাধ্বী স্ত্রীর সানন্দ রন্ধন,
আর সচ্চরিত্র স্বামীর
তা উপভোগের তৃপ্তি।
চেহারা গুলো ফুটে উঠছে
বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়া, আর
আসামীর চেহারা।
মদের ভাটীখানার যুবক আর বুড়ো
মদ্যপায়ী হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে;
জুয়াড়ী তার দানবীর জয় আর পরাজয় নিয়ে,
শাস্তি-পাওয়া খুনীর সিঁড়ি আর তার
বীভৎস মুখ এবং শৃংখলিত হাত,
শেরিফ তার কর্মচারীদের নিয়ে;—
—নীরব আর বিবর্ণ চেহারার জনতা
এবং দড়ির দোলা;—
চেহারাগুলো ফুটে উঠ্ছে,......
বহু-আগমন আর নির্গমনের পথ ঐ দরজা ?
সেই দরজা যা ভাল আর মন্দ দু'রকম
সংবাদই আস্তে দেয়—
এই দরজা দিয়েই আত্মপ্রত্যয়
আর দম্ভ নিয়ে
বেরিয়েছিল সেই যুবক,
এই দরজা দিয়ে আবার সে প্রবেশ করেছে
দীর্ঘদিনের কলঙ্কিত প্রবাসের
ইতিহাস নিয়ে,
রুগ্ন ভেঙ্গে পড়া, কলঙ্কিত, নিরুপায়।

(১১)

আসল আকৃতিটা ফুটে উঠ্ছে:......
সামগ্রিক গণতন্ত্রের চেহারা; হাজার হাজার
বছরের পরিণতি;
আকার থেকে অন্য আকার;

প্রাণোজ্জ্বল সব বলিষ্ঠ নগর,
সমগ্র পৃথিবীর বন্ধু আর আশ্রয়দাতাদের অবয়ব,
পৃথিবীকে যারা শক্ত করে ধরেছে আর পৃথিবী
যাদের আঁকড়ে আছে ধরে।

কলম্বাসের প্রার্থনা

এক ঘা-খাওয়া ভেঙ্গে-পড়া বৃদ্ধ,
নিজের দেশ থেকে অনেক অনেক দূরে
বন্য তীবভূমিতে,
আছড়ে ফেলে দেওয়া হ'য়েছে তাকে,
বারটা দুঃসহ মাস; সমুদ্রে আর বিদ্রোহী
পাহাড়ে কাটিয়ে এসেছে সে।

অনেক লড়াইয়ে কঠিন আর শ্রান্ত,
মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমি
দ্বীপটার তীরে আমাব পথ খুঁজেছি,
আমার ভারী মনটাকে
উজাড় করে দেবার জন্য।
অনেক অনেক দুঃখ আমার।
সৌভাগ্যক্রমে আরও একদিন আমি হয়ত
নাও বাঁচতে পারি।
কিন্তু হে ভগবান যতক্ষণ না তোমার চরণে
আমি আব একবার প্রার্থনা করছি
ততক্ষণ আমি যেতে পারছি না,
ঘুমাতে পারছি না,
তৃষ্ণা নিবারণ করতে প।রছি না,
যতক্ষণ না তোমার সংগে সংযুক্ত হচ্ছি,
নিজেকে নিবেদন করছি তোমার কাছে
নিঃশ্বাসে তোমাকে পাচ্ছি,
তোমার মধ্যে ঘটছে আমার শুচিস্নান
আমার শান্তি নেই।

(২)

তুমি জান আমার সমস্ত বছরগুলো আমাব
জীবন,
আমার দীর্ঘ জন-বহুল কর্মজীবন,
শুধু অলস অর্চনায় কাটে নি।
তুমি জান আমার যৌবনের প্রার্থনা,

তুমি জান আমার বয়ঃপ্রাপ্তির স্বপ্নময়
গম্ভীর ধ্যানের কথা।
তুমি জান আরম্ভের আগে কিভাবে ভক্তিনম্রচিত্তে
তোমার কাছে সব কিছু দিয়েছিলাম।
তুমি জান বয়সকালে আমি সমস্ত প্রতিজ্ঞা
সংশোধন করেছিলাম,
আর কঠিন ভাবে পালন করেছিলাম সেগুলো,
তুমি জান একলহমার জন্যও
তোমার স্বর্গীয় আনন্দ বা তোমার প্রতি বিশ্বাস
আমি হারাই নি।
শৃংখলিত অপমানিত বন্দী অবস্থাতেও
আমি অবিচলিত, সব কিছু গ্রহণ করেছি
তোমার দান হিসাবে।
আমার সমস্ত সাম্রাজ্য তোমাতেই পরিপূর্ণ।
আমার খস্ড়া পরিকল্পনা সব কিছুই তোমার ভাবনা
দিয়ে পরিচালিত।
সমুদ্রে বা ডাঙায় সর্বত্র তোমার জন্যেই
আমার অভিযান।
আমার উদ্দেশ্য, আকাংখা আশা সব কিছুই
তোমার।
*আমি জানি সবকিছুই বাস্তবে তোমার কাছ
থেকেই এসেছে।*
প্রেরণা, অনমনীয় এষণা, অন্তর্নির্দেশ,
যা কথার চেয়েও জোরাল;
সেই স্বর্গীয় বাণী; যা প্রতিনিয়ত ঘুমের মধ্যে
ফিস্ ফিস্ করে আমার কানে কানে
উচ্চারিত হোত,
বা আমার পথ মসৃণ করে দিত।

আমায় দিয়ে আজ অবধি যে কাজ হোয়েছে
গোলার্ধে গোলার্ধে মিল, জানা আর
অজানার মিলন,
এর শেষ আমি জানিনা।
সে সমস্তই তোমার ওপর নির্ভরশীল,
বড় কিংবা ছোট আমি জানি না।
বিশাল ক্ষেত্র আর জমি, বর্বর সাম্যহীন
ছিন্নমূল মানুষের ক্রমবৃদ্ধি
আমি জানি তলোয়ার ওখানে
শস্য কাটবার অস্ত্রে রূপান্তরিত হবে।

আমি জানি য়ুরোপের প্রাণহীন ক্রুশ ওখানে
নব জীবন লাভ করবে।

এই নগ্ন বালুকাই আমার গীর্জাব প্রার্থনা
এখানে আমার আর এক প্রার্থনা।
ভগবান তুমিই আমার জীবন আলোকিত করেছ,
যে আলো সমস্ত বর্ণনা, চিহ্ন, ভাষার অতীত,
এই সমস্তের জন্যে, এই আমার শেষ কণ্ঠধ্বনিতে
তোমায় ধন্যবাদ জানাই ভগবান।
বৃদ্ধ, দরিদ্র, পক্ষাঘাত গ্রস্ত
আমি নতজানু হয়ে তোমায় ধন্যবাদ জানাই।
আমাব পথ শেষ হোয়ে এল,
মেঘেবা ঘিবে ধবেছে আমায়,
গতি আমাব রুদ্ধ, অনির্দিষ্ট পথ অবলুপ্ত।
আমাব জাহাজগুলো আমি তোমায
সমর্পণ কবলাম।
আমাব হাত আমাব পা, অবশ হ'যে গেছে,
আমাব মস্তিষ্ক ধোঁয়াটে আব অক্ষম;
পুরান সব তক্তা বিদীর্ণ হয়ে যাক্
আমি কিন্তু থাকব অটুট।
যতই ঢেউয়েবা আমায় ছিনিযে
নিতে চাক্ তোমাকেই আমি
আঁকড়ে থাকব।
তোমাকেই, কেবল তোমাকেই
আমি জানি।

(৩)

একি কোন ভবিষ্য-দ্রষ্টার চিন্তা আমাব
মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে ?
কিংবা আমি ভুল বকছি পাগ্‌লামি ক'বে।
আমাব অতীত আর বর্তমানের কোন কাজ
আমি আজ পর্যন্ত জানি না।
জীবনেব কিই বা জানি ? আমি ব্যক্তিটাই বা কে।
অস্পষ্ট চিরপরিবর্তনশীল অনুমান
আমার চারধারে ছড়িয়ে আছে,
নবতর মহত্তর পৃথিবীর বলিষ্ঠ জন্ম-যন্ত্রণা,
আমায় বিদ্রূপ করছে, আমায় দিশাহারা করে দিচ্ছে
এই সব জিনিস আমি হঠাৎ দেখছি, এর অর্থ কি ?

যেন এক দৈবক্রিয়া কোন ভাগবতী মহিমা
আমার চোখের ঢাকনা খুলে দিচ্ছে;
ছায়াময় বিরাট আকার সমূহ বাতাস আর
আকাশের মধ্যে হাসছে:
আর দূরে সমুদ্রে তরঙ্গ অগনন,
জাহাজ ভাসছে
আর নব নব কণ্ঠে বন্দনা গীতি আমায়
প্রণাম জানাচ্ছে।

শুনেছি অ্যামেরিকার গান

অ্যামেরিকা গাইছে, আমি শুনতে পাই
শুনি বিচিত্র তার সংগীত।
গাইছে মিস্ত্রিরা নিজের, নিজের গান
জোরাল উল্লাস তাদের কণ্ঠে।
গাইছে ছুতোর তার কাঠের গুঁড়ি কি তক্তা
মাপতে মাপতে,
রাজমিস্ত্রি গাইছে কাজের আগে বা পরে,
মাঝির গান তার নৌকোর সম্পত্তি নিয়ে
মাল্লা গাইছে স্টীমারের পাটাতনে।
মুচিরা গাইছে বসে তার কাছে,
টুপিওয়ালা তার দোকানে দাঁড়িয়ে,
কাঠুরে আর লাংগল কাঁধে চাষী,
গাইছে সকাল দুপুর আর সন্ধ্যায়,
কাজের সুরুতে বিশ্রামের ফাঁকে আর কাজের শেষে।
মায়ের মধুর গান; গান তরুণী বধূর,
সেলাই কি ধোলাইয়ের কাজে মেয়েদের গান।
যার যার নিজস্ব সব গান সারা দিন,
তারপর রাত্রে মিশুক প্রাণবন্ত সব তরুণ-তরুণী,
গাইছে মুক্ত কণ্ঠে বলিষ্ঠ তাদের গান।

তৃণ প্রান্তর

প্রেইরীর প্রান্তরের ঘাসের বেড়া
আমি নিঃশ্বাসে পাচ্ছি তার বিশেষ গন্ধ—
আমি দাবী করি তার সংগে আধ্যাত্মিক সাযুজ্য।
দাবী করি প্রচুর আর ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব মানুষের সংগে,
জাগুক মহাপ্রান্তরের রুক্ষ, তাজা রোদে উজ্জ্বল

সব প্রাণ-ফলক—
কথা, কাজ আর সত্ত্বার তৃণ-শীর্ষ ঊর্ধ্বে আন্দোলিত হোক;
যারা নিজস্ব জয়ের স্বাধীনতা আর
গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে চলে,
অনুকরণ করে না, অনুসরণ করায়;
যারা চির কালেব দুঃসাহসী;—
সেই মধুর আর নিষ্কলঙ্ক দেহ মানুষ,
যার ভ্রুক্ষেপহীন ভাবে রাষ্ট্রপতি আর
প্রদেশপালদের মুখের ওপর তাকিয়ে
বলতে পারে—তুমি কে বটে হে?
সেই সবল চিরকালের অশান্ত দুর্দমনীয়
ধরণীব অর্ন্তকামনাজাত মানুষ হোক
যারা আমেরিকার হৃদয় জুড়ে আছে।

বাজুক দামামা!

দামামা বাজুক! বাজুক! বাজাও বাজাও ভেঁপু
জানালা দিয়ে, দরজা দিয়ে গম্ভীব গীর্জার মধ্যে
আর বিদ্যায়তনে যেখানে পন্ডিতেবা পড়ছে
ফেটে পড়ুক ভৈরব হুংকার, নিষ্ঠুর সৈন্যদলেব মত;
ছিন্ন ভিন্ন করে দিক জনতা।
নব বিবাহিতকে নিশ্চিন্তে থাকতে দিও না
স্ত্রীর সংগসুখ থেকে সে এখন বঞ্চিত হোক;
ক্ষান্ত কর শান্তিপ্রিয় চাষীকে শান্তিতে চাষ করতে,
আর ফসল তুলতে ঘরে;
হে দামামা ভয়াল ভয়ংকর শব্দে বাজো;
তীক্ষ্ণ তীব্র সুরে বাজুক ভেঁপুরা।
বাজুক, বাজুক, দামামা! বাজাও, বাজাও, ভেঁপু!
শহরের জনতার উপর—রাজবর্ত্মের শকট-শব্দ ডুবিয়ে —।
ঘরে ঘরে কি বিছানা তৈরী হয়েছে —শোবার?
কেউ ঘুমোব না রাত্রেতে বিছানায়—
দিনেতে কেউ লাভ করবে না বেচা কেনায়
দালাল বা ফাটকা বাজারে এরা কি
কাজ চালিয়েই যাবে?
বাক্য-বাগীশরা কথাই যাবে বলে?
গাইয়েরা চেষ্টা চালাবে কালোয়াতীর?
উকিল বিচারকের সামনে সওয়াল করবে মামলার?
তবে আরো দ্রুত আরো গম্ভীর হোক দামামার শব্দ
ভেঁপুরা বাজুক আরো বন্য সুরে।

বাজুক! বাজুক! দামামা; বাজাও! বাজাও—ভেঁপু
কোন হিসাব নিকাশ নয়, কোন রকম আপত্তিতেই
থামা চলবে না;
ভীরুদের কথা ভাববার দরকার নেই,
দরকার নেই কাঁদুনে আর ভিক্ষুকদের
কথা চিন্তা করার,
বুড়োদের তরুণদের খোঁজবার কথা ভেবো না
মায়েদের আপত্তি আর শিশুর কণ্ঠস্বর
যেন শোনা না যায়—
কাঠের মেঝেগুলো এমন ভাবে কাঁপাও,
যাতে শ্মশান যাত্রী মড়ারাও নড়ে ওঠে।
হে দামামা এমনি প্রচন্ড শব্দে বেজে ওঠো
ভেঁপু বাজুক এই তীক্ষ্ণ তীব্র সুরে।

হে অধিনায়ক!

হে অধিনায়ক! হে আমার অধিনেতা!
আমাদের ভয়াল যাত্রা শেষ হয়েছে।
সব রকম ঝড় ঝাপটা সহ্য করেছে আমাদের জাহাজ
আমাদের আকাঙ্খিত ফল আমরা পেয়েছি;
বন্দর দূরে নয় আর। বাইরে শব্দ শুনছি;
জনতা উচ্ছ্বসিত;—
স্থির হালের দিকে চোখ মেলে,
চেয়ে দেখেছি গম্ভীর দুঃসাহসী জাহাজ খানা,
কিন্তু হে হৃদয়! হৃদয়! হৃদয়!
সেই ঝুঁজিয়ে পড়া লাল রক্ত!
পাটাতনে পড়ে রয়েছে আমার অধিনেতা,
হিম শীতল আর মৃত।
হে অধিনায়ক! হে আমার অধিনেতা!
ওঠো ওঠো ঘন্টা বাজছে শোন,
তোমার জন্যে নিশানা উড়ছে, ভেঁপু বাজছে,
ফুলের মালা আর রেশমে মোড়া পুষ্পগুচ্ছ,
তীরে তীরে জনতার ভীড়—
তোমায় ডাকছে উচ্ছ্বসিত জনতা,
তাদের উদ্‌গ্রীব মুখ ঊর্ধ্বে তোলা,
হে অধিনায়ক হে প্রিয় জনক।
তোমার মাথার তলায় বাহুটি তোমার,
পাটাতনে স্বপ্নমগ্ন তুমি,
তুমি মৃত, তুমি হিম-শীতল,

আমাব অধিনায়ক উত্তর দেয় না, তাব ঠোঁট বিবর্ণ আব নীবব
জনক আমাব বাহুস্পর্শ বুঝতে পাবে না,
তাব না আছে এষণা বা স্পন্দন,
জাহাজ বন্দবে নিবাপদ,—যাত্রাশেষ।
ভযংকব পাড়ি শেষ কবে বিজয়ী জাহাজ ফিবে এসেছে
তাব কাম্য ফল নিযে।
তীবভূমি আনন্দে উচ্ছাবিত হও।
ঘন্টাবা বেজে ওঠো,
আমি কিন্তু বিষাদ পীড়িত মনে পাটাতনে পাইচাবী কবছি
যেখানে আমাব অধিনাযক পড়ে আছে
মৃত আব হিম শীতল।

এই সত্তা, এই জীবন

হায়! আমি! হায়! জীবনঃ এই প্রশ্নবা বাব বাব
ঘুবে আসে,
অবিশ্বাসীদেব অন্তহীন বাহিনী আব মূর্খে পবিপূর্ণ
শহবগুলোব মধ্যে,—
আমি সব সময় নিজেকে ভর্ৎসনা কবি,(কাবণ
আমাব চেযে মূর্খ আব অবিশ্বাসী আব কেই বা আছে ?)
সেই নযন যা বৃথাই আলোব আশায় ঘুবে মবছে,
সেই সব তুচ্ছ জিনিষ, আব চিবকেলে লড়াই,
আব এদেব তুচ্ছ ফলাফল, আব চাবপাশেব
নোংবা জনতাব ভীড়—
বিশ্রামেব ফাঁকা আব প্রযোজনীয বছবগুলো—
আব বাকি সব যা আমাব সঙ্গে জড়ানো।
এব মধ্যে বাববাব সেই করুণ প্রশ্নই
ফিবে আসে হায় আমি! হায় জীবন!
এব মধ্যে কিই বা ভালো আছে!
উত্তব

তুমি এইখানে আছো, জীবন বযেছে তাব
পবিপূর্ণ সত্ত্বা নিযে,—
জোবালো খেলা চলছে জগৎজোড়া আব
তুমি সেখানে একখানা কবিতা
উপহাব দিতে পাবো।

দর্শন সার

এইবার মহাশয়,
আপনার স্মরণে আর মনে থাকবার মত একটা কথা বলি;
সমস্ত দর্শনের সার আর শেষ কথা।
(ছাত্র আর অধ্যাপকদেরও বলি,
তাদের বিপুল পাঠক্রমের শেষে।)
তাদের প্রাচীন আর নবীন গ্রীক আর জার্মান দর্শন পদ্ধতি
পড়ার পর,
ক্যান্ট পড়ে আর হজম করে, ফিস্টে, শ্যেলিং আর হেগেল
তারপর—
প্লেটোর গরিমা, সক্রেটিস প্লেটোর থেকেও বড়।
আর সক্রেটিস যা খুঁজেছিলেন আর বলেছিলেন
তার থেকেও মহান ভগবান যিশুখৃষ্ট সম্পর্কে
দীর্ঘকাল পড়াশোনার পর;—
এই সব গ্রীক আর জার্মান দর্শন ধারার অবশিষ্টাংশ
যা আজ আমি দেখছি—
দেখেছি সমস্ত দর্শন আর খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের
মূল কথা—
আমি বুঝেছি সক্রেটিস আর ভগবান যিশুর
মর্মবাণী হোলঃ
মানুষের তার সঙ্গীর প্রতি ভালবাসা;
বন্ধুর প্রতি বন্ধুর আকর্ষণ;
একনিষ্ঠ পতি পত্নী আর জনক জননী
ও শিশুদের প্রেম,
শহরের প্রতি শহরের আর দেশে দেশে আকর্ষণ।

একটি মাকড়সা

ধৈর্যশীল নিঃশব্দ এক মাকড়সা,
আমি লক্ষ্য করছিলাম এক উচ্চ তীরভূমির
ওপর থেকে,
দেখলাম কেমন করে চতুর্দিকের বিশাল শূন্য জগৎ
আবিস্কারের অভিযানে
মাকড়সা নিজের ভিতর থেকে তন্তুর পর
তন্তু বার করে চলেছে অবিরাম অক্লান্ত।
আর তুমি, হে আমার আত্মা,
দাঁড়িয়ে রয়েছো বন্দী বিচ্ছিন্ন হয়ে,
অনন্ত কালসমুদ্রে,—

বিরামহীন গান গেয়ে চলেছো;
দুঃসাহস প্রকাশ করেছো; সেই সব অঞ্চল খুঁজে
বেড়াচ্ছো সংযোগের জন্যে,
যে পর্যন্ত না তোমার প্রয়োজনীয় সাঁকোটা
তৈরী হয়,
যে পর্যন্ত না তন্তুটা কোথাও জড়িয়ে যাচ্ছে
হে আমার আত্মা।

বিদায়

আমার একটা কথা বলার ছিল,
কিন্তু এখনও সময় হয়নি—
যে কোন লোকের সব চেয়ে ভালো কথা বলার সময়;
যতক্ষণ না বোঝবার মত সময় আসছে,
তাব জন্যে শেষ অবধি অপেক্ষা করব আমি।

মাটি চষছে কিষাণ

আমি দেখলাম চাষীকে জমি চষতে,
দেখলাম বীজ বপনকারী বীজ বুনছে;
অথবা কিষাণরা কেটে ফেলছে শস্য—
আমি আরও দেখলাম জীবন আর মৃত্যু
তোমার উপমা-রা—
(জীবন, জীবন হোলো চাষ করা; আর মৃত্যু হোলো
ফসল কাটা।)

দেশান্তরী

বাজ্যসমূহের মধ্যে দিয়ে আমরা যাত্রা সুরু কবলাম,
শুধু প্রদেশের মধ্যে দিয়েই বা কেন! সমস্ত পৃথিবীতে
আমাদের যাত্রা,
এই সব গানের উদ্দীপনায় এখন থেকে।—
আমরা সকলের কাছেই শিখতে উৎসুক,
সকলেই শেখাবে,
সকলেই আমাদের আপনার।
আমরা দেখেছি ঋতুদের,
তাদের যা দেওয়ার তাই দিয়ে তারা চলে যাচ্ছে।

নরনারীরাই বা কেন দেবে না
তাদের যা আছে ঋতুদের মত!
আমরা প্রত্যেক নগর আর জনপদে কিছুক্ষণ থাকি,
আমবা কানাডা, উত্তর পূর্বাঞ্চল,
পার হয়ে চলেছি—।
প্রত্যেক বাজ্যেব সঙ্গে আমাদের সমানে আলাপ,
আমবা বিচার কবি নিজেদের আর আহ্বান করি
নর-নাবীদেব তা শুনতে।
আমরা নিজেদের বলি:—
মনে বেখো ভয় পেয়ো না;
সরল হও, দেহ আব আত্মাকে কবো ঘোষিত।
কিছুক্ষণেব জন্য থেকে চলে যাও,
প্রাচুর্যে পূর্ণ হও, সৎ হও,
আব গভীর হোক তোমার আকর্ষণ।
তাই ফিবে পাবে যা ছড়াবে ঋতুদের মত;
ঋতুদেব মতই হয়ত হবে তা পর্যাপ্ত।—

আমি অচঞ্চল

আমি অচঞ্চল, প্রকৃতিব বুকে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে,
সব কিছুর কর্তা বা কর্ত্রী আমি—
যা যুক্তিহীন তাব মধ্যে আমি আত্ম সমাহিত,
আমার পেশাব কাছে দারিদ্র্য কি দুর্নাম,
দুর্বলতা কি দুরাচাব,—
এ সবেরই দাম যা ভেবেছিলাম,
তার থেকে অনেক কম।
মেক্সিকোর সমুদ্রে ম্যানহাট্টায়, টেনেসীতে,
সুদূর উত্তরে বা দেশেব অভ্যন্তরে।
নদীর মানুষ অথবা অরণ্যচারী,
এখানে বা সাগরতীরে,
কিংবা কানাডার কোন খাদের ধারের কিষাণ,
যেখানেই জীবন কাটুক,
শুধু যেন পারি সমস্ত সমস্যার জন্যে
প্রস্তুত আর আত্মস্থ থাকতে।
রাত্রি আর ঝটিকা, বিরূপ দুর্ঘটনা আর
আঘাত সব কিছুর সঙ্গে
যুঝতে পারি যেন, যেমন পারে
গাছেরা কি পশুরা।

ভারত পথিক

বর্তমানের গান গাই
গান গাই এ যুগের কীর্তির—
—যান্ত্রিকদের বলিষ্ঠ সব সৃষ্টির
আধুনিক সেই সপ্তাশ্চর্যের, (অতীতের স্থূল
সপ্ত বিস্ময় যার কাছে ম্লান)
প্রাচীন জগতে প্রাচ্যের সুয়েজ খাল
নতুন জগতের এক প্রান্ত থেকে
অপর প্রান্ত জোড়া রেলের লাইন,
সাগর তলে বিস্তৃত মুখর ধাতব তার।
—তবু হে হৃদয় তোমার সঙ্গে অনুরণিত
আদি ও অশেষ আমার উচ্ছ্বাস
—প্রাচীন! পুরাতন! অতীত!
অতীত—অতল অন্ধকার
জীবনোদ্বেল সাগর-পরিখা—ঘুম আর ছায়া!
অতীত—অতীতের অসীম মহিমা।
এ বর্তমানে অতীতের আত্মপ্রসারণ,
(গঠিত নিক্ষিপ্ত আয়ুধ
যেমন তার সীমা লঙ্ঘন করেও চলতে থাকে।
বর্তমানে তেমনি অতীতের দ্বারাই
সৃষ্ট ও প্রেরিত)
হে হৃদয়, চলো ভারতে;
উপলব্ধি খোঁজো এসিয়ার পুরাণ কথার,
আদিম সব উপাখ্যানের।
বিশ্বের উদ্ধত সব সত্য শুধু নয়,
শুধু নয় আধুনিক বিজ্ঞানের আবিস্কার
প্রাচীন পুরাণ আর উপকথাও শুনব
—এসিয়ার ও আফ্রিকার,
—আত্মার দূরান্ত আলোকচ্ছটা।
মুক্ত অবাধ স্বপ্ন,
অতলস্পর্শী জীবন-বেদ ও কিংবদন্তী
কবিদের দুঃসাহসিক জল্পনা—
প্রাচীন সব ধর্ম পথ
প্রভাতসূর্যস্নাত কমলের চেয়েও সুন্দর
সব দেবায়তন,
স্বর্গাভিমুখী সেই সব কাহিনী
আমাদের জ্ঞানের সীমার শাসন
অবজ্ঞায় যা এড়িয়ে যায়।

আকাশমুখী উজ্জ্বল সব মিনার
গোলাপের মত রক্তিম
সুবর্ণ-মণ্ডিত!
মরলোকের স্বপ্ন দিয়ে গড়া
অমর সব কাহিনীর সৌধ,
তাদেরও আমি আহ্বান জানাই
তাদেরও গান গাই আনন্দে।

ভারত পথের যাত্রী!
বিধাতার সেই আদিম সংকল্প
কি বুঝতে পারনা মন?
সমস্ত পৃথিবী অধিকার করতে হবে, জুড়ে দিতে হবে
সম্পর্ক-জালে,
জাতির সঙ্গে জাতির প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর
চাই উদ্বাহ বন্ধন,
সমুদ্র অতিক্রম করে দূরকে করতে হবে নিকট,
দৃঢ় সংবদ্ধ করতে হবে সমস্ত দেশ।

নতুন আরাধনার গান আমি গাই,
তোমাদের গান হে নাবিক হে পর্যটিক,
হে যান্ত্রিক, হে স্থপতি, তোমাদেরও।
বাণিজ্য কি পরিবহনের জন্যে নয়,
তোমাদের গান গাই বিধাতার নামে আর তোমার
জন্যে হে হৃদয়!

ভারত-পথ-যাত্রী!
কত নাবিকের কঠিন সাধনা, কতজনের মৃত্যুর কাহিনী,
আমার মনের ওপর ভেসে আসছে, যাচ্ছে ছড়িয়ে
অসীম আকাশে ছোট বড় মেঘখণ্ডের মত।

সমস্ত ইতিহাস জুড়ে উৎরাই-এর পথে
ছোট নদীর মত বেগবান, কখনো ফল্গুধারায় কখনো
প্রকাশ্যে
অবিরাম এক ভাবনা, বিচিত্র এক মিছিল—হে হৃদয়
তোমার জন্যেই তারা জাগছে।
আবার সেই সব পরিকল্পনা, সেই সব সাগর-পাড়ি
আর অভিযান:

আবার ভাস্কো ডি গামার যাত্রা
আবার সেই সব জ্ঞান-সঞ্চয় সেই দিগ্‌দর্শন যন্ত্র।
আবিস্কৃত নূতন দেশ, আর জাতির জন্ম

—তোমারও জন্ম আমেরিকা

বিরাট এক উদ্দেশ্য নিয়ে
মানুষের দীর্ঘ পরীক্ষা সমাপ্ত
সম্পূর্ণ পৃথিবীর বৃত্ত।
মহাকাশে ভাসমান হে বিশাল গোলক
দৃশ্যমান সৌন্দর্যে ও-শক্তিতে আচ্ছাদিত।

দিনের আলো ও অধ্যাত্ম -অন্ধকারের পালাবদল
সূর্য চন্দ্র তারাব অনির্বচনীয় সমারোহ ঊর্ধ্বাকাশে
আব নিচে তৃণ আর জলের ধারা
প্রাণীজগৎ পর্বতমালা আর তরু
দুর্জ্ঞেয় তার উদ্দেশ্য, গূঢ় অমোঘ তার গতি,
আমার ধারণায় এতদিনে বুঝি তাব হদিস মেলে।

এসিয়ার উপবন থেকে অবতীর্ণ ও বিস্তৃত
দেখা দিল আদম ও ইভ, তাদের অসংখ্য সন্তান সন্ততি
ব্যাকুল উৎসুক, অস্থির আগ্রহে ভ্রাম্যমান
জিজ্ঞাসু, ব্যর্থ, উদ্বেগব্যাকুল চির অতৃপ্ত,
—কণ্ঠে যাদের অবিরাম এক ধ্বনি—
'হে অতৃপ্ত হৃদয়, কেন ?'
'হে পরিহাস-লাঞ্ছিত জীবন, কোথায় ?'

ভারত পথ যাত্রী।
মানুষ প্রথম যেখানে ভূমিষ্ঠ সেই
সুদূর ককেশাসের শীতল বায়ু স্রোত
ইউফ্রেটিস-এর প্রবাহ,
পুনর্দীপ্ত অতীত।

হে হৃদয়, দেখো সেই বিগত দিন
আবার তোমার সামনে মেলা।
সব চেয়ে জনাকীর্ণ ধনাঢ্যতম সব পৃথিবীর প্রাচীন দেশ
সিন্ধু আর গঙ্গার অসংখ্য ধারা
(আমেরিকার তীরে আমি ভ্রাম্যমান
আমার চোখে সব কিছুই আজ প্রতিভাত)
সমরাভিযাত্রী সেকেন্দারের আকস্মিক মৃত্যু
একদিকে চীনা আর একদিকে পারস্য ও আরব,
দক্ষিণের সেই বিশাল সমুদ্র, —বঙ্গোপসাগর
প্রবহমান সাহিত্য, মহান সব মাহাকাব্য, ধর্মান্দোলন,
জাতির পাঁতি,
আদি দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্ম, অনন্ত অতীতে,
নবীন করুণা কোমল বুদ্ধ

কেন্দ্রীয় ও দাক্ষিণাত্যের সব সাম্রাজ্য
তাদের সম্পদ ও অধীশ্বর,
তৈমুর লঙের সংগ্রাম, আওরঙ্গজেবের শাসনকাল
বণিক, শাসক, পর্যটক,
ভিনিস আর বৈজন্তাইনের আগন্তুক পর্তুগীজ ও আরব
বিখ্যাত সব পর্যটক, —মার্কোপোলো মূর বাতুতা।
যে সব সংশয়ের চাই নিরসন,
যে অজানা মানচিত্রের ফাঁক দিতে হবে ভরিয়ে
মানুষের চির-অশান্ত চরণ
চির অক্লান্ত বাহু
দুর্দ্বেরা আহ্বানে সাড়া না দিয়ে যা পারেনা,
সেই আমার হৃদয়।
মধ্যযুগের নাবিক পর্যটকদের ছবি
আমার চোখের সামনে জাগছে।
১৪৯২-এর জগৎ
নব-উদ্দীপ্ত উদ্যম
বসন্তের গাছের প্রাণরসের মত
উদ্ভাসিত এক প্রেরণা মানব-সমাজে,
বিলীয়মান ক্ষাত্রযুগের সূর্যাস্ত-সমারোহ।
হে হৃদয় চলো
সেই আদিম মননে
শুধু দেশে দেশে কি সাগরে নয়।
সেই প্রথম স্বচ্ছ সজীবতায়
জীবন বেদের মুকুল যেখানে জেগেছে
সেই খানে, প্রাণের তারুণ্যে ও পুষ্পোদ্গমে।

দেরী আর সয় না
জাহাজ ছাড়ো, হে হৃদয়
সানন্দে পাড়ি দাও অসীম সমুদ্রে
নির্ভয়ে অজানা সব তীরে
উল্লাসের তরঙ্গে পাল তুলে।

হে পরম
নামহীন সত্তা ও প্রাণবায়ু,
আলোকের আলো হে সৃষ্টি-কেন্দ্র
কত বিশ্ব চলেছ ছড়িয়ে।

সত্য কল্যাণ ও প্রেমের
হে মহামূল,
হে অনন্ত ভান্ডার
অনুরাগের উৎস, নীতির অধ্যাত্ম-চেতনার প্রস্রবন-মুখ,

তুমিই ধ্বনি সূর্য তারা নীহারিকার প্রাণ-প্রেরণা
চক্রাকারে যারা অসীম অনন্ত দেশে কালে
নিরাপদ শৃংখলায় ভ্রাম্যমান,
আমার সব কিছু চিন্তা, প্রত্যেকটি নিশ্বাস ও বাণী
সেই মহা বিশ্বেই কি পৌঁছোয় না!

যাত্রা ভারতকেও অতিক্রম করে,
এই সুদূর যাত্রার শক্তি কি আছে পাখার পালকে,
এই পাড়ি-কি সত্যি দিতে চাও হে হৃদয়?
লীলা তোমার কি এই মহাতরঙ্গে?
সংস্কৃত ও বেদ কি তোমার প্রাণে ধ্বনিত
তাহলে মুক্ত করো বেগ!

তোমাদের সুদূর তীরের যাত্রী
—প্রাচীন প্রচণ্ড রহস্য
কঠিন সেই প্রাণান্তকর সমস্যার সমাধান
কত কংকাল ছড়িয়ে আছে
সেই যাত্রা পথে।

ভারতকে ছাড়িয়েও চলো অভিযানে!
হে আকাশ ও মৃত্তিকার গূঢ় সত্য,
হে সমুদ্র তরংগ, বাঁকা নদী কুটিল খাঁড়ি
অরণ্য প্রান্তর, বলিষ্ঠ পর্বত আমার দেশের
বনভূমি, আর ধূসর শিলা!

হে রক্তিম সূর্যোদয়,
হে মেঘ হে বৃষ্টি ও তুষার
হে দিন রাত্রি——
তোমাদের পানেই আমার যাত্রা,
হে সূর্য চন্দ্র তারা, সিরিয়াস ও বৃহস্পতি
যাত্রা তোমাদেরও অভিমুখে।

যাত্রার তর সয় না,
শিরায় শোণিত আমার চঞ্চল
নোঙর তোল এখুনি হে হৃদয়
কাটো তীরের বন্ধন
তোলো সমস্ত পাল।
এই মাটিতে গাছের মত
কত দীর্ঘকাল থাকব দাঁড়িয়ে,
পশুর মত শুধু ক্ষুধা মিটিয়ে!
অনেক গ্লানির দিন কি কাটেনি?
শুধু পুঁথি পড়ে মনকে উদ্‌ভ্রান্ত অন্ধ করিনি কি বহুদিন?

পাল তোলো,
সমুদ্র যেখানে গভীর
চলো সেই অতলতায়
বেহিসাবী বেপরোয়া হে হৃদয়
তোমার সঙ্গে আমিও মাতি
আবিষ্কারের নেশায়।
কারণ কোন নাবিক
যেখানে যেতে সাহস করেনি
সেই তীর আমাদের লক্ষ্য
আমাদের জাহাজ আর নিজেদের আমাদের সর্বস্ব
আমরা জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত।

হে নির্ভীক হৃদয় আমার
চলো দূর থেকে আরো দূরে
দুঃসাহসী আনন্দ কিন্তু নিরাপদ
সব সমুদ্রই ত জীবন-বিধাতার,
দূরে আরো দূরে দাও পাড়ি।

জ্যোতিষী পন্ডিত বলেন

যখন আমি পন্ডিত জ্যোতিষীর কথা শুনলাম,
যখন প্রমাণ আর অংক গুলো সার বেঁধে দাঁড়াল
আমার সামনে,
যখন আমায় নক্সা আর রেখাচিত্র
দেখান হোল,
যোগ করতে, ভাগ করতে আর মাপতে;
যখন আমি শুনলাম সভাগৃহে বসে,
জ্যোতির্বিদদের বক্তৃতার উচ্চ প্রশংসা,
কত তাড়াতাড়িই না আমি
ক্লান্ত আর বিরক্ত হয়ে পড়লাম।
যতক্ষণ না উঠে এসে বেড়াতে লাগলাম
রাত্রির রহস্যময় ভেজা বাতাসে,
আর থেকে থেকে নীরব বিস্ময়ের সঙ্গে
দেখতে লাগলাম নক্ষত্রদের।

গণতান্ত্রিক

এস, এই মহাদেশ আমি অবিভাজ্য করে গড়ে তুলব,
সূর্যালোকিত পৃথিবীতে

গড়ে তুলব অভূতপূর্ব সর্বোত্তম জাতি,
সৃষ্টি করব দেবভূমি,
সৌহার্দ্যে আর বন্ধুদের আজীবন ভালবাসায়।
আমেরিকার নদীর তীবে তীরে গাছের সারির মত ঘন করে,
রোপণ করব সৌহার্দ্যের চারা।
বিশাল হ্রদগুলোর ধারে ধারে, প্রান্তরের সমস্ত প্রান্তে
আমি তৈরী করব অবিভাজ্য সব শহর।
তাদের প্রসারিত বাহু পরস্পরের গলা জড়িয়ে থাকবে
সাথীদের প্রেমে, বন্ধুদের বলিষ্ঠ ভালবাসায়।
এসব সম্ভব হবে আমার দ্বারা তোমার জন্যে,
হে আমার প্রিয়তমা, হে গণতন্ত্র তোমার সেবার জন্য,
তোমাব জন্য, তোমার জন্য, এ গান আমি লিখছি।

নালিশ

আমি শুনেছি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ,
আমি নাকি সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলে দিতে চাই,
কিন্তু আসলে কোন প্রতিষ্ঠানের
স্বপক্ষেও নই আবার বিপক্ষেও নই আমি।
(তাদের সঙ্গে আমার মিল কোথায় ?
তাদের ভেঙে ফেলেই বা কি হবে আমার ?)
ম্যানহাট্টা আর রাজ্যসমূহের প্রত্যেক শহরে,
কর্ষণক্ষেত্র আর বনে এবং চলমান ছোট বড় সব জলযানে,
ইমারত, নিয়মাবলী, অছি, বা কোন যুক্তিতর্ক খাড়া না করে
আমি গড়ে তুলতে চাই সাথীদের পরস্পরের
গভীর ভালবাসার প্রতিষ্ঠান।

অনন্ত দোলা

অন্তহীন দোদুল দোলায় দুলছে যে দোলনা,
তার থেকে বেরিয়ে—
পাখীদের সঙ্গীতময় কল-কাকলীর
টানা পোড়েন থেকে—
বন্ধ্যা বালি আর মাঠ ছাড়িয়ে,
সেখানে শিশু বিছানা ছেড়ে,
খালি মাথায় আর খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায়,
গরিমা বর্ষণ থেকে নেমে,
বাঁকা চোরা জীবন্তপ্রায় ছায়ার রহস্যময় খেলারও ঊর্ধ্বে

কালজাম আর বুনো গোলাপের ঝোপ ছাড়িয়ে
যে পাখীরা গান গেয়েছিল তাদের স্মৃতি থেকে,
তোমার চপল উত্থান আর পতনের যে কাহিনী
আমি শুনেছি,
দুঃখী ভাই! তার স্মৃতি থেকে—
যেন অশ্রুসিক্ত বিলম্বিত হলুদ রঙের সপ্তমীর চাঁদ,—
তার তলা থেকে,
কুয়াশার মধ্যে সেই ব্যাকুল হওয়া আর ভালবাসার সুর,
আমার হৃদয়ের হাজার হাজার প্রতিধ্বনি
যা' কখনো থামবে না;
তখনকার সেই হাজার হাজার কথা,
যে কোন কথার থেকে বলিষ্ঠ আর মধুর সেই কথা।
সেই রকম যে কোন দৃশ্য আবার নতুন করে দেখা,
পশুর পালের মত শব্দ করা, ওঠা আর পার হওয়া,
এইখানে জন্ম; বাকি সব কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুত,
পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ, কিন্তু এই চোখের জলে
আবার বালক হয়ে যাচ্ছে সে,
এই সমস্ত ছাড়িয়ে আমি নিজেকে বালির মধ্যে বিছিয়ে দিচ্ছি।
সম্মুখীন হচ্ছি সমুদ্র-তরঙ্গের—
বেদনা আর আনন্দের আমি নায়ক—
বর্তমান আর ভবিষ্যতের আমি মিলন-রাখী,
সমস্ত ইশারাই আমি গ্রহণ করছি ব্যবহারের জন্য,
কিন্তু তাদের আওতার বাইরে
লাফিয়ে চলে যাচ্ছি তাড়াতাড়ি;
এক পূর্ব-স্মৃতির গান আমি গাইছি।
পোমানকে একবার—
যখন বাতাসে লাইলাক ফুলের গন্ধ;
মাঠে নবীন ঘাস—
সমুদ্রের তীরে কোন বুনো গোলাপের ঝোপে
আকাশ-বিহারী দুই অতিথি;
দুইজনই এক সঙ্গে;
তাদের বাসা আর চারটে ডিম,
হাল্কা সবুজের ওপর বাদামী ছিট।
প্রত্যেক দিন পুরুষ পাখীটা হাতের কাছে ঘোরে ফেরে।
বসে থাকে বাসায়।
আমি এক উৎসুক বালক
কখনো যেতাম না তাদের কাছে
বিরক্ত করতাম না কখনো তাদের,
সতর্কভাবে দেখতাম, অভিভূত হতাম,

অনুকরণ করতাম তাদের চাল-চলন।
জ্বলে ওঠো! জ্বলে ওঠো! জ্বলে ওঠো!
মহান সূর্য! তোমার উত্তাপ ছড়িয়ে যাও!
যখন তোমাব তাপে তপ্ত হই,
তখন আমরা দু'জন এক সঙ্গে থাকি।
আমরা দু'জন একসঙ্গে—
বাতাস দক্ষিণেই বহুক কি উত্তরেই,
শুভ্রদিন আসুক কিংবা অন্ধকার রাত্রি,
ব্যড়ী! কিংবা বাড়ী ছেড়ে নদী আর পাহাড়গুলোতে
সময়ের খেয়াল না করে সব সময় গান গাচ্ছি
যতক্ষণ আমরা এক সঙ্গে আছি।
তারপর আচমকা—
পুরুষ পাখীটার অজান্তে হয়ত মারা গেল পক্ষিণী।
একদিন দুপুরে পক্ষিণী আর বসল না বাসায়
মুখ নীচু করে,
বিকেলেও নয়, তাব পরদিনও নয়।
কোনদিন আর তাকে দেখা গেল না।
তাবপর সমস্ত গ্রীষ্মে সমুদ্র গর্জন,
এবং বাত্রে পূর্ণিমার শান্ত পরিবেশে,
সমুদ্রের কর্কশ উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে
কিংবা দিনের বেলা বুনো গোলাপের ঝোপ থেকে ঝোপে,
থেকে থেকে আমি দেখছিলাম,
আর শুনছিলাম অবশিষ্ট সেই
পুরুষ পাখীটার চেহারা আর কণ্ঠস্বর।
আলাবামার সেই নিঃসঙ্গ অতিথি!
বয়ে চলো! বয়ে চলো! বয়ে চলো!
পোমানকের তীর দিয়ে সমুদ্রেব বাতাস।
আমি অপেক্ষা করছি, আমি অপেক্ষা করব।
যতক্ষণ না আমার সঙ্গীকে এনে দাও।
হ্যাঁ, যখন নক্ষত্ররা জ্বল জ্বল করছিল
শ্যাওলা পড়া বাঁকানো যষ্টি-ফলকের ওপর,
সারারাত আছড়ে পড়া বিস্ময়কর তরঙ্গের মধ্যে প্রায় বসে,
নিঃসঙ্গ গাইয়ে টেনে আনছিল চোখের জল।
সে তার সঙ্গীকে ডাকছিল
তার আহ্বানের অর্থ সমস্ত মানুষের মধ্যে
আমিই কেবল জানি।—
হ্যাঁ ভাই আমি জানি,
অপরেরা না জানতে পারে,
আমি কিন্তু সঞ্চয় করে রেখেছি প্রত্যেকটি ধ্বনি
কারণ অনেকবার সমুদ্র তীরে—

নীরবে জ্যোৎস্না-কে এরি ছায়ার সংগে মিশে
অনুভব করেছি।—
এখন স্মরণ করছি সেই অদ্ভুত আকার আর প্রতিধ্বনি
সেই রকমের শব্দ আর আওয়াজ
যেখানে তরংগের ঊর্ধ্ববাহু
অক্লান্তভাবে আঘাত করছে তীরভূমি।
শিশু আমি, নগ্ন পায়ে চলেছি,
বাতাসে আমার চুল উড়ছে,
অনেক, অনেকদিন পরে শুনেছি সেই সুর।

সেই ধ্বনি অনুবাদ করতে, গাইতে, মনে রাখতে,
ভাই, তোমায় অনুসরণ করেছি।
শান্ত হও! শান্ত হও! শান্ত হও!
সামনের তরংগটা পেছনের তরংগকে শান্ত করছে,
একজন লাফাচ্ছে আর একজন জড়িয়ে ধরছে
প্রত্যেকেই ঘনিষ্ঠ—
দেখ চাঁদ ঝুলে পড়েছে!

দেরিতে উঠেছিল সে!
পেছিয়ে পড়েছে সে; আমার মনে হয়
ভালবাসার ভারে সে ভারী।—
উন্মাদের মত সমুদ্র ডাংগার ওপর উথলে আসছে,
এর কারণ ভালবাসা।—
হে রাত্রি! আমি কি দেখছি না আমার প্রেম
ছড়িয়ে পড়ছে তরংগ-ভংগের মধ্যে।
শুভ্রতার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ঐ
কালো জিনিসটা কি?
জোরে! জোরে! জোরে!
হে আমার ভালবাসা তোমায় ডাকছি জোরে,
বাধাহীন উচ্চকণ্ঠ স্বর আমার—
ছড়িয়ে দিলাম তরংগের ওপর।
তুমি নিশ্চয় জানো কে এখানে রয়েছে,
তুমি নিশ্চয় জানো কে আমি,
হে আমার ভালবাসা।

নীচুতে নামা চাঁদ!
তোমার বাদামী আর হলদে রঙের মধ্যে
ঐ কালো দাগটা কিসের?
ওঃ এটা আমার সংগিনীর চেহারা।
হে চাঁদ ওকে আর রেখো না বিচ্ছিন্ন করে,
আমার কাছ থেকে।

তোমরা পার আমার প্রিয়াকে ফিরিয়ে দিতে,
অবিশ্যি যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়।
কারণ আমি প্রায় নিশ্চিত
যে যেদিকেই চাই না কেন
অস্পষ্ট ভাবে তাকে দেখতে পাই।
হে উদীয়মান নক্ষত্রেরা!
যাকে আমি এত করে চাই সেও সম্ভবতঃ
তোমাদের কারুর কারুর সংগে ফুটে উঠবে আকাশে।

হে কণ্ঠ! হে কম্পিত কণ্ঠ!
পরিবেশের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে ধ্বনিত হও,
অবশ্য, পৃথিবী ছিন্নভিন্ন করে ফেলো।
যাকে আমি চাই তাকে
কোথাও না কোথাও ধরব ঠিক।
কাঁপতে থাকুক আনন্দ সংগীত।—
নিঃসংগ এখানে—আর রাত্রির আনন্দ গীতি।
নির্জন প্রেমের আনন্দ-কাকলী,
মৃত্যুর-আনন্দ-গীতিকা!
ক্ষয়ে যাওয়া পশ্চাদপদ হলদে চাঁদের তলায়
আনন্দ-সংগীত।
হায়? ঐ চাঁদের তলাতেই সে প্রায় সমুদ্রে পড়েছিল!
হে হতাশাময় বল্গাহীন আনন্দ সংগীত।—

কিন্তু কোমল হও! অবনমিত কর নিজেকে।
আস্তে! আমায় মন্থর হতে দাও,
আর তুমি কি এক লহমা চুপ করবে
কোলাহলময় সমুদ্র?
কারণ কোথাও না কোথাও আমার মনে হয়
আমার সাথীরা উত্তর দিচ্ছে আমার ডাকের।
এত মৃদু আমায় চুপ করতে হবে—
ঐ সাড়া শোনবার জন্য আমায় চুপ করতে হবে।
সব একেবারে শান্ত না হলে
সে হয়ত আসবে না আমার কাছে!
প্রিয়া এইদিকে—।
এই যে আমি এখানে—।
তোমার কাছে এই বলে আমি নিজেকে ঘোষণা করছি
এই শান্ত আহ্বান তোমার জন্য
হে প্রিয়তমা এ ডাক তোমারই।

অন্য কোথাও ফাঁদে পোড়ো না।
ওটা বাতাসের আওয়াজ, আমার গলা নয়,

ওটা ঝরণার ঝরঝরাণি।
ওটা পাতার ছায়া।—
হে অন্ধকার! হায় ব্যর্থতা!
আমি খুব দুর্বল আর বেদনাহত!
আকাশের চন্দ্রের কাছাকাছি বাদামী রঙের
হে জ্যোতির্মন্ডল
সমুদ্রের দিকে তুমি ঝুঁকে পড়েছো।
সমুদ্রের বিশৃংখল প্রতিচ্ছায়া—
হে কন্ঠ, হে কম্পমান হৃদয়।
আর সারা রাত্রিব্যাপী নিষ্ফলা আমার গান।
হে অতীত! হে সুখী জীবন! হে আনন্দ-গীতি,
বাতাসে বনে আর মাঠে,
ভালবেসেছি! ভালবেসেছি! ভালবেসেছি!
কিন্তু আমার সঙ্গিনী আর সংগে নেই আমার
আমরা দু'জন আর একত্র নাই!

একক কণ্ঠের সংগীত ডুবে যাচ্ছে;
আর সব ঠিক চলছে; নক্ষত্ররা দীপ্তিমান,
বহমান বাতাস, পাখীদের কণ্ঠ-কাকলী,
ধারাবাহিকভাবে প্রতিধ্বনিত।
পোমানকের ধূসর আর মর্মরিত বালুকা বেলায়
আদিম-জননী সিন্ধুর ক্রুদ্ধ-গর্জন
অবিশ্রান্ত ভাবে চলেছে।

হলুদবর্ণের অর্ধচন্দ্র স্ফীত হচ্ছে,
ঝুলে পড়ছে নীচেতে,
প্রায় স্পর্শ করছে সমুদ্রের মুখ।
উল্লসিত বালক খালি পায়ে সমুদ্রের মধ্যে,
তার চুল নিয়ে খেলা করছে বাতাস।
হৃদয়ের দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ ভালবাসা
এইবার মুক্তি পেয়েছে
অবশেষে ফেটে পড়ছে বিশৃংখলতার সংগে
একক কণ্ঠের সুর ধ্বনির অর্থ;
কর্ণ, আত্মা এরা ত সঞ্চয় করে রাখছে,
গাল বেয়ে নেমে আসছে আশ্চর্য অশ্রুবিন্দু!
সেখানকার চলতি কথা উচ্চারণ করছে সবাই,
আদি-জননী কেঁদে চলেছে অবিশ্রান্ত নীচু গলায়।

বালকের আত্মার প্রশ্ন বিষণ্ণ ভাবে
শুনছে প্রহর;
কোন বিলুপ্ত গুপ্ত তথ্য

ফিস্ ফিস্ করে বলছে আগন্তুক চারণকে।
দানব কিংবা পাখী।
(বালকের আত্মা জানায়)
নিশ্চয় তুমি তোমার সঙ্গিনীর জন্য গান গাচ্ছ।
কিংবা সত্যিই আমার জন্য এ গান।
কারণ তখন আমি শিশু
আমার কণ্ঠ ঘুমন্ত,
এখন আমি শুনছি তোমার গান,
এক লহমায় বুঝতে পেরেছি
কিসের জন্য আমি।
আমি জেগে উঠ্ছি;
ইতিমধ্যে হাজার হাজার গায়ক
হাজার হাজার গান,
তোমার থেকে আরো পরিষ্কার আরো জোরাল,
আরো দুঃখময়
হাজার হাজার কম্পিত প্রতিধ্বনি,
আমার মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে;
চিরকাল বেঁচে থাকার সংকল্প নিয়ে।

হে নিঃসঙ্গ গায়ক নিজে গান গেয়ে
নিক্ষেপ করছ আমাকে,
আমি একাকী শুনছি;
কোন সময়ই তোমায় ভুলে যাব না,
আর কখনো আমি ছাড়া পাব না,
অতৃপ্ত প্রেমের ক্রন্দন কোন দিন
হব না বিস্মৃত,.
সেই রাত্রির আগে যে শান্তিময় বালক ছিলাম
আর কখনো আমি তা' হতে পারব না।
হলুদ রঙের চাঁদের তলায় সমুদ্র-তীরে
জেগেছে সেই শিখা,
সেই চরম মধুর যন্ত্রণার বাণী,
সেই অজানা পিপাসা,
—আমার নিয়তি —

সেই সঙ্কেত-সূত্র!
আমায় দাও
যা আছে রাত্রির অন্ধকারে কোথাও হারিয়ে
যদি এতই সয়েছি, আরো সইতে দাও।
একটা কথা তা' হলে (কারণ আমি জয় করব তাকে)
শেষ কথা, সকলের ওপরে;

সূক্ষ্ম,—ওটা কি ? —আমি শুনছি।
সিন্ধু তরঙ্গে তোমরা কি ফিস্ ফিস্ করে বলছ ওসব ?
এটা কি তোমার ভিজে বালি আর তরল তীর থেকে
আসছে ?

তাড়াতাড়ি করে নয়, দেরী করে নয়,
সমুদ্র উত্তর দিলে,
রাত্রে ফিস্‌ফিস্ করে বললে,
দিনের বেলা বললে পরিষ্কার করে।
জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, নীচু গলায় মুখর মৃত্যু শব্দ
আবার মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু।
সুরেলা গলায় হিস্ হিস্ করে।
পাখীর মত করে নয়, কিংবা
আমার জেগে ওঠা বাল্যকালের
হৃৎপিন্ডের মত শব্দেও নয়,
আমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে,
তারপব গড়িয়ে গড়িয়ে আস্তে আস্তে আমার
কর্ণমূলে পৌঁছে,
সর্বাঙ্গ নরম ভাবে ধুইয়ে দিলে
মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু।
আমি কোন সময়ই তা' ভুলব না,
কিন্তু মিশিয়ে দেব আমার দানবীয় বন্ধুর সঙ্গে নিজেকে,
পোমানকের ধূসর তীরে সে আমার জন্য গান গেয়েছিল,
এখান থেকে সেখান থেকে হাজার হাজার
সাড়া জাগান গান;
সেইক্ষণ থেকে আমার নিজের গানও জেগে উঠেছে
আর তাদের সঙ্গে বাকীটা—
সমুদ্র তরঙ্গের কথা—
সব থেকে মধুর আর সমস্ত গানের কথা,
সেই বলিষ্ঠ আর সুমিষ্ট শব্দ,
যা আমার পা থেকে বুকে হেঁটে ওপরে উঠেছে,
সুবেশ আনত কোন—
অতি বৃদ্ধার মত দোলনাটা দোলাতে দোলাতে;
সমুদ্র চুপিচুপি আমার কানে কানে কথা কয়।

কোন সাধারণ পতিতার প্রতি

শান্ত হও, স্বচ্ছন্দ হও আমার কাছে।
আমি ওয়াল্ট হুইটম্যান; উদার ও প্রাণবন্ত
প্রকৃতির মতই।

যতক্ষণ না সূর্য বিসর্জন দেয় তোমায়
আমি তোমায় বিসর্জন দেবো না।
আমার কথা তোমার জন্যে গুঞ্জরিত হবে
আর ঝক্‌মক্‌ করবে,—
যতক্ষণ না অস্বীকার করে জল তোমার জন্য
ঝিক্‌মিক্‌ করবে,
আর পাতারা হবে মর্মরিত।
হে আমার বান্ধবী এক ভাবি সাক্ষাতেব—
তলব তোমায় দিলাম।
তোমায় নির্দেশ দিলাম আমার সংগে খেলবাব জন্য
নিজেকে প্রস্তুত করতে যথাযোগ্য—
তোমায় নির্দেশ দিলাম যতক্ষণ না আসি
ততক্ষণ ধৈর্য ধরে আপন ব্রতে পূর্ণ হতে।
তারপর তোমায় অভিবাদন কবে যাই সেই ইংগিতময়
দৃষ্টি দিয়ে
যা তুমি কখনো ভুলবে না।

ব্যর্থ বিপ্লবীকে

ধৈর্য ধর তবু, ভাই কিংবা বোন আমাব।
চালিয়ে যাও—যাই ঘটুক না কেন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে
স্বাধীনতাকে,
যা' দু একটা বা অসংখ্য ব্যর্থতায় থেমে যায়,
তা' আদপেই কিছু নয়,
জন-সাধারণের নিরুৎসাহ, অকৃতজ্ঞতা বা বিশ্বাসঘাতকতা,
কিংবা শক্তির প্রকাশে, সৈন্য, কামান, শাস্তি বিধানে,
যা থেমে যায় তা' আসলে কিছু নয়।
সমস্ত মহাদেশগুলোতে যা আমরা বিশ্বাস করি
তা' অপ্রকট ভাবে অপেক্ষমান।
কাউকে ডাকছে না, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না কিছুর
শান্ত আব আলোকিত হয়ে বসে;
স্থির আর কর্মশীল;
ব্যর্থতা কে সে জানে না,
ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করছে,
প্রতীক্ষা করছে মহেন্দ্রক্ষণেব।

(এ শুধু বিশ্বস্ততার গান নয়,—
এ গান বিপ্লবেরও;
কারণ আমি হচ্ছি সারা পৃথিবীর অপরাজেয়

বিদ্রোহীদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কবি।
আর যে আমার সংগে চলে সে ফেলে আসে
শান্তি আর শৃংখলা তার পেছনে;
আব তার জীবন বিপন্ন করে যে কোন মুহূর্তে।
সজোরে সতর্ক ধ্বনি বেজেছে বহুবার;
যুদ্ধ বলছে; ঘন ঘন অগ্রগমন আর পশ্চাদপসরণ,
অবিশ্বাসী জিতছে, কিংবা ধরে নেওয়া যাক সে জয়ী,
কারাগার, ফাঁসীর মঞ্চ, হাতকড়ি লোহার বেড়ি
সীসের বল, তাদের কাজ করে যাচ্ছে।

জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বীরেরা অন্য জগতে চলে যাচ্ছে,
মহান বক্তা আর লেখকরা নির্বাসিত;
দূব দেশে তারা পড়ে আছে অসুস্থ হয়ে।
আদর্শ নিদ্রাগত;
সব চেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠরা নিজেদের রক্তে স্তব্ধ
যুবকদের যখন পরস্পরে দেখা হয়
তখন তারা নামিয়ে নেয় চোখের পাতা;
এ সমস্ত সত্ত্বেও কিন্তু স্বাধীনতা স্থানচ্যুত হয়নি,
অবিশ্বাসীরা পায়নি সম্পূর্ণ মমতা।

স্বাধীনতা সকলের আগে যায় না;
দ্বিতীয় বা তৃতীয় দফাতেও নয়;
সব কিছু যাবার পর, স্বাধীনতা যায়
সকলের শেষে।
যখন শহীদ আর বীরদের কোন স্মৃতি থাকবে না,
যখন পৃথিবীর কোন অংশ থেকে সমস্ত নর নারীর
আত্মা বিদায় নেবে;
তখনই, কেবল তখনই পৃথিবীর সেই অংশে
অবলুপ্ত হবে স্বাধীনতা বা স্বাধীনতার আদর্শ।
আর তখনই সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে
অবিশ্বাসীর পূর্ণ কর্তৃত্ব।
সাহসী হও তাহলে বিদ্রোহী আর বিদ্রোহিনীরা,
সবকিছু না থামলে তোমরা থেমো না;
আমি জানি না তোমরা কিসের জন্যে,
(আমি নিজেই জানি না আমি কি,
কিংবা আর সব কিসের জন্যে আছে)
ব্যর্থ হলেও আমি কিন্তু সতর্কতার সংগে খুঁজব
পরাজয়ে, দারিদ্র্যে, ভুল বোঝায়, কারাগারে—
কারণ তারা মহান।

আমবা কি মনে করছি জয়টা মহান ?

হ্যাঁ, তাই কিন্তু এখন আমি দেখছি,
যখন উপায় নেই তখন পরাজয়ও মহান।
মৃত্যু আর হতাশাও মহান।—

সমাপ্তি সঙ্গীত

দ্বারপ্রান্তে শেষ যখন ফুটেছে লাইলাক
আর রাত্রে পশ্চিমাকাশে সেই উজ্জ্বলতম তারা
গিয়েছে অস্ত—
শোকাহত হয়েছি আমি,—বারবার এমনি হব শোকার্ত
বসন্ত যখন ফিরবে।

ফিরে-ফিরে আসা বসন্ত,
আমার কাছে তিনটি জিনিষ আনে।
চিরন্তন লাইলাক-মঞ্জরী, পশ্চিমের অস্তায়মান তারা
আর তাঁর স্মৃতি যাঁকে ভালবাসি।
হে স্খলিত প্রচণ্ড তারা পশ্চিমের
হায়, নিশার ছায়া—অশ্রুসজল বেদনাগাঢ় রাত্রি—
হে নিশ্চিহ্ন নক্ষত্র—তাকে আড়াল-করা
মসীকৃষ্ণতা—
আমায় অসহায় করে রাখা নিষ্ঠুর শক্তি
হায় আমার নিরুপায় হৃদয়!
গাঢ় নির্মম মেঘাবরণ যা আমার আত্মাকে দেয়নি মুক্তি!
শাদা রঙকরা বেড়াগুলোর পাশে
পুরাণো গোলাবাড়ির দরজার কাছে লাইলাকের ঝাড়,
দীর্ঘ গাছ, উজ্জ্বল সবুজ হরতনী ছকের পাতা
সূক্ষ্ম শীর্ষ অসংখ্য কমনীয় তার ফুল,
তীব্র তাতে সেই গন্ধ যা আমার প্রিয়।
প্রত্যেকটি পাতাই যার—রহস্য মণ্ডিত,
দ্বারপ্রান্তের সেই লতা-কুঞ্জ থেকে—
একটি পুষ্পিত শাখা আমি ভেঙে নিলাম।

জলাভূমির নির্জনতায়
একটি লাজুক গোপন পাখী গাইছে।
জনপদ থেকে দূরে
সে নিজেকে নির্বাসিত করেছে তাপসের মত।
সে গান রক্তাক্ত কণ্ঠের
মৃত্যু থেকে উদ্গত জীবন-সঙ্গীত।
(আমি জানি বন্ধু
গান গাইতে না পারলেই
নিশ্চিত তোমার মৃত্যু।)

বসন্তের বুকের ওপর দিয়ে
প্রান্তর: ও নগরের মধ্য দিয়ে
গলিপথে, প্রাচীন কান্তারে
—যেখানে বিবর্ণ আবর্জনার ওপরে
ভায়োলেট ফুল সেদিন উঁকি দিয়েছে,
পথের দুধারে
মাঠের ঘাসের মধ্য দিয়ে—
স্বর্ণশীর্ষ গমের ক্ষেত পেরিয়ে
—প্রত্যেকটি যার শস্যকণা
গাঢ় বাদামী মাটির ভেতর থেকে
গুণ্ঠন নিয়ে বেড়িয়েছে।
আপেল বাগানের ঈষৎ রক্তিম
শুভ্র ফুলের গুচ্ছ পেছনে ফেলে
কবরস্থ করবার জন্যে শব নিয়ে যাওয়া,
দিবারাত্রি এক শবের অবিরাম যাত্রা।

সেই শবাধার
যা চলেছে গলি আর রাস্তা দিয়ে
চলেছে সারাদিন আর মেঘান্ধকার
সারারাত ধরে
জড়ানো সব পতাকার সমারোহ নিয়ে
কৃষ্ণাবরণে ঢাকা সব শহর দিয়ে।
সমস্ত প্রদেশ যেন শোকের বেশে সেজে
দণ্ডায়মান মহিলাবৃন্দ।
দীর্ঘ বিরাট মিছিল
অসংখ্য মশালে দীপ্ত রাত্রি—
অনাবৃত মস্তক আর নীরব মুখর সমুদ্র।

শবাধার আসছে
ভাবাক্রান্ত মুখে যারা দাঁড়িয়ে
তাঁদের সঙ্গে
সারারাত্রি ব্যাপি
সহস্র কণ্ঠেব
গাঢ় গম্ভীর শোক-সঙ্গীতের সঙ্গে
স্বপ্নালোক সব গীর্জা আর শিহরিত
সব বাদ্যযন্ত্রের নিনাদের মধ্য দিয়ে
যেখানে তুমি চলেছ—
অবিরাম ঘণ্টাধ্বনির মাঝখানে
চলেছে যে শবাধার
ধীরে ধীরে

তোমার উদ্দেশে
তাতে দিলাম আমার এই পুষ্পস্তবক।
(শুধু তোমার একলার জন্যে নয়
সমস্ত শবাধারের জন্যে পুষ্পিত এই মালা
আমি এনেছি
প্রভাতের মত সজীব এমনি গান
আমি গাইতে চাই
পবিত্র ও প্রশান্ত মৃত্যুর জন্যে।
চারিদিকে
গোলাপের রাশি।
গোলাপ আর লিলি দিয়ে
আমি তোমায় আচ্ছাদিত করে দিই
কিন্তু যে লাইলাক ফোটে সবার আগে
তারই শাখা আমি ভেঙে আনি অজস্র
দু'হাত ভরে সেই নৈবেদ্য
দিই ঢেলে
তোমার জন্যে,
সব শবাধারের জন্যে
হে মৃত্যু!)

হে পশ্চিমের উজ্জ্বল নক্ষত্র
এখন আমি বুঝি কি তোমার
ছিল বারতা,
মাসেক কাল ধরে
যখন স্বচ্ছ ছায়াচ্ছন্ন রাতের পর রাত
নীরবে আমি হেঁটেছি।
তুমি নত হয়েছ রাতের পর রাত
যেন কি আমায় বলতে
নেমে এসেছ আকাশ থেকে
যেন আমার পাশে
(অন্য সমস্ত তারকার জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে)
যখন আমরা দীর্ঘ রাত্রির গাম্ভীর্যে
একসঙ্গে বেড়িয়েছি ঘুরে।
(কেন যে ঘুম আমার চোখে ছিল না
আমি জানি না)

রাত যত এগিয়েছে
পশ্চিম আকাশ-প্রান্তে
তোমার গাঢ় বেদনা যেন আমি বুঝেছি,
বুঝেছি বন্ধুর জমির ওপরে

স্বচ্ছ শীতল রাত্রির বাতাসে দাঁড়িয়ে,
যখন দেখেছি তোমায়
কালো রাত্রির অতলে হারিয়ে যেতে
যখন আমার অস্থির হৃদয়
ব্যথায় পড়েছে লুটিয়ে,
তোমার মত হে দুঃখী নক্ষত্র
রাত্রির তিমিরে নিমজ্জিত, সমাপ্ত।

জলাভূমিতে গান তুমি গেয়ে যাও
হে লাজুক মধুর গায়ক
তোমার সুর আমি শুনি,
শুনতে পাই তোমার ডাক,
শুনি আর তোমার কাছে আসি।
তোমাকে আমি বুঝি।
কিন্তু মুহূর্তের বিলম্ব আমার হয়,
কারণ সেই উজ্জ্বল তারা
আমায় ধরে রাখে
আমার সেই বিদায়ী বন্ধু
আমায় ধরে রাখে,
দেরী করিয়ে দেয়।

যে গেছে তার গান কেমন করে
আমি গাইব,
—যাকে আমি ভালবাসতাম!
কেমন করে সাজাব আমার গান
সেই বিশাল মধুর হৃদয়ের জন্যে
যা আর নেই?
আমার সেই প্রিয় বন্ধুর সমাধি
কী সুবাসে দেব ভরিয়ে?
পূর্ব আর পশ্চিম সমুদ্রের বাতাস
এসে মিশেছে উদার প্রান্তরে,
তাই দিয়ে আর তার সঙ্গে
আমার গাথার নিঃশ্বাস মিশিয়ে
যাকে ভালবাসি
তার সমাধি
করব আমি সুরভি।

দেয়ালে কি আমি টাঙাব
কোন ছবি,
—তার সমাধি-মন্দিরের দেয়ালে
যে আমার প্রিয়!

সে ছবি জাগ্রত বসন্তের
শস্য প্রান্তর, আর গৃহস্থালির
মধুর সূর্যাস্তের আর উজ্জ্বল ধূম-জ্যোতির,
বর্ণাঢ্য অলস অস্তমান সূর্যের
সোনালী আভায়
জ্বলন্ত বিস্তৃত আকাশের।
গাছের তলায় কচি মধুর তৃণ
গাছে গাছে অসংখ্য হরিৎ-পাণ্ডুর পাতা
দূরে নদীর উচ্ছল স্রোতের ঝিকিমিকি
হাওয়ার বেগে এখানে সেখানে ভাঙা,
তীরে পাহাড়ের গায় আর আকাশে
অনেক রেখা আর ছায়া,
ঘন-বসতি শহর, চিমনির অরণ্য
আর জীবনের সবকিছু দৃশ্য
কারখানারও
—ঘরে ফেরা শ্রমিকদের সেই সংগে।
গান গাও, গেয়ে যাও
পাটল ধূসর পাখী
গান গাও জলাভূমি থেকে
তোমার নির্জন কুঞ্জ থেকে
উথলে তোলো তোমার গান
অরণ্যের অন্ধকার থেকে
গেয়ে যাও অফুরন্ত।

হে বন্ধু গেয়ে যাও
শরবনের শিষ মেশানো তোমার গান,
করুণ দুঃসহ মানবিক।
হে তরল, অবাধ, কোমল
হে উদ্দাম শৃংখলহীন
হে অপরূপ গায়ক!

তোমার গানই আমি শুধু শুনি
কিন্তু সেই নক্ষত্র আমায় রেখেছে আটকে,
(বিদায় কিন্তু নেবে অচিরে)
লাইলাক তার প্রবল সুগন্ধে
আমায় রেখেছে ধরে।

দিনমানে যখন বসে বসে
আমি দেখেছি,
দেখেছি দিনান্তে সেই আলো
বসন্তের প্রান্তর

আর কিষাণদের শস্য নিয়ে কাজ
হ্রদে ও অরণ্যে চিহ্নিত
আমার স্বদেশের
বিশাল অচেতন দৃশ্যলোক
(অস্থির ঝটিকা বাত্যার পর) আকাশের সৌন্দর্যে
বিলীয়মান অপরাহ্নের চাঁদোয়ার মত
নুয়ে পড়া আকাশের নিচে
শুনেছি নারী আর শিশুদের কণ্ঠস্বর
দেখেছি সাগরের সব জোয়ার ভাঁটা
আর জাহাজের পাড়ি
দেখেছি আসন্ন গ্রীষ্মের ঐশ্বর্য
আর প্রান্তরের ব্যস্ততা
ছোট ছোট সব অসংখ্য সংসার
—প্রত্যেকের নিজস্ব দৈনন্দিন জীবনযাত্রা
অনুভব করেছি রাজপথের স্পন্দন
নগরের উচ্ছ্বাস,
তখন, হঠাৎ
আমাকে, সব কিছুকে আবৃত করে
নেমেছে সেই মেঘ
সেই দীর্ঘ মসিবরণ বিলেপন,
আর মৃত্যুকে আমি জেনেছি,
করেছি তাকে উপলব্ধি
তার সেই পবিত্র তত্ত্ব।
তারপর আমার একদিকে মৃত্যুর বোধকে
সঙ্গে নিয়ে
সঙ্গে নিয়ে আরেক দিকে ঘনিষ্ঠ তার চিন্তা
মাঝখানে বন্ধুর মত তাদের হাত ধরে
আমি ছুটে পালিয়ে গেছি
সেই গোপনতায়
মৌন রাত্রি যেখানে মেলে।
গেছি বারিধির তীরে
আবছায়া জলাভূমির ধারের পথে
গাঢ় গম্ভীর নিশাচরের মত
ছায়ামূর্তি অরণ্যতরুদের মাঝখানে।

সেই লাজুক গায়ক
সবার কাছ থেকে যে থাকে
আত্মগোপন করে
সে আমায় অভ্যর্থনা করেছে
আমার পরিচিত সেই ধূসর পাটল পাখী

আমাদের তিন বন্ধুকে জানিয়েছে স্বাগত
গান গেয়েছে সে মৃত্যুর
আর শুনিয়েছে তাঁর গাথা
যিনি আমার প্রিয়জন।
নির্জন গভীর বনান্তরাল থেকে
ছায়াদেহ সুগন্ধি অরণ্যতরুর ভেতর দিয়ে
শোনা গেছে সে পাখীর গীতধ্বনি।
মুগ্ধ হয়েছি আমি সে সংগীতের মাধুর্যে
আমার সাথীদের যেন হাত ধরে
রাত্রির অন্ধকারে থেকেছি দাঁড়িয়ে
আর আমার হৃদয়ের বাণী
সেই পাখীর গানে সায় দিয়েছে।
এসো মধুর মৃত্যু
এসো সান্ত্বনা
আন্দোলিত হয়ে বয়ে যাও
সমস্ত পৃথিবীকে ঘিরে
শান্ত গম্ভীর চিব আগন্তুক,
এসো দিনে
এসো রাত্রে
এসো সকলের প্রত্যেকেব কাছে
আজ কি কাল।
হে কমনীয় মৃত্যু
অতল এই বিশ্বের
স্তুতি গাই
অভিনন্দিত করি জীবন ও জীবনেব উল্লাস
বস্তু ও বিচিত্র জ্ঞান
আর ভালবাসা
মধুর ভালবাসা,
কিন্তু সবচেয়ে উচ্ছলিত স্তুতি গাই
মরণের অমোঘ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনের।

হে তিমির জননী
কোমল নিঃশব্দ চরণপাতে
নিরন্তর আসো ধীরে।
তোমায় আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ
কেউ কি জানায়নি সংগীতে ?
তাহলে আমিই গাই সেই গান
তোমার মহিমা আমার কাছে
সবার উপরে,
আমার গানে বলি

অকম্পিত পদে তুমি এসো
যখন সময় হবে আসবার।

হে পরম মুক্তিদায়িনী
এসো।
সমাপ্তি যখন হয়,
তুমি যখন তাদের টেনে নাও
আমি পরমানন্দে সেই মৃতদের গান গাই
—যারা তোমার ভালবাসার সাগর-স্রোতে বিলুপ্ত
তোমার প্রগাঢ় তৃপ্তির তরঙ্গে যারা স্নাত।

বিচ্ছিন্ন কবিতা

হঠাৎ যদি

আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা,
করি গোটাকয়েক আইন জারি
দু'এক জনায় খুব ক'ষে দিই সাজা।

মেঘগুলোকে করি হুকুম সব
ছুটি তোদের, আজকে মহোৎসব।
বৃষ্টি-ফোঁটার ফেলি চিকন চিক
ঝুলিয়ে ঝালর ঢাকি চতুর্দিক,
দিলদরিয়া মেজাজ ক'রে কই
বাজগুলো সব স্ফূর্তি ক'রে বাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।
হাওয়ায় বলি, হল্লা ক'রে চল
তারার বাতি নিভিয়ে দলে-দল,
অন্ধকারে সত্যি কথার শেষে
রাজকন্যা পদ্মাবতীর দেশে।
ঘুমের ঘোরে সেপাইগুলো ঢোলে,
তাদের ধ'রে খুব ক'ষে দিই সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।
সুপ্তিমগন পদ্মাবতীর পুরে
মহল বেড়াই টহল দিয়ে ঘুরে।
ধীরে গিয়ে বসি শিয়রদেশে
একটি মালা পরায়ে দিই কেশে,
হৃদয়খানি জোর ক'রে নিই কেড়ে;
বুকে বেঁধে দিই তাহারে সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।
ওলট-পালট করি বিশ্বখানা
ভাঙি যেথায় যত নিষেধ মানা;
মনের মতো কানুন করি ক'টা
রাজা হওয়ার খুব ক'রে নিই ঘটা।
সত্য, তা সে যতই বড় হোক
কঠোর হ'লে দিই তাহারে সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

শত বর্ষ পরে

শত বর্ষ পরে,
কে তোমার কবিতা পড়বে,
তাই করতে চেয়েছিলে কল্পনা।
সে কল্পনা হয়ত তোমার ভুল।
বাতায়নে বসে
সেই ভাবীকালের কোনো তরুণী
তোমার কবিতার পাতা হয়ত ওল্টাবে না
অলস কৌতূহলে।

সময় বড় উদাসীন, বড় অচেতন।
মেহগিনির মঞ্চ 'পরে
পঞ্চ কি পঞ্চাশ হাজার
পুরানো পুঁথির স্তূপে

তোমার সব মুদ্রিত রচনা
হয়ত শুধু হয়ে থাকবে
পণ্ডিত গবেষকদের প্রলোভন।
থাক্ না তাই।
শুধু ছাপানো অক্ষরের বন্ধনে
পাঠ্য হবার পরমায়ু তোমার নয়।

শত বর্ষ পরেও তুমি থাকবে
আকাশের নীলের আরেকটু গাঢ়তা হয়ে।
থাকবে, আমাদের কণ্ঠের সুর
আর আমাদের ভাষার আনন্দদান ঝংকারে।
যৌবনের চোখে তুমি তখন
অদম্য দিগন্ত-তৃষ্ণা,
চির বিপ্লবের উত্তেজনা
তার ধমনীর স্পন্দনে।

সব অসাম্যের বিরুদ্ধে
তুমি এক শাশ্বত বজ্রকঠিন শপথ,
অখণ্ড মানবতার দিশারী
এক প্রসন্ন উদার প্রশান্তি।

ধ্বনির হৃদয়ে

কান পাতলে ঝিরিঝিরি
শুনতে কি পাও, কোথায় যেন

একটি ভীরু লাজুক ধ্বনি
ঘুমঘোরের প্রান্তে কাঁপে ?
তৃষ্ণার্ত, কে তৃষ্ণার্ত ?
মেটার যা নয় সেই পিপাসাই
প্রাণের গহন উৎস চেনায়।
মেঘ-ভাসানো হাওয়ার রাতে
জ্যোৎস্না-তরল অন্ধকারে
চুপিচুপি একটি চাওয়া,
হতেও পারে নিঃশ্বসিত,
সংশয়ী, কে সংশয়ী ?
হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতির কণাও
সময়-সাগর ফিরিয়ে দেবে-ই
মন্দিরে কোন প্রহর গোণার
ঘণ্টা বাজে অনেক দূরে।
হিসাব কিছু নাই বা থাকুক,
তবু বাতাস ব্যথায় উদাস!
বৈরাগী কে জীবন-ক্লান্ত ?
সব হারিয়েও জেনে রেখো
হারের খেলা কোথাও নেই!
শব্দেরও কি নেইকো ছায়া?
কিংবা বুকে আরেক শিহর ?
সেই মর্মর খুঁজে পেলে-ই
সব হেঁয়ালি আপনি সরল!
কে উদ্‌ভ্রান্ত পাওনি দিশা ?
ধ্বনির হৃদয় স্তব্ধতা নয়,
এই ত পরম প্রহেলিকা!

গোপন

একটি গোপন কথা
পৃথিবী নিজের মনে
রাখে সংগোপনে।
কখনো একান্তে বুঝি
নিজেই তা চুপি চুপি শোনে।

সেকথা শুনতে কেউ
তুহিন নিষেধ ঠেলে
উত্তুঙ্গ শিখর সব খোঁজে।
কেউ পিপাসার শেষ
দেখতে চায়
অন্তহীন জ্বলন্ত বালিতে।
শূন্যে কেউ পাড়ি দেয়
কেউ নামে আপনার অতল গহনে।

সে গোপন কথা কেউ
কে জানে শুনেছে কিনা
কোথাও কখনো,
প্রপঞ্চের চাবি হয়তো খোঁজাই ভুল।
তবু আমি কান পেতে থাকি
দুর্গম নির্জনে নয়
মানুষেরই জনতার সারে।
অতি পবিচিত এই সংসারের তীরে
এর ওর তার যত ভাষাহীন অবোধের মুখে।
হয়ত সহসা
সেখানেই শেষ সত্য
শুনব উচ্চারিত।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা

তথ্যপঞ্জী
ও
গ্রন্থ পরিচয়

সম্পাদনা

ডঃ সরোজ মোহন মিত্র

তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের সময়েই যে রবীন্দ্রোত্তর যুগের সূচনা হয়েছিল তার মধ্যে প্রথমেই যদি কোন আধুনিক কবির নাম করতে হয় তবে সেই নাম প্রেমেন্দ্র মিত্র। বিচিত্র অভিজ্ঞতার এই মানুষ ছয় দশক ধরে বাংলা সাহিত্যের নানা দিক সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম ১৯০৪ সালের ভাদ্রমাসের কোন এক মংগলবারে। বারাণসীর হরিশচন্দ্র ঘাটের কাছে ৫। ৭ আউদ খরবী মহল্লায় তাঁর দাদামশায় বাধারমন ঘোষের বাড়ি। সেখানেই তাঁর জন্ম। তবে তাঁর পিত্রালয় হুগলী জেলাব কোন্নগর গ্রামে। সেখানকার আভিজাত্যে প্রতিপত্তিতে খ্যাত মিত্রবংশের তিনি সন্তান। তাঁর পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষিত এবং রেলের একাউন্টেণ্ট ছিলেন। পিতামহ শ্রীনাথ মিত্র ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর বন্ধু। মাতা সুহাসিনী দেবী প্রেমেন্দ্রর দাদামশাই ও দিদিমার একমাত্র সন্তান। তিনি ছিলেন সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ভাবত মহিলা' সহ অন্যান্য পত্রিকা তিনি নিয়মিত পড়তেন। কিন্তু মাত্র সাত আট বছর বয়সেই প্রেমেন্দ্র মাতৃহারা হন। তাঁর পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। দিদিমার কাছেই প্রেমেন্দ্রব শৈশব অতিবাহিত হয়।

তাঁর দাদামশাই তখন ইষ্টইন্ডিয়া রেলের মির্জাপুর ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার। সেখান থেকেই প্রেমেন্দ্রর নানা রঙের স্মৃতির বোনা। শৈশব থেকে যাকে বলে অকালপক্ক প্রেমেন্দ্র তা-ই ছিলেন। সারাক্ষণ খেলাধুলো আর দুরন্তপনা। এর মধ্যেই বাংলা হিন্দী ইংরেজী তিনটি ভাষাই মোটামুটি শিখে ফেলেছেন। বাড়িতে বসেই লেখাপড়া। প্রখর স্মৃতিশক্তি। মুন্সীজির কাছে হিন্দী পাঠ। প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্ট বুক, 'বোধোদয়', যোগীন সরকারের ছোটদের বই, ছড়ার সংগে সুর মিলিয়ে কত অজানা মানুষের কাহিনী তাঁকে বিচলিত কবত বৃদ্ধবয়সেও তা ভুলতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর দাদামশাই-ও তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন এক কঠিন বসন্ত রোগে।

দাদামশায়ের মৃত্যুব পরে প্রেমেন্দ্রকে চলে আসতে হল নলহাটিতে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় বাড়িতে। সেখানকার এক মাইনর স্কুলেই তাঁব পড়াশুনা শুরু। দিদিমার আদর যত্নেই প্রেমেন্দ্র বড়ো হতে লাগলেন। ন বছর বয়সে দিদিমার সংগে গেলেন গংগাসাগরে। সেই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে বড় হয়ে লিখলেন 'সাগরসংগমে' গল্প।

নলহাটি থেকে কলকাতা। সাউথ সুবারবন স্কুলে অষ্টমশ্রেণীতে ভর্তি হলেন তিনি। এখানে তাঁর বন্ধুভাগ্য রীতিমত ঈর্ষণীয়। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলেন মিত্র, কান্তি বসাক পরবর্তী জীবনে নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিখ্যাত হন। প্রেমেন্দ্রও অসাধারণ। প্রেমেন্দ্রর ছাত্রাবস্থার কথা বলতে গিয়ে অচিন্ত্য লিখেছেন, "সমস্ত ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে অসাধারণ।... একমাথা ঘন কোঁকড়ানো চুল, সামনের দিকটা একটু আঁচড়ে বাকিটা এক কথায় অগ্রাহ্য করে দেওয়া।... সুগঠিত দাঁতে সুখ স্পর্শ হাসি, আর চোখের দৃষ্টিতে দূরভেদী বুদ্ধির প্রখরতা। এক ঘর ছেলের মধ্যে ঠিক চোখে পড়ার মতো। চোখের বাইরে একলা ঘরে হয়তো বা কোনো দিন মনে পড়ার মতো।"

প্রেমেন্দ্রর কবিতা লেখার প্রেরণা ছিলেন এই স্কুলের রণেন পণ্ডিত মশায়। ১৯১৭ সালে প্রেমেন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে ভারতবর্ষ' কবিতার ছন্দ

অনুকরণ করে 'হিমালয়' নামে একটি কবিতা লিখে ক্লাসে পড়ে শোনান। রণেন পণ্ডিত এই কবিতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। ঐ লেখার পরে তাঁর সহপাঠী বন্ধু অনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে রবীন্দ্রনাথ পড়তে উৎসাহিত করেন। কবিতা কাকে বলে জানতে হলে রবীন্দ্রনাথ পড়া চাই। রবীন্দ্রনাথ পড়তে পড়তে প্রেমেন্দ্রকে এক দুর্দান্ত নেশার মত পেয়ে বসল। সেই নেশার তাড়নাতেই পেমেন্দ্রর কলম দিয়ে ঝরঝরিয়ে কবিতা বেরিয়ে আসতে লাগল। এই সময় সহপাঠীদের নিয়ে প্রেমেন্দ্র 'সচলসঙ্ঘ' নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি নিয়মিত কবিতা পড়ে শোনাতেন।

১৯২০ সালে প্রেমেন্দ্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু এখানে বেশীদিন ছিলেন না। পড়াশুনা ছেড়ে তিনি চলে গেলেন শ্রীনিকেতনে মিঃ এলম্‌ হার্স্ট-এর কাছে কৃষিবিদ্যা শিখতে। সেখানে ডাঃ কাসাহারের কাছে ফুলের গাছের তালিমও নিলেন। পৌষমেলায় শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনের ছাত্ররা একটি সবজির স্টল দিয়েছিলেন এবং সেখানে প্রেমেন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে প্রথম প্রণাম করার সুযোগ পান।

শ্রীনিকেতনের পড়াও শেষ হল না। একদিন কলকাতায় এসে আর ফিরে গেলেন না। ভর্তি হলেন সাউথ সুবারবান কলেজে যার বর্তমান নাম আশুতোষ কলেজ। কলকাতায় এসে উঠলেন অগ্রজ-তুল্য বিমল ঘোষের মেসে। তাকে প্রেমেন্দ্র ডাকতেন টেনদা বলে। বিমল ঘোষ অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং হৃদয়বান পুরুষ। তার বাড়ি ঢাকায়। পিতার নাম বাধারমণ ঘোষ। প্রেমেন্দ্রর দাদামশায়েরও একই নাম। অতএব ঘনিষ্ঠতা হতে দেরী হল না। একবর টেনদার সংগে প্রেমেন্দ্র চলে গেলেন ঢাকায় তাদের কাগজীটোলার বাড়ি। সেখানে ঘবগুলো যেন বইভর্তি। প্রেমেন্দ্রর এত ভাল লেগে গেল যে তিনি সেখানে থেকে গেলেন এবং জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হলেন। এবার বিজ্ঞান বিভাগে। ভেবেছিলেন বিজ্ঞান পড়ে ডাক্তার হবেন। কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয় নি।

আবার চলে এলেন কলকাতায়। এবার বাঁচার জন্যই জীবিকার সন্ধান। বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে ভব করে লিখে ফেললেন একাধিক গল্প কবিতা।

১৯২২ সালে স্প্যানিশ লেখক জাসিন্তো বেনাভেন্তোর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সংগে সংগে বেনাভেন্তোর উপর একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দেন প্রবাসী পত্রিকায়। সেই লেখা ছাপা হয়ে গেল। ছাপার হরফে প্রেমেন্দ্রর প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারপর এই পত্রিকায় পরপর বেরিয়ে গেল তার দুটি গল্প —'শুধু কেরানী' এবং 'গোপনচারিণী'।

১৯২৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। সেই সময় প্রেমেন্দ্র চড়কডাংগা এম. ই. স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাজ করেছেন আট-দশ মাস। ওখানেই তিনি ড্রিল মাষ্টার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তারপর রাজগঞ্জে টালিখোলার ব্যবসায়ে কিছুদিন তিনি কাটিয়েছেন। সেখান থেকে ট্রাঙ্ক ভর্তি দেশী ও বিদেশী বই নিয়ে তিনি চলে গেলেন ঝাঁঝাঁয় নির্জন বাসের জন্য। উদ্দেশ্য—'এই শান্ত নিরুপদ্রব পরিবেশের মাঝে প্রকৃতির সংগে মধুর একটি ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের সংগে নিজেকে ভালো করে উপলব্ধি করা—এর চেয়ে বড় লক্ষ্য জীবনের আর কিছু হওয়া উচিত নয়।' কিন্তু নির্জনতায় পেট ভরে না। অতএব আবার যাত্রা কাশীর দিকে। সেখানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন কলকাতায়।

বাংলা সাহিত্যে তখন ঋতুবদল শুরু হয়ে গিয়েছে। তরুণ সাহিত্যিকদের মুখপত্র 'কল্লোল' তখন আঘাত হানতে শুরু করেছে কলকাতার অভিজাত সারস্বত সমাজের মর্মর প্রাসাদের উঁচু প্রাসাদের গায়ে। সেখানে কেবল ভাঙনের জয়গান। অন্যদিকে প্রকাশিত হচ্ছে শ্রমজীবীদের বাংলায় প্রথম মুখপত্র 'সংহতি'। সেখানে আছে ঐক্যসাধনের ধারা। এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে প্রেমেন্দ্রর 'পাঁক' উপন্যাস। প্রেমেন্দ্র মিত্র শ্রমজীবী ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তবতাকে শিল্পসিদ্ধ রূপে প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন ধারার সূচনা করলেন। এই 'সংহতি' পত্রিকার ১৩৩১ সালের আষাঢ় সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কবিতা 'দেবতার জন্ম হল' প্রকাশিত হয়েছে। "কবিতাটিতে বিশ্বযুদ্ধোত্তর বেদনাহত পঙ্কিল জীবনের ধূসর চিত্র এবং সমাজের এই বিকৃত জীবন ধারার জন্য কবির অনুশোচনা অপূর্ব ভাষায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ বলাকা'র ৩৭ সংখ্যক কবিতায় বলেছিলেন, 'ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি, মাথা কর নত। এ আমার এ তোমার পাপ।' প্রেমেন্দ্র আরো স্পষ্ট করে সমাজের মুখোশ খুলে দিয়ে জানালেন, 'এ আমার, এ তোমার, এ যে সর্বমানবের পাপ।/ দেবতার আলো করি চুরি,/ অন্ন রাখি কেড়ে, শাস্তি তাই যায় বেড়ে বেড়ে দিনে দিনে।... আজ/ বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে,/ কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর;/ আর কাঁদে পাতকীর বুকে/ ভগবান প্রেমের কাঙাল।' ব্যথাতুর, অনিচ্ছাকৃত বিপথগামী মানুষের প্রতি সমবেদনায় নিবেদিত এমন কবিতা ঐ সমসাময়িক কালে বিরল।"(প্রেমেন্দ্র মিত্র : কবি ও ঔপন্যাসিক— ড: রামরঞ্জন রায়)

বারাণসীতে প্রেমেন্দ্রর সংগে আলাপ হয়ে গেল দারুণ গল্পবাজ এবং অগাধ জ্ঞানবিদ্যা এবং অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক শিশির ভাদুড়ীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুধাংশুমোহন মুখোপাধ্যায়ের সংগে। যাকে প্রেমেন্দ্র ডাকতেন সুধাদা বলে এবং যাঁকে তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা' উৎসর্গ করেছিলেন। আর পরিচয় হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র বিনয় সেনের সংগে। যাঁকে প্রেমেন্দ্র উৎসর্গ করেছেন তাঁর 'ছয় দশকের কবিতা'। তাঁরই সূত্র ধরে প্রেমেন্দ্র রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ এ্যাসিস্টেন্টের কাজ পেয়ে যান।

কিন্তু সেই কাজও তিনি বেশীদিন করলেন না। ১৯২৮ সালে প্রেমেন্দ্র 'বাংলার কথা' দৈনিক পত্রিকাব সহকারী সম্পাদক রূপে কাজ করতে থাকেন। এর আগে প্রেমেন্দ্র শৈলজানন্দের সংগে কালিকলম পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। বাংলার কথা-র কাজ ছেড়ে দিয়ে প্রেমেন্দ্র আবার ড: দীনেশচন্দ্রের অধীনে সহকারীরূপে কাজ করেন কিছু দিন। পরে এই কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি প্রথমে 'সংবাদ' এবং পরে 'খবর' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এরপর শুরু হয় বোহেমীয় জীবন, এ কাজ ছেড়ে ও কাজ।

১৯৩০ সালে গিরিডিতে হুগলী জেলার দশঘড়ার বসু পরিবারের আশুতোষ বসুর কন্যা বীণাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বীণা দেবী আমৃত্যু (১৯৭৯) প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যকর্মের সঙ্গিনী ছিলেন।

বন্ধু শিবরাম চক্রবর্তীর অনুরোধে প্রেমেন্দ্র বেংগল ইমিউনিটিতে কাজ করেন। কিন্তু ছমাস পরেই সেই কাজ ছেড়ে দেন। পত্রিকা সম্পাদনার কাজেই যেন তাঁর বেশী উৎসাহ। জীবনে নানা পত্রিকায় কাজ করেছেন। ১৯৩৩ সালে 'রংমশাল' সম্পাদনা তাঁর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য কাজ। এর পর ১৯৩৬ সালে 'নবশক্তি' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৩৬ সালে

বিখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক প্রেমচাঁদের সভপতিত্বে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই বছর পরে কলকাতায় তার যখন দ্বিতীয় সম্মেলন হয় তখন সেখানে প্রেমেন্দ্র অন্যতম বক্তা ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয় ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। ১৯৪৪ সালে তার দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীব সভাপতি ছিলেন প্রেমেন্দ্র। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন তারাশংকর। পববর্তীকালেও এই প্রতিষ্ঠানেব সংগে প্রেমেন্দ্রব সম্পর্ক ছিল।

"নবশক্তির সম্পাদনা ছেড়ে প্রায় উনিশ-কুড়ি বছর মগ্ন থাকেন সিনেমা জগৎ নিয়ে। ১৯৫৪ সালে তিনি তিন বছরের চুক্তিতে ফিল্মিস্থান কোম্পানিতে কাজ নিয়ে যান বোম্বাই। কিন্তু ১৯৫৫ সালেই সেখান থেকে ফিরে এসে কলকাতায় আকাশবাণীর প্রোগ্রাম প্রোডিউসার (producer's spoken words) হিসেবে তিন বছর তিনি কাজ করেন এবং পরে আরো তিন বছর তিনি কাজ করেন আকাশবাণীর পূর্বাঞ্চলীয় উপদেষ্টা হিসেবে। ১৯৬২ সাল থেকে সব কাজ ছেড়ে পুরোপুরিভাবে তিনি সাহিত্য সাধনা শুরু করেন।" সাহিত্য সাধনা নিয়েই তিনি জীবনের বাকী বছরগুলো কাটিয়ে দিয়েছেন। অবশেষে সাহিত্যে তার নানা অক্ষয় কীর্তি রেখে ১৯৮৮ সালের ৩রা মে মৃত্যুবরণ করলেন।

প্রেমেন্দ্রমিত্র বাংলা সাহিত্যে এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বিদেশ ভ্রমণও করেছেন। ১৯৫৭ সালের বেলজিয়ামের কনকে তৃতীয় বিশ্ব কবিতা উৎসব হয়। ঐ উৎসবে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা হিসেবে ঐ উৎসবে যোগদান করেন এবং ইটালী, রোম বেলজিয়াম ও ইংল্যান্ড পরিভ্রমণ করেন। ১৯৬২ সালে মার্কিন সরকারের লিভারগ্রাণ্ট-এ তিনি আমেরিকা ও ইংল্যান্ড সফর করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার লাভ করে রাশিয়া ভ্রমণ করেন।

এ ছাড়া বহু পুরস্কারে প্রেমেন্দ্র ভূষিত হয়েছিলেন। সমস্ত গল্পসাহিত্যের জন্য তিনি ১৯৫৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শরৎ-স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যের জন্য লাভ করেন সাহিত্য আকাদেমী এবং রবীন্দ্র পুরস্কার। শিশু সাহিত্য পরিষদ তাঁকে ১৯৭১ সালে ভুবনেশ্বরী পদক দেন। ভারত সরকার 'পদ্মশ্রী' পুরস্কার দান করেন। এ ছাড়া মৌচাক, আনন্দপুরস্কার (১৯৭১) লাভ করেন। সমগ্র সাহিত্য কৃতির জন্য তিনি ১৯৭৬ সালে সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কার লাভ করেন। স্ব-নির্বাচিত গল্পের জন্য পেয়েছেন শরৎস্মৃতি পুরস্কার (১৯৪৮), ঘনাদা গল্পের জন্য ১৯৫৮ সালে পেয়েছেন শিশু সাহিত্যের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। ১৯৮০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাকে 'হরনাথঘোষ পদক' দান করেন। ১৯৮১ সালে শরৎ স্মৃতি কমিটি তাঁকে শরৎ পুরস্কার দেন, এই বছরই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি. লিট এবং পরবৎসর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী পদক দিয়ে ভূষিত করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে প্রথম বিদ্যাসাগর পুরস্কার দান করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

সদালাপী সদাহাস্যময় প্রেমেন্দ্র নবীন লেখকদের প্রেরণা। কত ছোটখাট পত্রিকায় তিনি জীবনের শেষপর্যন্ত কবিতা দিয়ে সাহায্য করেছেন তার সংখ্যা নির্ণয় করা প্রায় অসাধ্য কাজ। গ্রন্থের নামকরণ করা, ভূমিকা ও মতামত লিখে দেওয়া, প্রকাশ্যে সাহায্য করা তাঁর চরিত্রের এক অপূর্ব দিক। তাই তিনি বাংলা সাহিত্যে শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্র নন, সকলের প্রেমেন দা। যথার্থ অগ্রজের মতই ছিল তাঁর আচরণ।

কবিকৃতি ঃ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। চারিদিকে জীর্ণগৃহ, আবর্জনা। তার মাঝে আলোহীন বায়ুহীন কক্ষে ছিন্ন শয্যায় প্রেমেন্দ্রের প্রথম কবিতা দেবতার জন্ম হল। 'যুদ্ধোত্তর মানসিক অবসাদে, ভারসাম্যহীন সামাজিক অপচয়ে, অর্থনৈতিক বাজার মন্দায় ও মধ্যবিত্ত জীবনের বহুবিধ সংকটে, বিশেষত বেকারসমস্যায় কৃতবিদ্যের লাঞ্ছনায় ও স্ববিরোধে কণ্টকিত উৎপীড়িত সংশয়িত নাগরিক প্রাণে" উপনিষদের বার্তার মত রবীন্দ্রনাথের "অসহ্য আনন্দের বার্তা" সাড়া জাগাতে অক্ষম হল। জীবনযাত্রার পুরানো সুর তখন ছিন্ন অথচ জীবনপিপাসা সে তুলনায় ঊর্ধ্বগতি। সে সময়েই দেখা দিল মোহিতলালের ভোগবাদ, নজরুলের উচ্ছ্বসিত আবেগ এবং যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ। এই সময়ে দেখা দিল রবীন্দ্রপ্রচ্ছন্নতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রবিচ্ছিন্নতা। এটাই তখনকার আধুনিকতা। প্রেমেন্দ্রমিত্র রবীন্দ্র অবিমুখতা সত্ত্বেও আধুনিকতার পুরোহিত হয়ে দেখা দিলেন। নিখিলকুমার নন্দী প্রবাসী ষষ্ঠি বার্ষিকী গ্রন্থে লিখেছেন" নজরুলের উচ্ছ্বসিত আবেগপন্থা এবং যতীন্দ্রনাথ মোহিতলালের সংযত যুক্তিপন্থা প্রেমেন্দ্রে এসে প্রথম সত্যকার' আধুনিক' ফসল ফলালো।...ভাবধর্মে তিনি চরম বিপ্লব তখনই ঘটালেন, সেই প্রথমা'র যুগে, যখন একই পানপাত্রে তিনি ভারতীয় ঋষির ভূমাদর্শ ও পাশ্চাত্য মণীষীর বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বিশেষত মার্কসবাদ, সমান আগ্রহে গ্রহণ করলেন। চরমপন্থী না হয়েই অবিমিশ্র মানবপ্রস্থানে কাব্যের স্পষ্টতর জড়তাহীন নবীনযাত্রা স্পন্দিত ও ছন্দিত করলেন।...প্রথম তূর্য বেজেছিল প্রেমেন্দ্রের ছুতোর কামার কুলি-মজুরের চারণ গানে, পাঁওদলের পঙ্কলগ্ন পদশব্দে, জনতার কলরবে; তারপর ব্যক্তির সাম্রাজ্য ঘোষণায়, 'নীলকণ্ঠে'র সিংহ হিংস্র' মৃত্যুপণ আত্মসমীক্ষায়। আরও পরে স্বদেশের ভৌগোলিক ও অধ্যাত্মিক স্বগত অভিনিবেশে একে একে বাঙালী মধ্যবিত্তের মননে চিন্তনে সূর্যরশ্মিসম্পাত ঘটিয়েছেন তিনি।. .আমাদের কাছে আজ কবির যা প্রধান আকর্ষণ তা হল তাঁর নির্বিকল্প সত্যসন্ধানী মানবমুখিতা ও তত্ত্বলেশহীন বাস্তববাদী এক অভিনব অধ্যাত্মিকতা। সহজসাধন ও বৈষ্ণবকবিতার দেশে রাবীন্দ্রিক কালে লালিত এই রক্তাক্ত কবিচিত্ত আজন্ম নিগূঢ়তত্ত্ববাদী ও অন্তরঙ্গ স্বরূপসন্ধানী।" এই উদ্ধৃতির মধ্যেই প্রেমেন্দ্রমিত্রের কাব্যদর্শের সংক্ষিপ্ত হলেও বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে।

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় প্রেমেন্দ্রমিত্রের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন "তাঁর মন অসুখী ও জটিল হলেও তিনি অস্বাস্থকর জটিলতাকে প্রশ্রয় দেন নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় বাইরের দিক থেকে সহজ ও সরল, কিন্তু ভিতরে গভীর সুদূরতার দিকে মনকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। যথার্থ কবি মনের অধিকারী তিনি; এবং সেই মনকে অল্প কয়েকটি কথায় প্রকাশের ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য। তাঁর রচনায় বহিরঙ্গ আতিশয্য নেই, শৈলিতে দৃষ্ট মুদ্রা নেই। তাঁর বর্ণনা সুমিত ও ব্যঞ্জনাময়। তাঁর কবিতার প্রথমেই নজরে পড়ে মুক্তমনের প্রতিফলন, সেই মন সংস্কারবিহীন কিন্তু সংস্কৃত। এ-যুগেরই মানুষ তিনি। যুগের জটিলতা, যুগের নিরাশার হাত ধরেই তাঁকে জীবনে পথ হাঁটতে হয়েছে। কিন্তু যে কাব্যপ্রাণতা জটিলতা-কে সরল করে তোলে, নিরাশার বুকেও আশার প্রদীপটি জ্বালিয়ে দেয়, তার চাবিকাঠির খোঁজ তিনি অনায়াসেই পেয়েছেন। 'অনায়াসে' শব্দটি ব্যবহৃত হোলো তাঁর কাব্যের বহিঃপ্রকাশের কথা স্মরণে রেখে, তা নয়ত তাঁর স্মিতবাক পরিচ্ছন্ন

সংযত ও সংহত কাব্য প্রকাশের পিছনে অস্থির মনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার যোগ বিয়োগের খোঁজ নেওয়া সহজ-সাধ্য নয়। অনেক চড়াই-উৎরাই ও পাকদন্ডীর যন্ত্রা তাঁর কবিতার মর্মমূলে গাঁথা। প্রায় সর্বত্রই তাঁর কণ্ঠ আবেগে স্পন্দিত ও প্রগাঢ় অনুভূতিতে স্থির, অচঞ্চল। যুগের চেতনাকে তিনি আত্মসাৎ করে নিতে পেরেছেন বলেই আধুনিকতার চোখে-ধাঁধানো চমক লাগানো আতিশয্য থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন। 'ভাবনাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে নানা পদে ঠেলা মেরে' সাহিত্যের তথাকথিত উৎকর্ষ প্রমাণের প্রলোভন এড়িয়ে গেছেন, যদিও ভাষার ক্ষেত্রে যে-কোন নতুন কবির মতোই তাঁকেও পরীক্ষা নিরীক্ষায় বসতে হয়েছে, ছন্দকেও নিজের ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছে।"(আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা)

কল্লোল, কালি-কলম এবং প্রগতি পত্রিকার মধ্য দিয়ে যে আধুনিকতার প্রকাশ প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন তার অন্যতম সারথী। তাঁর মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা, সাম্যবাদ এবং শ্রমিক সভ্যতার জয়গান প্রাধান্য লাভ করেছে। নজরুলের মত তাঁর কাব্যেও আছে তারুণ্যের আবেগ, দারিদ্র্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে জীবনে সর্বত্রগামী এবং সর্বভোগী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। "তা ছাড়া মানব-সমাজের দীনতা-বেদনার পাঁকটুকু যে আমরা আদি-পুরুষ প্রোটোপ্লাজম থেকে বয়ে আনছি-জেনেটিকস ঘেঁষা এই রোম্যান্টিকতত্ত্বটিও তাঁর কাব্যকে একটু নতুন মাত্রা দিয়েছে: 'লক্ষভ্রষ্ট পৃথিবীর ভাই সে আদিম অভিশাপ/ বহি মোরা চিরদিন/ আকাশের আলো যত করি জয়, মিটিবে না কভু ভাই/ আদি পর্বের ঋণ'। 'প্রথমা' থেকে 'ফেরারী ফৌজ' পর্যন্ত তিনটি কাব্যে প্রেমেন্দ্র হুইটম্যানীয় ভঙ্গীতে এই বলিষ্ঠ মানবিকতা, রোম্যান্টিক স্বপ্ন এবং পাপের বেদনা বুকে নিয়ে এই বিপন্ন হতাশার যুগে, এই নতুন প্রতীকী ও চিত্রময় কাব্যের যুগেও বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।" (বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব—উজ্জ্বল মজুমদার)। এ ছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন অকুণ্ঠচিত্তে বলেন, "আমি কবি যদি কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের" ইত্যাদি তখন হুইটম্যানের সংগে কার্ল স্যান্ডবার্গের "I am the people, the Mob"-এর কথাও স্মরণে আসে। আবার প্রেমেন্দ্র যখন যুদ্ধোত্তর যুগের হতাশা ও বেদনার ছবি আঁকেন তখন স্বাভাবিভাবেই এলিয়টের The Westland-এর কথা মনে হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র বহু বিদেশী কবিতা অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থ পরিচয়ের সময় তার বিশেষ পরিচয় দেওয়া হবে।

রবীন্দ্রনাথের পর গদ্য কবিতা রচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্রই প্রথম সার্থক কবি। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু তাঁর An Acre of green grass গ্রন্থে লিখেছেন, "He is one of the earliest practitioners one might say pioneers — of the prose poem ; no wonder that his verse prefers the spoken, even the colloquial diction."সমকালীন একজন কবির স্বীকৃতির মধ্যেই প্রেমেন্দ্রর সার্থকতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। রবীন্দ্রযুগে যে কজন কবি বাংলা কবিতার বিষয়বস্তু ও রূপায়ণের মধ্যে গতিশীলতা এনে ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র ছিলেন অগ্রণী।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য তিনি আধুনিক কবিদের অগ্রণী হয়েও রবীন্দ্র সচেতন। তাঁর বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছন্দ এবং ভাব অনুভূত হবে। অবশ্য আধুনিক কবিদের প্রায় সকলের মধ্যেই রবীন্দ্র প্রভাব বর্তমান। যারা রবীন্দ্রদ্রোহী বলে আত্মপ্রকাশ

করেছেন তাঁরাও রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। অথচ আশ্চর্য এই কারণেই কোন কোন সমালোচক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে যথার্থ আধুনিক বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু আধুনিকতার লক্ষণ বলতে যে সব লক্ষণকে ধরা যায় যেমন, নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত, বর্তমান জীবনে নৈরাশ্য ও অশান্তিবোধ, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে সচেতন গ্রহণ, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব, বিজ্ঞান চেতনা, সাম্যবাদী চিন্তাধারা, মননশীলতা, প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে সংশয় এবং তৎসঞ্জাত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ, প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা। ভগবান এবং প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস এবং রবীন্দ্রঐতিহ্যের সচেতন বিদ্রোহ এ সবই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় বর্তমান। একমাত্র রবীন্দ্র ঐতিহ্যের সচেতন বিদ্রোহ প্রেমেন্দের কাব্যে উচ্চকিত নয়। তিনি রবীন্দ্রবৃত্তে অবস্থান করেও এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে কবিতা রচনা করা যায় কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রজীবনের সমকালে বাস করে। রবীন্দ্রনাথলিখেছেন আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে। মর্জিই যদি প্রধান হয় তাহলে প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠা উচিত নয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে নিজেই লিখেছেন, 'পৃথিবী যদি সাময়িক উত্তেজনায় উদাসীনও হয় তবু কবিকে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। মানুষের মনে সুর লাগানো তাঁদের কাজ কিন্তু সেই সঙ্গে যুগে যুগে মানবতার গভীর মর্মোদ্ঘাটন করে জীবন-সত্য ভুলতে না দেওয়াও তাঁদের দায়িত্ব। শেলী বলেছিলেন "poets are the unacknowledged legislators of mankind" কবির অতিশয়োক্তিকে মিথ্যা দম্ভ বলে একথা উড়িয়ে দেওয়া বুঝি যায় না; যুগের মানুষ নানা করণে উদভ্রান্ত হতে পারে কিন্তু কবিকে তাঁর লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে। কারণ জীবনের পরম রহস্যের চাবি শুধু বুঝি তাঁর কাছেই।" (কাব্য প্রসঙ্গে)

প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনে অনেক কবিতা লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত অনেক কাব্য গ্রন্থ আছে কিন্তু গ্রন্থভুক্ত হয় নি এমন অনেক কবিতাও নানা পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। তিনি নবীন লেখকদের খুব ভালবাসতেন। সেজন্য বহু ছোটখাট পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখে দিতেন। সেই সব অসংখ্য ছড়ানো কবিতা এখনো সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীকালে সেগুলো সংগৃহীত হলে একটি সংযোজনী গ্রন্থে মুদ্রিত হতে পারে। প্রেমেন্দ্র কবিতা ছাড়াও বহু ছড়া লিখেছেন। সমগ্র কবিতায় সেগুলোকে স্বাভাবিকভাবেই অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

প্রথমাঃ প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। 'কল্লোল, 'সংহতি', 'কালি-কলম' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই গ্রন্থের কবিতাগুলো মূলত দুইয়ের দশকে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে কবিতার সংখ্যা ছিল ২৫টি, এর কোনও কবিতার শিরোনাম ছিল না। দ্বিতীয় সংস্করণেও কবিতাগুলো শিরোনামহীন থাকে। পূর্বের ২৫টির সঙ্গে আর ৭টি কবিতা সংযোজিত হয়ে কবিতার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২টি। প্রথম পদের সূচী অনুসারে এই ৭টি কবিতা হল, 'আজ এই রাস্তার গান গাইব।' এই ভুবনের মধুর দিনের। এস নারী। ওরা ভয় পায়। পায়ের শব্দ শুনতে পাও? মনে করি ভালো বাসব। এবং মানুষের মানে চাই।

এই কবিতাগুলোর মধ্যে 'পায়ের শব্দ শুনতে পাও ?' কবিতাটি প্রেমেন্দ্র লিখেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শোকমিছিল দেখে। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের উৎসর্গ ছিল: পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুধা দাকে। তৃতীয় সংস্করণ থেকে কবিতাগুলো শিরোনামযুক্ত হয় এবং উৎসর্গ পত্রের পরিবর্তন ঘটে। এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং ১৯৫৪ সালে।

বর্তমান সংকলনের কবিতার শিরোনামের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতার শিরোনামের কিছু গরমিল আছে। বর্তমান খন্ডের 'লক্ষ্মভ্রষ্ট' কবিতাটির শ্রেষ্ঠ কবিতায় শিরোনাম 'পথভ্রান্ত', 'কবি'র শিরোনাম 'আমি কবি যত কামারের'। 'অপূর্ণ'-এর নায় 'অপূর্ণতা'। 'আশীবার্দে'র শিরোনাম 'নগর প্রার্থনা'। 'ফিরে আসি যদি'-র শিরোনাম 'যদি ফিরে আসি', 'তুমি' কবিতার শিরোনাম 'তুমি আছ তাই'। কবিতাগুলি পড়ার সময় এই পরিবর্তনগুলি স্মরণে রাখতে হবে।

এই গ্রন্থের 'দেবতার জন্ম হোল' কবিতাটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম প্রকাশিত কবিতা (সংহতি, আষাঢ় ১৩৩১)।" 'প্রথমা' কাব্যে বত্রিশটি কবিতায় জীবনের ভিন্নমুখী ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন আছে বৃহৎ সত্যানুসন্ধানের অঙ্গীকার, তেমনি পীড়িত জনগণের কথা, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষায় সামিল হওয়া। এ ছাড়া প্রেম সংশয় ও মানুষের জয়গান সম্পর্কিত কিছু কবিতাও আছে।"

সম্রাটঃ প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরী। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন ৭ই ফাল্গুন, ১৩৬২। নূতন দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬০ এবং নূতন তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭০।

এই সংস্করণের প্রচ্ছদসজ্জা করেছেন অজিত গুপ্ত। মোট ৬৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য ছিল দুই টাকা পঁচিশ পয়সা। উৎসর্গ করেছেন বন্ধুবর হুমায়ুন কবীরকে।

এই গ্রন্থে আছে মোট চব্বিশটি মৌলিক কবিতা এবং ছয়টি অনুবাদ কবিতা। ২৪টি কবিতায় প্রতিভাত হয়েছে রোম্যান্টিকতা, আধুনিক সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, শস্য প্রশস্তি ও গণতান্ত্রিকতা, বৈজ্ঞানিকতা এবং সত্যানুসন্ধান।

এই গ্রন্থের 'কাঠের সিঁড়ি' কবিতার একটা ইতিহাস আছে। ১৯৩৩-৩৪ সালে অনুবাদ কর্মের জন্য কবিকে মাঝে মাঝে রাইটার্স বিল্ডিং-এ যেতে হোত। সেখানে কাঠের সিঁড়ির নীচে বসেথাকা উর্দিপরা সেপাই ও থামের চারা কবির চেতনায় এক ভাব সৃষ্টি করে। কাঠের টুলে বসে থাকা প্রহরীর মধ্যে যে নিঃসঙ্গ জনতার ঘন-রূপ আছে তার স্থানুত্ব একদিন ঘুচে যেতে পারে, আর থামের চারাও অরণ্যের বিশালতা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু কাঠের সিঁড়ি জড় বলে তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। যে সিঁড়ি মানুষকে উপরে ওঠার সুযোগ করে দেয় তার কিন্তু 'আকাশ'-এ উপনীত হবার কোন সুযোগ নেই। বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে একটা ব্যথাঘন অনুভূতি এই কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সুকান্ত ভট্টাচার্য সিঁড়ি নামে একটি কবিতা লিখেছে।

এই গ্রন্থে ডি. এইচ. লরেন্স এবং জি. কে. চেস্টারটনের ছটি কবিতার অনুবাদ আছে। 'কাজ' কবিতাটি হল লরেন্সের 'Work', "পরবর্তী কবিতা, 'প্রেম, যার মূল হোল একটি

বাক্য "Know deeply know thyself more deeply" ভাষা সম্প্রসারিত হয়ে কত প্রাঞ্জল ও মধুর হয়েছে।" লরেন্সের আর একটি কবিতা "Give no Gods" যার অনুবাদ কবি করেছেন 'দেবতা' নামে। "লক্ষ্যনীয় পার্থক্য ঘটেছে পাশ্চাত্য দেবীর বদলে ভারতীয় দেবদেবীর নাম উল্লেখে।" কবি আক্ষরিক অনুবাদ না করে অনেক জায়গায় ভাবানুবাদ করেছেন। ফলে তা আরও প্রশংসনীয় হয়েছে।

"এরপর আছে G. K. Chesterton-এর কবিতা। চেষ্টারটনের The Ballad of St. Barbara থেকে কবিতাগুলোর অনুবাদ করা হয়েছে। এখানেও আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ করা হয়েছে।"

সাগর থেকে ফেরা ঃ প্রথম প্রকাশকাল ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৩। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। এখানে পঞ্চদশ মুদ্রণের (১৯৭০) পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রচ্ছদসজ্জা করেছেন অজিত গুপ্ত। মূল্য ৩.৫০। পরম সুহৃদ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সর্বপেক্ষা বেশী বিক্রীত কাব্যগ্রন্থ।

এই গ্রন্থে মোট ৩২টি কবিতা আছে। এগুলোর মধ্যে কবির বিচিত্র মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমা কাব্যগ্রন্থের মত এই গ্রন্থে যান্ত্রিক বিকলাংগ সভ্যতার অস্তিত্বের কথা আছে। কিন্তু তার সংগে আছে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছবি। আর আছে দ্বন্দ্ব সংক্ষুব্ধ অবস্থা থেকে উত্তরণের কথা।

ফেরারী ফৌজ ঃ প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা: লি:। প্রথম প্রকাশ ৭ই ভাদ্র, ১৯৫৮। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৩ সালে। প্রচ্ছদসজ্জায় অজিত গুপ্ত। মূল্য দুটাকা মাত্র। বড়মামা তুলসীচরণ বসুকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে মোট ৩৩টি কবিতা আছে। এই গ্রন্থে কবি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মানুষের যে দুঃখ দেখেছেন তা অপূর্বভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং আধুনিক সভ্যতাকে তীব্রভাবে কশাঘাত করেছেন। প্রেমেন্দ্র প্রথমার যুগ থেকেই মানুষের মনের গভীরে যে আদিম অন্ধকারের রাজত্ব লক্ষ্য করেছেন এখানে তাকে বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়াও এই গ্রন্থে আছে কবির সত্যানুসন্ধানের প্রকাশ। তিনি একটি কাকের ডাকের মধ্যে স্তব্ধ দুপুরে যাত্রা করেন এক আধ্যাত্মিক লোকে। জীবনের প্রাত্যহিক ছবি থেকে তিনি এক অপার আনন্দঘন লোকে যেতে চান।

অথবা কিন্নর ঃ প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৭২। প্রকাশক এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলিকাতা-১২। প্রচ্ছদ এঁকেছেন অজিত গুপ্ত। মূল্য ৩.৫০। বন্ধুবর অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে মোট ৪২টি কবিতা আছে। "অনেক কবিতায় নির্জ্জন মনের রহস্য রূপায়িত হয়েছে। কিছু কবিতা শাশ্বতবোধ প্রকাশ করেছে। কিছু কবিতা সামাজিক কপটতার বিরুদ্ধে জ্যোতিষ্কের আহবান ঘোষণা করেছে।"

এখানে প্রেমেন্দ্র লুই অন্টার মেয়ার, রবার্টফ্রস্ট, টমাস হার্ডি, জেমস সি মরিস, গ্যয়টে, মোটেটের কবিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন। "বস্তুবাদী ফ্রস্টের ছন্দ-যুক্ত কবিতা 'Gathering leaves' এর অনুবাদ 'ঝরাপাতা' প্রেমেন্দ্র হাতে গদ্যছন্দে রূপায়িত হয়েছে।" এ ছাড়াও প্রেমেন্দ্র কতগুলে জাপানী হাইকু কবিতা অনুবাদ করেছেন। নিউইয়র্কের কেনেথ রেক্সরথ এর একশটি জাপানি কবিতার ইারেজী অনুবাদ থেকে বাংলা তর্জমা করেছেন।

কখনো মেঘ ঃ প্রথম প্রকাশকাল ২২শে শ্রাবণ, ১৯৬১। প্রকাশক ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিসিং কোং প্রাঃ লিঃ ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭। প্রচ্ছদসজ্জা করেছেন অজিত গুপ্ত। মূল্য চার টাকা। রয়াল সাইজের ৫৬ ডবল পৃষ্ঠার গ্রন্থ। উৎসর্গ করেছেন পূজণীয় ফণিভূষণ চক্রবর্তীকে।

এই সংকলনে মোট ৩৮টি কবিতা আছে। "কবি প্রেমেন্দ্রে মানস দিগন্তে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব বর্তমান। অমংগলবোধ তাঁর চেতনায় নিহিত। তাই বিভিন্ন স্থানীক প্রতীক ও চিত্র সংযোগে সেই অশুভের বর্ণণা তাঁর এই কাব্যে পরিবেশিত হয়েছে। 'কখনো মেঘ' কথাটি তাই বিশেষ অর্থ দ্যোতক। কখনো কখনো মেঘ থাকে আকাশের বুকে, সকল সময় থাকেনা। এই কখনো মেঘ সরে গিয়ে আসে হঠাৎ আলোর ঝলকানি।" (প্রেমেন্দ্র মিত্র: কবি ও ঔপন্যাসিক)। এই গ্রন্থের চারটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

নদীর নিকটে ঃ প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮। প্রকাশক সারস্বত লাইব্রেরি, ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬। প্রচ্ছদ এঁকেছেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। দাম পাঁচ টাকা। বন্ধুবর ভবানী মুখোপাধ্যায়কে গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে মোট ৩৯টি কবিতা আছে। তার মধ্যে ছয়টি অনুবাদ। যৌবনের আরম্ভ থেকেই কবি চেতনায় সমাজের অসুস্থতা এবং যন্ত্র সভ্যতার যে বিকলাংগ রূপ বর্তমান ছিল কবি তার অবসান কামনা করেন। এখানে 'অন্ধকার' এক বিশেষ চিত্রকল্প হিসেবে দেখা গিয়েছে। যৌবনে এই অন্ধকার ছিল কালোবাজারী এবং আদিম বীভৎসতার প্রতীক কিন্তু এই কাব্যে অন্ধকার জীবনের বাঁচার রহস্য। তাছাড়া এখানে আছে কবির যুগ-চেতনার ছবি। ১৯৬৮ ৭০ সালে পশ্চিমবাংলায় যে যুব বিক্ষোভ হয়েছিল, যে বিশৃংখলাপূর্ণ আতঙ্ক মানুষের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তাও কবি এখানে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি কলম ও বল্লমকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া লেনিন, ম্যাকসিম গোর্কি, রমাঁ রলা এবং গুরু নানক এই চারজন মহামানবকে উদ্দেশ্য করে চারটি কবিতা লিখেছেন। লেনিনের উদ্দেশ্যে প্রেমেন্দ্র দুটি কবিতা লিখেছেন।

এই কাব্যে তিনি বিশ্ববন্দিত ইতালিয়ান কবি দান্তে, দিকপাল কবি উইলিয়াম কার্লস উইলিয়াম এর দুটি কবিতা, তরুণ রুশ কবি আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি, সাইবেরিয়ায় বন্দী অবস্থায় মৃত আধুনিক রুশ কবি আসিপ ম্যান্ডেরস্ট্যাম এর চারটি কবিতা এবং ১৯২৫-২৭ এর মহাবিপ্লবের অংশীদার আধুনিক চীনা কবি ইয়ে তিঙ্ এর কবিতা অনুবাদ করেছেন। কার্লস উইলিয়ামের The yachts কবিতার অনুবাদ করেছেন পানসীগুলো এবং 'To you'-Inscription এর অনুবাদ 'হাসিখুশি উইলিয়াম'।

হরিণ চিতা চিল : প্রথম সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৬৬। প্রকাশক ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। প্রচ্ছদ শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী। দাম তিন টাকা। বন্ধুবব ত্রিদিবেশ বসুকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন।

এই গ্রন্থে মোট তিরিশটি কবিতা আছে। এর মধ্যে চারটি চীনা তর্জমা আছে। অবশ্য এই তর্জমার মধ্যে কোন চীনা কবির নাম উল্লেখ নেই।

"আধুনিক সভ্যতার যন্ত্রণাময় রূপ কবি-চেতনায় বিধৃত, তাই কবি তিনটি প্রতীক হরিণ, চিতা এবং চিলের সাহায্যে ক্ষিপ্রতা, তিক্ততা ও শোচনা এবং রহস্যসন্ধান প্রকাশ করেছেন। সভ্যতার ক্রমবর্ধমানতায় মানুষ পশ্চাৎগামী। একদিকে সভ্যতার মত্ততা, অন্যদিকে বিধ্বংসী মানবিকতা...এর মাঝে সৌন্দর্যের স্থান নেই, লালসা নেই। শুধু মাত্র সন্ধানী চোখের স্থান (আধুনিক সমালোচকগণ) থাকবে এ সভ্যতায়। কিন্তু তারা হৃদয় হীন নিয়ম মাফিক জাগতিক পদ্ধতি দেখবে; স্বস্তি পাবে না। সভ্যতার সংকটে মনের যন্ত্রণা তাকে ব্যস্ত সমস্ত করে তুলবে।"

নতুন কবিতা : প্রথম প্রকাশ ১লা জানুয়ারী, ১৯৮১। প্রকাশক বুক ট্রাস্ট, ৩০/১ বি কলেজ রো, কলিকাতা-৯। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন মলয়শংকর দাশগুপ্ত। মূল্য আট টাকা।

এই সংকলনে মোট ৪৭টি কবিতা আছে। এটি কবির সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ।

হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা : হুইটম্যানের কোন এক জন্মদিনে ৩১ মে তারিখে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি প্রকাশিত। গ্রন্থে প্রকাশসালের কোন উল্লেখ নেই। প্রকাশক দীপায়ন প্রকাশনা ভবন ২৮, মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়। মূল্য দুই টাকা মাত্র। গ্রন্থটি বন্ধুবর ড: নীহাররঞ্জন রায়কে উৎসর্গ করেছেন। বিখ্যাত মার্কিন কবি হুইটম্যান আধুনিক বাঙালী কবিদের বিশেষ করে নজরুল এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রকে উদ্‌বোধিত করেছিলেন। তাঁর বিশাল Leaves of grass কাব্য প্রেমেন্দ্রর লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত আছে। তিনি তার থেকে মাত্র ৩৮ কবিতা অনুবাদ করে এই সংকলনে প্রকাশ করেছেন। এই কটি কবিতার সবকটি আবার পূর্ণ অনুবাদ নয়। কবিতার নামকরণও কবির নিজস্ব। বাঙালী পাঠকের কাছে হুইটম্যান-এর কবিকৃতির পরিচয় দেওয়াই উদ্দেশ্য। অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদ ভাবানুগ। হুইটম্যান Blank verse এর রচয়িতা। প্রেমেন্দ্রও সেজন্য অনুবাদের সময় শ্রুতি মাধুর্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি গদ্যছন্দেই কবিতাগুলো অনুবাদ করেছেন।

প্রেমেন্দ্রমিত্রের কবিতাগ্রন্থ বলতে উপরের গ্রন্থ গুলিই আজ পর্যন্ত প্রকাশিত। এ ছাড়া ১৯৫৩ সালে নাভানা থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করে ভারতী ১৯৭৫ সালে। এরপর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দে'জ পাবলিশিং থেকে শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রথম পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় জুন, ১৯৮৭। দাম ২০ টাকা। এই সংকলনের হঠাৎ

যদি, শতবর্ষ পরে এবং ধ্বনির হৃদয়ে এই তিনটি কবিতা ছাড়া বাকী কবিতাগুলো প্রথমা, সম্রাট, ফেরারী ফৌজ, সাগর থেকে ফেরা, হরিণ চিতা চিল, কখনো মেঘ, অথবা কিন্নর, নদীর নিকটে এবং নতুন কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে।

বিচ্ছিন্ন কবিতা : প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থে প্রকাশিত 'হঠাৎ যদি', 'শতবর্ষের পরে' এবং 'ধ্বনির হৃদয়ে' কবিতা তিনটিকে এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হল। এ ছাড়া অমলেন্দু দত্ত সম্পাদিত 'বসুধা' সাহিত্য পত্রিকার ১৩৯৪ সালের বিশেষ শারদ সংখ্যা থেকে 'গোপন' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই দুইটি কবিতাই শ্রী ভবানী মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছে।

১৯৭৭ সালে বইপত্র থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ছয় দশকের কবিতা' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি প্রেমেন্দ্রের শেষ মুদ্রিত কাব্যগুলির একত্রিত সংকলন। উৎসর্গ করেছেন কবির ছয় দশকের অকৃত্রিম বন্ধু বিনয় সেনকে। এই সংকলনটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

প্রেমেন্দ্র বহু কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। যেমন 'প্রেম যুগে যুগে'। মধ্যযুগে থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত যুগে যুগে যে প্রেমের কবিতা রচিত হয়েছে তার একটি শোভন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন।

মন্ডল বুক হাউস ১৩৮০ সালে প্রকাশ করেছেন প্রেমেন্দ্র সম্পাদিত 'প্রেমের কবিতা' সংকলন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রেমেন্দ্র লিখেছেন "প্রেমের কবিতা বলতে বিশেষ কাউকে কেন্দ্র করে আবেদন নিবেদন অভিমান আক্ষেপও ঠিক আর বোঝায় কিনা সন্দেহ। বিশেষ কাউকে উদ্দেশ করার চেয়ে, জীবনের সবচেয়ে, প্রচন্ড রহস্য গভীর আলোড়নে সমস্ত সত্তার স্পন্দন বৈচিত্র্য ভাষায় ধরে রাখবার চেষ্টাতেই এ কবিতায় স্বাতন্ত্র্য।" এ ছাড়া এ.কে. সরকার ১৩৯০ সালে প্রকাশ করেছেন প্রেমেন্দ্রর সম্পাদনায় 'ছোটদের কবিতা সংকলন'। এই সব সংকলনে প্রেমেন্দ্র-র নতুন কবিতা নেই।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের দীর্ঘ কাব্যচর্চার একটা সামগ্রিক পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। বর্তমানে কবির বহু কাব্যগ্রন্থ দুর্লভ। অথচ প্রেমেন্দ্র মিত্রকে জানার আকাঙ্ক্ষা অপরিসীম। প্রেমেন্দ্রর সমগ্র কবিতা নিঃসন্দেহে সেই অভাব পূরণ করতে পারবে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই তাঁর সমগ্র কবিতা পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারার জন্য প্রকাশক ধন্যবাদার্হ হবেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা প্রকাশের জন্য যে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা তার জন্য প্রেমেন্দ্র পরিবার, শ্রী নিরঞ্জন চক্রবর্তী এবং প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। এই গ্রন্থ প্রকাশে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আন্তরিক সুহৃদ শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। গ্রন্থ শেষে প্রেমেন্দ্রর কবিতার প্রথম পঙক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী তৈরী করে দিয়ে শ্রী মতী মিম্মি মিত্র যথেষ্ট সহায়তা

করেছে। আর এই গ্রন্থ পরিচয় রচনার জন্য যে গ্রন্থগুলোর সাহায্য গ্রহণ করেছি (আধুনিক বাঙলা কবিতার রূপরেখা-ডঃ বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি ও ঔপন্যাসিক-ডঃ রামরঞ্জন রায়, বাঙলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব-ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার প্রভৃতি) তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

২৩৮ মানিকতলা মেইন রোড
কলিকাতা-৫৪.

ডঃ সরোজমোহন মিত্র

বর্ণানুক্রমিক সূচী

কবিতার প্রথম লাইন	কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
অন্তহীন দোদুল দোলার দুলছে যে দোলনা	(অনন্ত দোলনা)	৩২৫
অন্ধকারে ডুব দিয়ে নিরাময় হয় হয়ত কেউ	(বিফল নায়ক)	১৩৩
অন্ধকারে সারারাত একটি তারা প্রিয় করো যদি	(দিশারী)	২৭৪
অলজ্জ আমার পার্থিবতা	(পার্থিব)	২৪৯
অজানা মঞ্চ দৃশ্যও তাই	(সূত্রধার)	২৮৩
অজানা সমুদ্র নয় নয় মহাদেশ	(ম্যাক্সিম গোর্কিকে নিবেদিত)	২০৫
অনাদ্যন্ত এ মিছিলে	(নকল মিছিল)	১৪৯
অগ্নি আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে	(সুদূরের আহবান)	২
অতীতের যত সম্বন্ধ	(ত্রিকাল)	২৯৬
অচেনা পথিক, পথে যেতে আসায় দেখা	(তোমাকে)	২৯১
অনেক আকাশ গেছে মরে	(পুরাতন বীজ)	৫৫
অন্যেরা ফেনায় তুষ্ট	(বাল্মীকি)	১৭৯
অযোধ্যা হস্তিনা নয়	(এ শহর)	১৯৮
আজ এই রাস্তার গান গাইব,	(রাস্তা)	৩৭
আজ আমি চলে যাই	(প্রার্থনা)	১৪
আজ আবার রোদ উঠল একটু সোনালী	(ন'উই আশ্বিন)	২১১
আজও তারা বয়	(তেরো নদী)	২৩৪
আতঙ্ক অরণ্যকায়া	(হরিণ)	১৬৬
আর বরফের পথিক-পাখীর পায়ের চিহ্ন	(স্মৃতি)	৩৩
আর সে সোনালী রোদ নয়	(পূষণ)	৭৪
আলগোছে-ই ছুঁয়ো সব	(বহতা)	১৩৫
আবার কোকিলা থামবে	(সরাই)	১৩৩
আমাদের কথা কেউ সব জেনে নিয়ে	(কবি)	১০৬
আমার একটা কথা বলার ছিল	(বিদায়)	৩১৭
আমার জানালার ওপারে	(পোড়ো বাড়িটা)	১৩৭
আমার শহর নয়কো তেমন বুড়ো	(শহর)	১০৮
আমার নিজের গান গাই	(নিজের গান গাই)	২৮৯
আমায় যদি হঠাৎ	(হঠাৎ যদি)	৩৪৩
অ্যামেরিকা গাইছে আমি শুনতে পাই	(শুনেছি অ্যামেরিকার গান)	২৮৯
আজি এই প্রভাতের আশীর্বাদ খানি	(আশীর্বাদ)	১৭
আবিরাম যারা লড়ে এসেছে	(শান্তি)	১৫৪

আমি অচঞ্চল প্রকৃতির বুকে	(আমি অচঞ্চল)	৩১৮
আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির	(কবি)	৩
আমি ত এখানে বসে	(কাল রাত	৫৮
আমি দেখলাম চাষীকে জমিতে চষতে	(মাটি চষছে কিষাণ)	৩১৭
আমিই শাসন আমিই বিদ্রোহ	(চক্রান্ত)	১৯৬
আমি শুনেছি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ	(নালিশ)	৩২৫
আমি সেই মুখ বংশের আদলে গড়া	(পরম্পরা)	১৫৩
আরো একজন আছে	(আরো এক)	৯০
আরো তলায় দাও ডুব	(প্রেম)	৬৭
ইঁদুরেরা সারারাত	(ইঁদুরেরা)	৭৬
উড়ো হরিয়াল-ঝাঁক বাবলা-বন	(ট্রেনের জানালা)	২২২
এ এক আকাশ এখন আনমনে কি ভাবছে	(রোজ-নামা আষাঢ়)	১২৯
এ এক পাহাড়-ঘেরা স্বচ্ছ-হ্রদ, সরল নিষ্পাপ	(হ্রদ)	১২৫
এ এক জোনাকি মন	(জোনাকি মন)	১০২
এ তো বড় রঙ্গ যাদু	(রঙ্গ)	১৮১
এ পারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌	(কালাধলা ভাই আমার)	৮৫
এ মাটির ঢেলা কবে কে ছুঁড়িল সূর্যের পানে	(লক্ষ্যভ্রষ্ট)	১
এ নয় সে উজ্জয়িনী	(কালিদাস)	২২৮
এ শরৎ একদিন এসেছিল প্রসন্ন প্রান্তরে	(শরৎ)	১১৫
এইত দেখা অন্ধকারে এক চমকে	(তাল মুকুর)	২৭১
এই ধ্বনি একদিন	(ধ্বনি)	১১২
এই নেভালেম আলো	(তুমি এস)	৫৫
এইবার মহাশয় আপনার স্মরণে	(দর্শন সার)	৩১৬
এই যে দেহ	(চারটি কবিতা)	২১৭
এই যে ভাবনা এ শুধু আমার একার নয়	(ভাবনা)	২৮৬
এক এক দিন	(দিন)	২৫২
এক এক রাত্রে	(দিন রাত্রি)	২৭৫
এক ঘা খাওয়া ভেঙ্গে পড়া বৃদ্ধ	(কলম্বাসের প্রার্থনা)	৩০৯
এক যে ছিল অ্যামিবা	(আদ্যিকালের বুড়ি)	৮৩
এক যে ছিল আরশোলা,	(এক যে ছিল)	২৭৬
এক স্বৈরিণী নদীকে	(দেখেছি)	২৫৩
একটা 'কেন' ছিল	(কেন)	২৭৫
একটা গোপন কথা	(গোপন)	২০৯
একটা পা আছে	(উনিশ শো সত্তর)	২০৩

একটা মুখ কাঁদার হয়ে শীতের রাতে	(মুখ)	১২৮
একটা যদি পাখি ডাকত	(কোনো এক পোড়ো ভিটেয় রাত্রে)	১৪২
একটা সকাল কি সূর্যাস্ত যদি পাও	(কবিতা)	১৩৪
একলা যদি হও, কখনো আসবে তখন ?	(জানালায়)	১৪৫
একটি কঠিন অঙ্ক	(অঙ্ক)	২২৭
একটি গোপন কথা	(গোপন)	৩৪৬
একটি জানালা আর	(তিনটি জোনাকি)	৯২
একটি দানাও নেই হাড়িতে	(ফোঁড়া)	২৪৩
একটি পাখীর জন্যে	(শিকার)	২২৩
একটি ফোটা জল দাও যদি এই	(ভেল্‌কি)	২৪৪
একটি মানুষের মধ্যে আমি	(এই আকাশ অন্ধকার)	১৯১
একদিন এই ছবি	(ছবি)	১৭৬
একদিন কাঁদবে না আর	(নিরশ্রু)	১৪৭
একদিন খুঁজে পাবে	(পাবে)	১৬৭
এখনো অরণ্য শুধু	(শিখর ছুঁয়ে নামা)	১০৫
এখন উদ্যত আমি	(সর্পযজ্ঞ)	১৯০
এখনও যে তারা ফেরারী	(সংশপ্তক)	৯৩
এমনি দূরেই থাক্	(অনাবিষ্কৃত)	২২৭
এস এই মহাদেশ আমি অবিভাজ্য করে গড়ে	(গণতান্ত্রিক)	৩২৪
এস নারী	(যৌবন বারতা)	৩১
এখানে তারারা বিজলি বাতির	(একটি নির্জন প্রান্তর)	১৪৩
এখানে বসবে মেলা	(মেলা)	২২১
ঐ ভুবনের মধুর দিনের পথিক যত	(ইহবাদি)	২৮
ওরা অন্ধকার বেচে	(অন্ধকার)	২৫০
ওরাও কূপ খনন করেছে	(তবু)	২১২
ওরা ভয় পায়	(নাহি ভয়)	২৭
ক		
কঙ্কাল হতে কর বিশ্লিষ্ট কৃপাণে দেব	(বিশ্লেষণ)	৭১
কখনো পিঁপড়ের দেখা	(আয়নায়)	১৬১
কখন হঠাৎ যাই অজান্তে ছড়িয়ে	(বিভ্রম)	১৩৭
কত দীর্ঘ মন্থরতা	(বিস্ফোরক)	১৭০
কত পাখি উড়ে চলে যায়	(পাখী)	৮৫
কত বৃষ্টি হয়ে গেছে	(নীল দিন)	৫৬
কমজোর বিজলীর বাতি	(বিস্ফোরণ)	১৯৭

কষে ফেলে দেবে। অঙ্ক কি সোজা ?	(অগাণিতিক)	১৭১
কাগজের বুকে বিঁধে কলমের রূঢ় নখর	(নেপথ্য)	২৫
কাগজের নৌকো যদি নাই পায় পণ্যের বন্দর	(কাগজের নৌকো)	২২৮
কান নাই পেতে রাখো	(কলধ্বনি)	১৬৮
কান পাতলে ঝিরিঝিরি	(ধ্বনির হৃদয়ে)	৩৪৪
কালপুরুষের ধনু	(জ্যোতিষ্ক সত্তা)	১৫০
কালো দীঘিজল, তারি সুশীতল	(তুমি)	৩৪
কিংখাবে জরিবর কাজ	(দ্বিজ)	২৩২
কুহেলী বিলীন দিগন্ত থেকে	(লেনিন)	২৫৬
কে এমন তুমি, হে মবশরীর	(খণ্ডিত কর্দম)	১৫২
কেউ কেউ শুধু বুঝি	(প্রভৃতি)	২৪৮
কেউ কেউ শুধু বুঝি	(অবিস্মরণীয়)	২৭১
কোথায় দেখেছে মহাপ্রলয়ের সংকেত	(প্রলয় বিধাতা)	২৬২
কোথাও প্রবাস নাই	(স্মৃতি)	১২৪
কোথায় যাব ভেবে ছিলাম	(বরং)	১১৩
কোথায় যাবে ? ঘুম পাহাড়	(ঘুম পাহাড় জুড়নদ্বীপ)	২২৫
কোথাও সবযূ বয়	(শ্রীরাম)	১২৭
কোনো এক দুরারোহ হিম শৈল-শিখরে এখনো	(শ্যেন)	১৭৭
কোন দিন গেছ কি হারিয়ে	(হারিয়ে)	১১০
কোন মুলুকে চরে জানো	(ভস্মলোচন)	২৪২
খ		
খনির গভীর গর্ভে	(ইস্পাত)	৭৭
খাঁ খাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর	(কাক ডাকে)	৭৪
খুঁজতে যাবো না দূর প্রাগুষার তিমিরে	(স্বাদেশিক)	২৫৭
খুঁজে দেখো, আছে আছে	(আছে)	১০৭
গ		
গ্রামের উপর রাতের নিবিড় অন্ধকার	(গ্রামান্তে রাত্রি)	৯৬
ঘ		
ঘর বার শেষ করে নয়	(বারান্দা)	১৬৩
ঘরটা একটু অগোছাল থাক	(খুঁত)	২৪৫
ঘাসের ডগাও যা নক্ষত্রদের চলাও তাই	(নিখুঁত)	২৯১
ঘুমহীন রাত	(বিনিদ্র)	৪৭
চ		
চওড়া কাঠের সিঁড়ি গেছে উঠে	(কাঠের সিঁড়ি)	৪১
চক্ষে তব বহ্নি জ্বালা মধ্যাহ্ন সূর্যের	(ভয়াল)	১৪৫

চিতি চিলটা ছোঁ মেরে উড়ে যায়	(প্রতীক্ষা)	২৮৯
চিরকালের কবিতা যারা লিখতে চায়	(ক্ষণিকা)	২০০
চিলের ছাদে চিল বসে না	(খিড়কি)	১৩২
চেয়ে দেখো আমার কবিতার ভিতর দিয়ে	(ব্যাপ্তি)	২৯২
চোখের উপর তোমায় আমি	(আদিম)	২৮২
চোপসানো, কোঁচকানো, বাঁকানো	(সময়)	১৯৪
ছ		
ছন্দ খোঁজে পদান্ত বিরতি	(শূন্য)	১৭৭
ছড়িয়ে পাশার দান	(অধ্যাহার)	২৩৬
ছাগলছানা লাফিয়ে চলে	(তেন তাস্তেন্ন)	৮৪
ছাদে যেওনাক, সেখানে আকাশ অনেক বড	(ছাদে যেওনাক)	৪৬
ছেড়া তালির মেঘের তাঁবু ফেলে	(ঝাপসা নাম)	১৩১
ছোট্ট মানুষ, শ্যামলা মানুষ	(ছোট্ট মানুষ)	২০১
জ		
জনবহুল এক শহর পার হতে হতে	(জনাকীর্ণ নগরে)	২৯৮
জল পড়ে, পাতা নড়ে	(রাত জাগা ছড়া)	১২০
জয়ধ্বনি করো ছোট্ট দুধে	(প্রথম দাঁত ওঠবার পর)	১৫৮
জানি এ কাচের ঘর	(কাচঘর)	১৪০
জীবন বিধাতা আজি বিদ্রোহীর লহ নমস্কাব	(নমস্কার)	৮
জীবন মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি	(নটরাজ)	২৪
জীবন শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল্	(স্বপ্ন দোল)	৯
ঝ		
ঝড় যেমন করে জানে অরণ্যকে	(ঝড় যেমন করে জানে অরণ্যকে)	৬০
ঝরা পাতা বেছে তুলতে	(ঝরাপাতা)	১৫৩
ঝড়ে ও নীল নোংরা হল ? হয় কি !	(শুদ্ধি)	১৩২
ট		
টবে ক্যাক্টসের মত	(টবে ক্যাক্টসের মত)	২১৩
ট্রাম বাসের ঠাসাঠাসি	(দিনটা)	১৬১
ট্রেনের কামরায় ছিলাম বসে	(ট্রেন থেকে)	৯৫
ত		
তন্ন তন্ন অনায়াসে পড়ে ফেলবে সব	(ছাপা না)	২৭৪
তাই কি এ মাটি আজো	(সীতা)	১৭৮
তাদেরও দেখেছি হাত পা এলিয়ে	(হিসাব)	২৩১
তামাসাটা রেখো মনে	(তামাসা)	৬২
তারিপরও কথা থাকে	(কথা)	৮৮

তারিখ কত? পাঁচই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার	(তারিখ)	১৩৫
তিনটি গুলির পর	(তিনটি গুলি)	১০১
তুষার মৌলি হিমালয়ের অভ্রংলিহ মহাশিখর	(গুরুনানক)	২০৬
তৃতীয় প্রহরে চাঁদ উঠেছিল নগর শিখর ছুঁয়ে	(লুপ্ত)	৩৪

দ

দমকা হাওয়ার ঝাপটায়	(অভাবিত)	১৩৮
দরজা জানালা ভেজাও যত না	(নিরর্থক)	২৩৫
দশ প্রহরণ দশ হাতে ধরে দেবী	(ছলনা)	১৭৩
দাও না দোকান, দোষ কি তাতে	(দোকান)	১০৪
দামামা বাজুক! বাজুক! বাজাও বাজাও ভেঁপু	(বাজুক দামামা)	৩১৩
দ্বার খোল্ খোল দ্বার, রাত্রির প্রহরী	(দ্বার খোল)	১২
দ্বারপ্রান্তে শেষ যখন ফুটছে লাইলাক	(সমাপ্তি সংগীত)	৩৩৫
দিগন্ত বিক্ষত সেথা জ্বলন্ত নখরে	(আমরা যাইনি যুদ্ধে)	৪৫
দিব্যদ্যুতি লিখি বটে অভ্যাসের মসৃণ কলমে	(সে মানুষ)	২০৭
দ্বীপ নিভে গেছে, নিভেছে রাতের তারা	(কোজাগরী)	৫২
দুঃখী নগর কী চাও, শুধাই যদি	(দুঃখী নগর)	২৪৪
দূরের দিকে চাইতে গিয়ে	(দূর ও নিকট)	১৩১
দেবতা চাই আবার চাই দেবতা	(দেবতা)	৬৯
দেবতার জন্ম হল	(দেবতার জন্ম হল)	১০
দেশ আর কালের সায় আমার মধ্যে	(পথিক)	২৮৮

ধ

ধন্যবাদ তোমাকে, সঙ্ঘমূর্তি শঠতা	(ধন্যবাদ)	১৪৪
ধোয়াটে ক্লান্তির পর, একটি নদী	(হলদী)	১৩৭
ধৈর্য ধরো	(ইস্তাহার)	১৬২
ধৈর্য ধর তবু, ভাই কিংবা বোন আমার	(ব্যর্থ বিপ্লবীকে)	৩৩৩
ধৈর্যশীল নিঃশব্দ এক মাকড়সা	(একটি মাকড়সা)	৩১৬

ন

নগরের পথে পথে দেখেছ অদ্ভূত এক জীব	(ফ্যান)	৯৮
নগরের বিদ্যুত বাহিনী ধমনীর	(নিষ্প্রদীপ)	১৪১
নতমুখ, ক্লান্তপদ, নিরাশ্বাস মন	(মৃত্যুত্তীর্ণ)	৫৪
নদী যদি পড়ে পথে যেতে	(নিঃসঙ্গ)	৯১

নদীর ওপর সকালবেলায় কুয়াশা (পোলের ওপর পাঁচুই মাঘ ৯৭
নদীতে বাঁধানো মাঠে, সে সে তোমার আমার র (কিন্নর) ১২৮
নদীর মতন যাকে (মেঘ হয়ে দেখো) ১৭৩
নদীর নিকটে থাকব (নদীর নিকটে) ২০৩
নদীর সংগে একটা মিলত যদি (নদী ও যদি) ২১১
নমো নমো নমো (নমো নমো) ২১
না কোনো উত্তর নেই (অহৈতুক) ২৬৬
না কোনো উত্তব নেই (উদ্ভাবন) ২৬৮
নাই বা হল কীর্তিধ্বজা (অকীর্তিত) ১৯৩
নাই হও না মেঘটা শেষ (মেঘটা) ১৮০
নাই ফুল, শস্যের মঞ্জরী (অবতারণা) ৪৮
নাক মুখ চোখ ঠিক (তির্যক) ১৭৮
নাম তার জানি নাকো (জনৈক) ৮২
নাম বললে চিনবে না তো (লগ্ন) ১৬৫
নির্জন প্রান্তরে ঘুরে হঠাৎ কখন (পাখীদেরমন) ৭৬
নিবিড় ঘুমের ঘেরাটোপ (স্বরগ্রাম) ১৯২
নিরবধি সব নদী (আশুতোষ) ১৫১
নিরবধি কাল আর অন্তহীন দেশ (ফুলকি) ২৬৮
নীচে রাজপথে ক্লীবত্বের কাদা (স্মৃতি) ২৬২
নীচে জোয়ারের স্রোত (খেয়াপার) ২৯৩
নীল নদীতট থেকে সিন্ধু উপত্যকা (ফেরারী ফৌজ) ৭৮
নীল নীল (সাগর থেকে ফেরা) ১০৩
নেশায় যারা বুঁদ (আসর) ২১৬

প

পায়ের শব্দ শুনতে পাও (পাঁওদল) ৩৯
পাতা চিরদিন নতুনই গজাবে (সত্য) ১১৪
পালাতে পালাতে কতদূর (ফিরে আসি যদি) ২২
পাহাড় না হলে (সনদ) ১৭৫
পৃথিবীতে আগে নাকি বড় স্বাদু শান্ত ছায়া (ওল্টানো দূরবীণ) ১৮৮
পোকাটা দেওয়ালে (মামলা) ১৫৯
প্রথম উন্মীলিত চেতনার সেই প্রাগৃষা থেকে (শ্যামা) ২৪৭
প্রথম সাপটা দেখবে নিথর পাথর সম্মোহিত (সাপ) ১৬০
প্রলয় প্লাবনের পর (প্রলয়ের পর) ২৬৪

প্রণাম করবার মানুষ যারা আছেন (মহানায়ক) ২৫৭
প্রাচীন পদ্ধতি কোনো (প্রাচীন পদ্ধতি কোনো) ৮৯
প্রাণের দৈন্য ভীরু আর কৃপণ কি (উচ্চৈঃশ্রবা) ২৭৯
প্রেইরীর প্রান্তরের ঘাসের বেড়া (তৃণ প্রান্তর) ৩১২
প্রেতের মতন এক ধূসর বিষাদ (প্রেতায়িত) ৮৬

ফ

ফের যদি ফিরে আসি (ফিরে আসি যদি) ২২

ব

বজ্রগর্ভ মেঘ এক কাল রাত্রে এসেছিল নগরের (পলাতক) ৭৪
বর্তমানের গান গাই (ভারত পথিক) ৩১৯
বলেছিলে নাই বা মনে রাখলে (পঁচিশে বৈশাখ) ১৮৫
বসন্তের বাগানে যেখানে (জাপানী হাইকু কবিতা) ১৫৫
বহুদূর তটে আজ শুনতে কি পা... (আজ রাতে) ৫৩
বড় গঙ্গার দুধারে (নতুন পোল) ৯৬
বাঘের কপিশ চোখে (বাঘের কপিশ চোখে) ৪৩
বালির কণাটা দেখছ (বালির কণা) ১৪৬
বাস থামলেই হাঁক শুনবে (চৌরঙ্গী) ১৮৯
বাস থামলেই হাঁক শুনবে চৌরঙ্গী (কেউ না) ২৪৯
বিগত দিনের কবি (পোমানক থেকে যাত্রা) ২৯১
বিরাট সেতু সে এধারের পারে ওধারে জুড়তে (সেতু) ৪
বৃক্ষ বা নিতাই এক কোন বৃষ্টি মেঘ ফুল পাখী (জল্পনা) ১৬৯
বুড়িটা ছিল ছোঁবার (বুড়ি) ১৩০
বৃত্তাকার এই যে বিশ্ব (স্টেশন) ৭২
বৃষ্টি হয়ে গেছে বুঝি (কোনদূর বনে) ৫০

ভ

ভয় করে না কবিতা লিখতে বসতে (কলম) ১৯৫
ভয়ঙ্কর সেই সন্দেহ (মায়া) ২৯৩
ভাবী কালের কবি অনাগত বক্তা (ভাবী কালের কবি) ২৯০
ভীরুদের ভিক্ষা নয় (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি) ২৮৪
ভোঁতা করতেই চাই কলমটা (কলম) ২৬০

মনে কবি ভালোবাসব	(সংশয)	৩৫
মনে পড়ে	(নৌকো)	৯৪
মনে কবো দেখেছ কোথায	(শপথ)	১৯৬
মন থেকে মযলা ছাপ ঘসে তোলাব	(ছাপ)	১৯৯
মনে হয় পশু হযে তাদেব সংগে পাবি থাকতে	(নমুনা)	২৮৭
মহাসাগবেব নামহীন কূলে	(বেনামী বন্দব)	৫
মাঝে মাঝে হানা দেয	(পাতোদ্ধাব)	১৬৪
মাঝে ম ঝে পাখি নামে	(চিত্ত সহচব)	২৩৫
মাটিব ঢেলা মাটিব ঢেলা	(মাটিব ঢেলা)	৭
মাটি আব মাটি নেই	(ববীন্দ্রনাথ)	১৮৬
মাঠের শস্য ঘ্বে এল	(শস্য প্রশস্তি)	৪৯
মানুষেব মানে নেই	(মানে)	৩৫
মানুষেব ইতিহাস	(জ্যোতির্বিদ্যা)	১৮৬
মানুষেব কত মাপ	(লেনিন)	২০৪
মানুষেব দবজায শক্ত তালা	(বন্দীব গান)	২২০
মানুষেব কত মাপ	(মানুষেব মাপ)	২৭৭
মানে খোজা নিযে বোকা	(পলাতক)	১২২
মিঠে জলেব দেশেব ভাই	(লংকাভাগ)	১১২
মূঢ ইতিহাস স্বখাত গোলকধাঁধায	(জর্জ বর্ণাড শ)	১২১
মৃত্যুবে কে মনে বাখে	(মৃত্যুবে কে মনে বাখে)	১৬
মৃত এক মহাদেশ	(আবিষ্কাব)	১১১
মেঘ বাষ্পে তোমাব আকাশ আবৃত ক	(প্রমিথিউস)	১৫৭
মেঘ ছোঁযা না হলে দবেব দে য	(বামমোহন)	২৫৪
মেঘলা একটা দিন	(মেঘলা দিনটা)	২৬৩

য

যখন আমি পণ্ডিত জ্যোতিষীব ক	(জ্যোতিষী পাণ্ডিত বললেন)	৩৮৯
যা আছে ছডিযে, যত্নে কুডোও	(ছক)	২২২
যাদেব তুমি চিনতে পাব ও	(এই শহবে)	১৩৯
যেখ হাঁস নীড বেঁধেছিল বন হংসেব প্রেমে	(বিস্মৃত)	৩২
যে পুরী থ্রুকো স্মি কবো স্বর্ণময	(দশানন)	১২৬
এসেছ সেখানে হায, দুর্দিন আব	(স্বর্গোদ্ভবা)	২১৪
যেখানে উৎকীর্ণ ছিল	(দাম)	২২৪

যেখানে তোমার ছায়া	(ইশারা)	২২৬
যেখানেই ডেরা বাঁধো গিরি মরু ডিঙাতেই হবে	(শতাব্দী)	২৫৯
যেখানেই ডেরা বাঁধো	(শতাব্দী)	২৭৮
র		
রাজ্যসমূহের মধ্য দিয়ে আমরা যাত্রা	(দেশান্তরী)	৩১৭
রাতের অন্ধকার কখন নামিয়ে দিয়েছে	(সাক্ষী)	১৯২
রাত্রি এল ঝাঁপিয়ে	(রাত্রি)	৭১
রাস্তা পিচের, বাসটা নতুন	(দুপুর)	১১৭
রেলের আঁধার সুড়ংগটা	(সুড়ংগ)	৮০
রোদ দাও	(রোদের প্রার্থনা)	১২৩
ল		
লুপলাইনে যেতে হয় গ্রামটা	(লুপ লাইনের গ্রামটা)	১৬০
শ		
শত বর্ষ পরে	(শত বর্ষ পরে)	৩৪৪
শতাব্দী যায় গড়িয়ে	(সূর্য বীজ)	১১৬
শিকার কোথায় শেষ	(আরণ্যক)	১৭০
শিরিষের ফুল পড়ছে ঝরে	(পুরাতন নাম)	৪২
শিশিরে ভেজানো আর সোনালী রোদেরা	(নিয়তি)	২৭৩
শিশিরে ভেজানো আর সোনালী রোদের	(কয়েকটি সকাল)	২৮১
শীতে না কাঁপলে	(জিৎ)	১৩০
শীতের আড়ষ্ট এই ছোট দিনগুলি	(বড়দিন)	২৭২
শুধুই বন্য	(জীবনের গান)	১১১
শুধু মাপামাটি নয়	(নহবত)	১৭২
শুধু ছায়া ছম্‌ছম্‌	(শংকাশুদ্ধি)	২৪২
শুনেছি পেয়েছ নাকি নিভৃতির দুর্গ সুদুর্গম	(তোমাকে চিঠি)	১০২
শুনেছি প্রবাদ কোনো	(প্রবাদ)	১১৩
স		
সকলের সামনে দিয়ে	(নিরুদ্দেশ)	২১০
সকাল না হতে ঘরটার পাশে	(সীমান্ত)	২৩৯
সব সেতু ভেংগে যাক্‌	(যোজনা)	১৩৬

সব কিছু তাই আছে	(প্রবাহ)	১৪৮
সব কথা স্তব্ধ হলে	(নাম)	১৮৭
সব মেঘ সরে যায়	(দূপিঠে)	১৯৭
সব সত্য আছে সব কিছুর মধ্যে লুকিয়ে	(সত্য)	২৮৬
সবিস্ময়ে মুখ তোলো	(মানুষ)	২৫১
সবিস্ময়ে মুখ তোলো	(শিকার)	২২৩
সমবায় সমিতির সদস্য	(সম্রাট)	৬১
সমস্ত দিন তোমার সৌরভ আমায় ঘিরে	(সৌরভ)	৫৯
সমস্ত যন্ত্রা বুঝি	(কান্না)	২০৫
সমতল ক্ষেত গুটিয়ে নেবে কি ফের	(কারিগর)	১৭৫
সমুদ্র থেকে জলা জঙ্গল	(সেইখানেই)	২৩৩
স্বপ্নকে করি না ঘৃণা	(স্বপ্নচারী)	২৭০
সাগর পাখিরা সব উড়ে যায়	(সাগর পাখিরা)	৫১
সাগরের পাখিদের একান্ত আপন	(দ্বীপ)	১২২
সাজানো অন্দরে বন্দী বই নয়	(বই নয়)	২৪৮
সাতটাত মাত্র দিন	(সাতদিন)	২৮০
সাদা মেঘগুলো ভেসে চলে যায়	(সাধু)	১১৮
সারাদিন ঘেঁষা ঘেঁষি মানুষের ভীড়ে	(ছোঁয়া)	৯৯
সার্সিতে জল-সারেঙ বাজে	(মেঘলা মোহ)	২৬
সুঠাম অস্ত্র নগ্ন ও পাণ্ডুর	(কাঠুরে)	২৯৮
সূর্যের প্রথম নাম	(জয়)	৮৭
সূর্যের অঢেল রোদ পৃথিবী পেয়েছে	(প্রহসন)	১০০
সূর্য খুঁজি কোথায়	(একটি ভাস্বর মানুষ)	১৪৯
সূর্যকে ভজন করলে	(জবাব)	২৬৭
সূর্য খুঁজি কোথায়	(উদ্ভাসন)	২৬৯
সূর্যাস্তেও চাপাবে উপরি রঙ	(মেলাবে)	২৪৫
সৃষ্টি তো কত ভাবে মাপলাম	(জানা ও বোঝা)	১১৫
সেই সব হারানো পথ আমাকে টানে	(পথ)	৪৪
সেই এক নাগরিক	(জীবনানন্দ)	১০৯
সেই সাগরে যোজে	(পানসীগুলো)	২১৫
সেই আশ্চর্য সব মানুষেরা	(অনন্ত নীলাকাশের চেয়ে)	২০৬
সে কাজের ঠিক মানে হয়	(কাজ)	৬৬
সে সব স্তব্ধতা আমি	(নিরালা)	২০৮
সেথা তুমি পূর্ণ ছিলে	(অপূর্ণ)	১৩

স্েলো ফেলে [illegible]ড়ে রাখলে (স্বহতা) ২৬৬
সোজা করে [illegible]র অনেক ছুঁড়েছি (গড়মিল) ১৮৫

হ

হয়তো আকাশ শুধুই মেঘ চরাই (যদিও মেঘ চরাই) ৯২
হয়ত সে নদী আছে (নদী সদাগর পাথুরে পোল) ১৪৩
হয়ত শুধু নাকালই সার (রোগ) ১৮৩
হয়ত হবে না যাওয়া (স্টেশন) ২৫২
হয়ত আকাংখা ছিল (হয়তো) ২৬১
হঠাৎ আকাশ উপচে (রোদ) ২০১
হাওয়াই দ্বীপে যাইনি, (নীলকণ্ঠ) ৬৪
হাওয়া বয় সন সন (জং) ১১৯
হাওয়া কি ঝরায়, মন? (হাওয়া কি ঝরায় মন) ১৮৪
হাওয়ায় পর্দা দুলবে (পর্দা) ২৩১
হাঁকে ফিরিওলা-কাগজ বিক্রি (কাগজ বিক্রি) ২০
হায়! আমি! হায়! জীবন: (এই সত্তা, এই জীবন) ৩১৫
হাসি খুশী উইলিয়াম চুমড়ে নিয়ে (হাসিখুশি উইলিয়াম) ২১৬
হিমালয় নাম মাত্র (ভৌগোলিক) ৭৩
হিমের রাত্রি পার হয়ে উড়ে চলেছে (আত্মীয়তা) ২৮৭
হিংস্র এ শকট তোমার ট্যাংক হে সেনানী (গলদ) ২৬৩
হৃদয় রঙিন মেঘ (লক্ষ্মণ) ২৩৮
হে আমার মৌণ নীল রাত্রি (স্তব্ধতা) ৯৭
হে পৃথিবী, কোথায় যাব? ক্লান্ত! (ক্লান্ত) ১২০
হে মহাজীবন, আমি বন কাটলাম (রঙিন তারিখ) ২০৯
হে উতলা নদী (বন্দিনী) ২৪০
হে পাঠক আমার মতই প্রাণের বেগে (হে পাঠক) ২৯১
হে অধিনায়ক! হে আমার অধিনেতা (হে অধিনায়ক) ৩১৪